

গ্রেট হাঙ্গার

(জোহন বয়ার) ✓

—

শ্রীশিশির চন্দ্র সেনগুপ্ত

ও

শ্রীজয়ন্ত কুমার ভাট্টা

= বরেন্দ্র লাইব্রেরী =

২০৪, কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা।

প্রকাশক—শ্রীযুক্ত নথি যোষ
২০৪, কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট কলিকাতা।

মূল্য আড়াই টাকা মাত্র

প্রিন্টার—বি, এম, যোষ, আইডিয়াল প্রেস
১২১১, হেনসলে সেন স্ট্রীট, কলিকাতা।

এই বইখানি 'মহাবলুফা' নামে সাপ্তাহিক 'দেশ' পত্রিকায় আত্মপ্রকাশ করেছিল। কিন্তু বইখানির আভিজাত্য এবং পরিচয় ঠিক রাখবার জন্য আমরা "গ্রেট হাজার" নামে বজায় রাখা সমীচীন বলে মনে করছি।

নরওয়ের বিশ্ববিখ্যাত ঔপন্যাসিক জোহন বরারের নুতন করে পরিচয় দেবার কিছু নেই। নিজের অসাধারণ লেখনী নৈপুণ্যে তিনি বিশ্ববাসীর অন্তর জয় করেছেন। এই বইখানি বাংলার অনুবাদ করার অনুমতি দিয়ে তিনি আমাদের কৃতজ্ঞ করেছেন।

'দেশ' সম্পাদক মহাশয় বইখানি তাঁদের পত্রিকায় ছাপিয়ে আমাদের ধন্যবাদের পাত্র হয়েছেন এবং যে সকল বন্ধুবান্ধব আমাদের সান্নিধ্য ভাবে সাহায্য করে ঋণী করেছেন তাঁদেরও আমরা আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। ২৩ —————

দেশে অগ্রহারণ,

১৯৪৬

শ্রীশিশির চন্দ্র সেনগুপ্ত
শ্রীজয়ন্ত কুমার ভাদুড়া

শ্রীশ্রীশচন্দ্র সেন প্রণীত সামাজিক নাটক

এই মুক্তি

বহু সংবাদপত্রে উচ্চ প্রশংসিত

“নাট্যকার উপযুক্ত ঘটনার সমাবেশে বাঙ্গালী গৃহস্থের
শোচনায় দারিদ্র্য, চাকুরীজীবীর একান্ত অসহায় অবস্থা এবং
কন্যাদায়গ্রস্ত পিতার অপরিমিত লাঞ্চার ছবি ফুটাইয়া
ভুলিয়াছেন। নাটকখানি পাড়তে গেলে মাঝে মাঝে অশ্রু
সংবরণ করা দুঃসাধ্য হইয়া উঠে।”

মূল্য—৫০ আনা

চলে, রূপালী আভায় ঝিক্‌মিক্‌ করে তার জল। এর অণু আর এক স্বপ্নের রাজ্য—বালির তীর, আগাছা-শোভিত উঁচু-নী, পাহাড়-ঘেঁষা জলাশয়, স্বচ্ছ তার জল। ছোট ছোট হাফপে। চ্যাপটা মাছগুলি সেখানে শুধু লাফিয়ে বেড়ায়। আতপ্ত বাত। আসা সমুদ্রের লবণজলের গন্ধে ভারী। Scapio পাখী জলে একটা বড় পাথরের পাশে ঘুরে বেড়ায়—মাঝে মাঝে তার দাঁড় ঠেঁটি সূর্যের দিকে ফিরিয়ে মনের আনন্দে চেঁচায় “—ক্লীপ, ক্লীপ, এসেছে বসন্ত।” আকাশ ও পৃথিবী হান্‌ছে আলোয়।

এমনি এক দিনে দুটি ছেলে—বছর চৌদ্দ বয়স তাদের, কি বেশী—সেদের কুঁড়েঘর থেকে বেরিয়ে তীরের দিকে রওনা হল। ছেলের যখন একটা গোপন কাজের জন্য তৈরী হব—তখনকা বাস্তবতা আর সচরাচর তাদের মধ্যে দেখা যায় না। এদের সেই রকম একটা বিশেষ জরুরী কাজ। পীয়ার ট্রয়েন—মাথায় সোনালী চুলের গুচ্ছ, একটা মাল-টানা ঠেলা গাড়ী যাচ্ছিল। আর তার বন্ধু মার্টিন—গায়ের রং তার শ্যামল, মুখে একটা বালতি হাতে তার পিছনে পিছনে আস্ছিল। তার রহস্যে কানাকানি করছিল, আর মাঝে মাঝে নদীর দিকে ব্যাং চাইছিল।

পীয়ার অবশ্য এখানকার দলপতি এবং বরাবর সে এ রকম এসেছে। গেল বছর দাবান্ন ত তাদেরই বাড়ীর দ্বারে এসে পৌঁছে। বড়দের মত ছোটদেরও যে গভীর সমুদ্রে যাবার অধিকার অর্জন কথটা আজ সে তার কয়েকজন বন্ধুকে পরিষ্কার করে বুঝিয়ে দিল। স্ত নীতকাল ধরে তারা বড়দের কাজ করে এসেছে—যাঙ্গ

বাব আর বাড়ীতে আনবে—coal fish, flounder, অথবা কড়মাছের বাচ্চা! দূরের গভীর 'সী লাইন' স্পর্শ করবার ক্ষমতা তাদের নেই, তাতে কি?—লফটেন সমুদ্রের ধীবরেরা এখন দারুণ ব্যস্ত, স্থানকার কাজ শেষ না হলে তারা ত আর এদিকে ফিরতে পারবে না! সেই সব কারণে ছেলের দল 'বোট-হাউস'এর পাশ দিয়ে তাদের 'লাইন' টাঙিয়েছে—আর Fjordএর গভীর জলে সেই 'লাইন' ভাসিয়ে রেখেছে।

গভীর সমুদ্রের মধ্যে মাছ ধরবার বিপদ হচ্ছে যে, প্রকাণ্ড ও ভয়ঙ্কর মাছ এক এক সময় উঠে আসে—যা আগে কখনও হয়ত দেখা গিয়েছিল। কালকে অবশ্য অন্য ধরনের বিপদ হয়েছিল। দেখা গেল তীরের দিকের 'লাইনটা' ডুবিয়ে রাখার মত ভার ওদিকে নেই। তবে কি সব আয়োজন ব্যর্থ হবে? কিন্তু পীয়ারের বুদ্ধি সমুজ্জল, মস্তিষ্কে অমনি একটা মতলব এসে উপস্থিত। সে তীরের এক কোণে একটা ছোট্ট গাছের সঙ্গে সেটা বেঁধে রাখলে আর সমস্তটা জলে ডুবে রুলল। আর এক প্রান্তে একটা পাথর,সমস্তটা সবুজ জলে অদৃশ্য হয়ে যায়।

দিকে বাতাসে ছটা হুক্ বুলছে—হয়ত কোন হাঁস কিংবা ঐর অপর কোন প্রাণী আটকে যেতে পারে। কিংবা কোন লোক রাত্রিবেলা নৌকা বাইতে বাইতে ওতে আটকে পড়বে। কি মজা ধরা যাবে তাতি সহজেই। তারা এই গোপন পরামর্শ কানাকানি করে করতে তীরের দিকে দ্রুতপদক্ষেপে ছুটতে লাগল।

'ঐ যে পীয়ার রনিনজেন আসছে'—হঠাৎ মার্টিন বলল। তাদের তৃতীয় সদস্য এ—লম্বা ছিপ্‌ছিপে ছেলোট, বোকা বোকা ভাব—তার চোখের ওপর। এ একটু তোংলা, হাসলে এর গলা দিয়ে অদ্ভুত শব্দ বের হয় "চী-ই-চী"। হবার একে কনফার্মেশান

ক্রাসে নামিয়ে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু বই পড়ে কি লাভ, যখন তুমি তোৎলামি শোনবার মত ধৈর্য্য কারুর নেই?

তারা তিনজনে নৌকাটাকে ঠেলে নিয়ে গিয়ে জলে ভাসান, তারি দেওয়া ট্রাউজারের পা চেপে ধরে ছড়োছড়ি করতে লাগল। “হী”—তার থেকে কে যেন চোঁচিয়ে উঠল।—“এই—আমি যাব।”

“এই যে ক্রাস”—মার্টিন জিজ্ঞাসা করল—“ওকে কি সঙ্গে নেওয়া হবে?”

—“না না”—পীটার বাধা দিল।

—“না-আসতে দাও”—পীয়ার বলল। ক্রাস ব্রক জেলার একজন ডাক্তারের ছেলে। নালাভ-চোখ তার, পরণে নাবিকের পোষাক। অবশ্য সে স্কুল-পালান ছেলে—বাড়ীতে একজন প্রাইভেট টিউটর এসে পড়িয়ে যায়। তার বাবা বাড়ী এলে আজ সে বেশ দু'এক নিশ্চয়ই খাবে।

“সীগগির”—পীয়ার একটা হাল বাড়িয়ে দিলে—সেইটা ধরে ক্রাস সন্তুর্ণে এসে নৌকাতে চেপে বসল। তারপর চার দাঁড় একসঙ্গে তেড়ে ওঠে—দাঁড়টানার সঙ্গে সঙ্গে নৌকাটার আপাদমস্তক শিউরে উঠল। মার্টিন হাল ধরেছিল—পীয়ারের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ। পীয়ার দিকে বসেছিল—তার চোখ দুটা নাচছিল—অনাগত বিরাট স্তম্ভ পরিপূর্ণ। মার্টিন এর মধ্যেই বেশ ভয় পেয়ে গেছে। পীয়ার বড় ধর্ম্মযাজক হবে, কিন্তু কেন তবু সে এমন মতলব করে যা ভগবানের পাপপূর্ণ! এ প্রশ্নের উত্তর মার্টিনের ছোট মাথার আসে না।

পীয়ার শহরে ছেলে—ভাগ্য-ছর্কিপাকে গ্রামের একজন জেথাকতে বাধ্য হয়েছে। তার মা তাঁর পক্ষে যা হওয়া উচিত হতে পারেন নি। কিন্তু আজ আর তিনি বেঁচে নেই!

নিশ্চয়ই খুব টাকা আছে, কারণ তিনি প্রতি ক্রীষ্টমাসে পীয়ারকে ১০ ক্রাউন করে পাঠান, কাজেই পীয়ারেরও পকেট সব সময় টাকায় ভরা থাকত। অন্যান্য বালকেরা তাকে বেশ সমীহ করে চলত—সেও যোগ্যতা অনুযায়ী তাদের উপর সর্দারী করত।

ধূসর পাহাড়শ্রেণী অতিক্রম করে নৌকা নক্ষত্রবেগে ছুটে চলেছে—দূরের কুঁড়েঘর, বালির তীর সব নীলাভ হ'তে হ'তে মিলিয়ে যেতে লাগল। কেবল দূরের পাহাড়ে শুধু একখানি শাদা ধবধবে কাঠের তৈরী গোলা-ধাড়ীর মূর্তি সুস্পষ্ট হয়ে রইল।

এই ত সেই অন্তরীপ—ঐ ত দাঁড়িয়ে আছে তার বৃক্ষের সারি। পীয়ার ওপারে পৌঁছে—বঁড়শীর দড়ির শেষ ভাগ একটু ঢিলা করে দিল—তার দু'জন বালক যেখানে কড় মাছগুলি মাথা ভাসিয়ে গভীর জলে অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে তাদের দিকে চেয়ে রইল। কে জানে কি ধরা পড়বে? “বেয়ে চল” পীয়ার আদেশ দিল এবং তারা জোরে দাঁড় জানতে লাগল।

নৌকাখানি সোজা ছুটে চলেছে—বঁড়শী সাজান দড়ি মাঝে মাঝে গাট্টে যাচ্ছে—আর ছকগুলি তুলছে—অবশেষে প্রথম টান পড়ল। পীয়ারের বুক কাঁপছে অনিশ্চিত উত্তেজনায়। বোধ হয় কোন গভীর জলের মাছ। হর, একটা বড় রকমের কড মাত্র—পীয়ার অগ্ৰমনস্কভাবে সেটাকে টেনে তুলল। তারপর আবার একটা টান—আবার একটা—আবার। যখন ছেলেরা কিংবা বয়স্কেরা এই সব মাছ নিয়ে গ্রামে ফেরে মেয়েদের জিহ্বাতে জল এসে পড়ে তারা মুখ বন্ধ করে চেয়ে দেখে। এইবার দড়িটা রীতিমত কাঁপতে শুরু করেছে—কি ব্যাপার? একটা ধূসর মূর্তি দেখা যাচ্ছে। “বর্শাটা কই?”—পীয়ার চীৎকার করে উঠল। পীটার বর্শাটা তার দিকে ছুঁড়ে দিলে। “কি—কি”—বাকী তিনজন

একসঙ্গে চোঁচিয়ে ওঠে। “সামলে, নৌকাটা উল্টে যেন যায় না - catfish-রে মাছটার ডান পাশে আঘাত করার সঙ্গে সঙ্গে তার ধূসর বিশ্রী দেহটা নৌকার উপর ঠেলে উঠল। কাঠের তক্তাগুলা সে কামড়াতে চেষ্টা করছে—নৌকাটার কাঁঠগুলি মড় মড় করতে থাকে তার দেহের আঘাতে। “সাবধান, সাবধান, উঃ” ক্লস ভয় পেয়ে বলল—জলের ওপর তার মত ভীতু ছেলে আর নেই।

কিন্তু পীয়ার ঠিক হয়ে বসেছে। তারা এতক্ষণে fjord-এর মাঝামাঝি এসে পড়েছে। এবার টান পড়েছে অগাধ জল থেকে—একটা নূতন ধরণের শব্দ হচ্ছে। কী এ? পীয়ারের হাতে দস্তুরমত জোর লাগছে—তার চোখে-মুখে ফুটে উঠেছে দৃঢ়তা—আর বাকি ক’জন রুদ্ধ নিঃশ্বাসে তার মুখের দিকে চেয়ে বসে আছে। “খুব জোর পড়ছে, নারে”—ক্লসের কণ্ঠ শোনা গেল। “চুপ কর না, কি চোঁচাচ্ছিস”—মার্টিন রেগে বললে—তার চোখ গভীর জলে ঐ লাইনটার দিকে নিবদ্ধ। পীয়ার এখনও টানছে। কোনও রহস্য যেন তাকে গভীর জলের দিকে আকর্ষণ করছে। কী ভয়ানক জোর লাগছে তার হাতে! এ খুব ভারী কোন জানোয়ারের আকর্ষণ নয়; কোন সাধারণ মাছের মত টানও হয়; কিন্তু তবু তার মনে হচ্ছে যেন কোন অদৃশ্য বিপুল শক্তি তাকে ধীরভাবে আকর্ষণ করছে, তাকে নৌকা থেকে টেনে ফেলে দেবার চেষ্টা করছে—ওই নীচে যেখানে জলের গভীরতা আরও গভীর রহস্য-সমাকুল। হঠাৎ একটা হেঁচকা টানে তাকে নৌকা থেকে ফেলে দেবার চেষ্টা করল।

—‘খুব সাবধান!’ “কি কি”? বাকী তিন জন ভয়ে চোঁচিয়ে উঠল। “চুপ করে বসুন”—পীয়ার আদেশসূচক কণ্ঠে বললে আর বাকী তিন জন স্থির ভাবে বসে রইল—ধীবরদের এই নীতি তারা অমান্য করলে না।

পীয়ার এক হাতে লাইনটা ধরে আছে—আর এক হাতে নৌকার ধারটা চেপে ধরল। “ওরে আর একটা বর্শা আছে?” পীয়ার রুকুনিখাসে কথাগুলি বললে!

“এই যে একটা”—পীটার লোহার ফলা দেওয়া আর একটা বর্শা এগিয়ে দিলে।

—“মাটিন, এইটে ধরে আমার পাশে দাঁড়া ত।”

—“কিন্তু কি হয়েছে কি?”

—“কি করে জান্ব কি হয়েছে—কোন বড় জানোয়ার নিশ্চন্দ্রই।”

—“তবে তাই লাইনটা কেটে দে—বাড়ী ফিরে চল” ডাক্তারের ছেলেরা কেঁদে ফেললে। আশ্চর্য্য এই ছেলেরা, ডাঙার উপর এ হয়ত দশটা ছেলের সঙ্গে লড়াই করবে, কিন্তু জলের ওপর ওর মত ভীতু আর কেউ নেই।

আর একবার পীয়ার নৌকা থেকে প্রায় পড়ে গিয়েছিল আর কি : গেল বছরের দাবান্নি নিববার মত এবার আর সে কোন দায়িত্ব ঘাড়ে নেবে না। হয়ত কোন মস্ত জানোয়ার নৌকাটার ওপর উঠে আসবে, তারপর নৌকাটা উল্টে দেবে—বাড়ী থেকে এতদূর এসে কি ভয়ানক বিপদ! সবাই যদি ডুবে যাই—আমারই ত সব দোষ? অল্পমনস্ক ভাবে সে পকেট থেকে ছুরিটা বার করলে, তারপর আবার কি ভেবে সেটা স্বস্থানে রেখে দিল।

ঐ যে দেখা যাচ্ছে—একটা বিপুল দেহভার জলের মধ্য দিয়ে এগিয়ে আসছে। জানোয়ারটা তার বিরাট দেহ নাড়ছে আর জল ফেনায়িত হয়ে উঠছে তার চারি পাশে। আর ঐ শাদা ওটা কি? দাঁত? বাপরে এতক্ষণে তার বুঝতে পারলে কি জানোয়ারটা নিয়ে তারা খেলা করছে। দক্ষিণ সমুদ্রে গ্রীনল্যান্ড হাঙ্গরের মত ভীষণ হিংস্র জন্তু আর নেই—ওর কতক্ষণই বা লাগবে এই ক’টি কিশোর বালককে জীবনান্ত করতে।

“খুব সাবধান মার্টিন, বর্শাটা ঠিক করে ধরে থাক।”

জানোয়ারটা এইবার জলের ওপর ভেসে উঠেছে—জল ফেনায় পরিণত হচ্ছে। লেজটা কেবলই জলে আছাড় মারছে আর ঐ ছুচোলো মস্ত মুখটা বকের তলার ভীষণ ভাবে নড়েছে। “এইবার নাও”। সঙ্গে সঙ্গে এক জোড়া বর্শা পশুটার দেহে আঘাত করল, নৌকাটা হলে উঠল। খানিকটা জল নৌকার ভিতর ঢুকে পড়ল। আর সঙ্গে সঙ্গে ক্লস ছাপতে কাপতে দাঁড় ফেলে দিয়ে গনুই এর মধ্যে ঢুকল—“ভগবান নাচাও”

পরমুহূর্তেই পূর্ণ মাস্তুরের মত একটা বিপুলকায় দেহ নৌকাটার ওপর এসে আছড়ে পড়ল। এইবার আসল বিপদের আরম্ভ। ছেলে দুটি বর্শা জোড়া ছেড়ে দিয়ে সরে দাঁড়াল—পশুটাকে জায়গা দেবার জন্যে। সেইখানে পড়ে জন্তুটা রেগে গর গর করতে লাগল—তার এক জোড়া শিকারী চোখে যেন আগুন ঠিকরে পড়ছে। তার সেই লেজের আঘাতে নৌকাটা এক একবার হলে হলে উঠেছে—নৌকার তলাটা যেন ভেঙ্গে পড়ে যাবে মনে হয়। মাঝে মাঝে সে উঁচু হবার চেষ্টা করছে, আবার পরমুহূর্তেই ভয়ানক যন্ত্রণার আছড়ে পড়ছে। তার মুখ দিয়ে জল আর গাঁজলা বেরুচ্ছে আর জলন্ত চোখ দুটি বলছে—“কাছে আর নাহোর, দেখিয়ে দিচ্ছি মজাটা।”

ইতিমধ্যে মার্টিনের মনে ভয় ঢুকেছে—হয়ত বা জন্তুটা নৌকাখানা টুকরা টুকরা করে ফেলবে। সে তার শাণিত দীর্ঘ ছুরিটা বার করলে—তারপর একটু ঝিকমিকি—পর মুহূর্তেই খানিকটা রক্ত ছিটকে পড়ল। পেছনের হাড় দুটোর মধ্যে ছুরিখানা গভীর ভাবে ঢুকে গেছে। “সাবধান পেছিয়ে।” কিন্তু ততক্ষণে মার্টিন জন্তুটার কালো লেজের আছাড়ের বাইরে এসে দাঁড়িয়েছে। এইবার মৃত্যুমুখী জন্তুটার শেষ চেষ্টা শুরু

হল। ছুরিটা জন্তুর পিঠের মধ্যে গভীরভাবে ঢুকে গেছে—একটা বর্শা জন্তুর চোখে বিদ্ধ হয়ে আছে আর একটা তার এক পাশে বিধে রয়েছে। জন্তুর প্রত্যেক আছাড়ে নৌকার কাঠ মড়মড় করছে।

“জানোয়ারটা সব ভেঙ্গে ফেলবে দেখছি, আমাদের যে সমুদ্রের নীচে গিয়ে দাঁড়াতে হবে।” পীয়ার চোঁচিয়ে বললে।

সঙ্গে সঙ্গে তার ছুরিটাও জন্তুর কাঁধের মধ্যে ঢুকে গেল—আর মুহূর্তের মধ্যে তাদের দুটা দেহ নৌকার এক পাশ থেকে আর এক পাশে গড়াতে লাগল।

“যীশু রক্ষা কর রক্ষা কর”—রুস কম্পিত কণ্ঠে কঁদে উঠল। “হাজারটা ওকে যে মেরে ফেলবে—ওয়ে মরে যাবে দেখছি।” সে নৌকার পাশটা জড়িয়ে ধরলে।

পীয়ার এতক্ষণে উঠে বসেছে, সে নৌকার পাশটা চেপে ধরতে যাবে ঠিক সেই সময়ে জানোয়ারটার দাঁত তার বাহমূলের উপর উদ্ভত হল। পীয়ারের মুখে গভীর যন্ত্রণার ছাপ। আর একটু হলেই তার ধারাল দাঁত তাকে শেষ করে দিত। কিন্তু চট করে পীটার তার দাঁড়টা ফেলে দিলে—সঙ্গে সঙ্গে তার ছুরিটা হাজারের চোখের মধ্যে আমূল বিদ্ধ হল। মস্তিষ্কের মধ্যে আঘাত লাগাতে পশুর দাঁত আলুগা হয়ে গেল।

“শ-য়-তা-ন জানোয়ার”—পীয়ার তোৎলাতে লাগল—সে আবার এসে দাঁড়টা ধরলে। এর একটু পরেই পীয়ার নিজেকে সামলে নিলে—তার কাঁধ দিয়ে তখনও রক্ত ঝরে পড়ছে। তার আঙুল রক্তে লাল হয়ে উঠেছে। অবশেষে তারা বাড়ীর দিকে নৌকার মুখ ফেরাল—নৌকাটা সেই বিরাট পশুর মৃতদেহে দুর্ভর হয়ে উঠেছে—কিন্তু হঠাৎ তারা সবাই একসঙ্গে থেমে গেল।

“কুথ কোথায়? তাকে দেখছি না যে?”—পীয়ার রুস্পিত কণ্ঠে

ক্রিষ্টিয়ান করলে—“ক্লস এইমাত্র যেখানে গুয়ে ছিল, সেখানে ত সে নেই।” সেই সমস্ত মোটা পনের বছরের ছেলেটি—যে এখন থেকেই তার প্রেমের গল্প বন্ধুদের শোনায়, যে নাকি জার্মান শিখে তার বাবার মত উদার ও মহানুভব হবে, সেই ছেলেটি মৃতবৎ পড়েছিল একেবারে গলুই এর ভেতরে।

অন্য সবাই ভয়ে কেঁপে উঠল—কিন্তু পীয়ার তার আঘাত জল দিয়ে ধুতে ধুতে অদৃশ্য একজনের মুখে অজানিতেই জলের ঝাপটা দিতে লাগিল। পরমুহুর্তেই ক্লস উঠে বসল—তারপর অদ্ভুতভাবে দাঁড়টা চেপে ধরে টেঁচাতে লাগল—‘লাইনটা কেটে ফেল ভাই, বাড়ী ফিরে চল।’

বাকী ক’জন হো-হা. করে হেসে উঠল। তারা দাঁড় নামিয়ে ফেললে। তার পর গভীর ভাবে নিঃশ্বাস নিতে লাগিল। কিন্তু বাড়ী যাবার আগে তারা তীরের উপর দাঁড়িয়ে প্রতিজ্ঞা করল যে, ক্লসের এই দুর্বলতা আর কারুর কাছে প্রকাশ করবে না। পরের কয়েক সপ্তাহ জুড়ে সমস্ত গ্রামটি এই চারটি দুর্দ্বন্দ্ব ছেলের কীত্তি কাহিনীতে মুগ্ধ হতে উঠল—অবশ্য তারা স্পষ্টই বুঝতে পারলে এর পর তাদের অবিভাবকদের কাছ থেকে হয়ত তাদের গ্যাং চাবুক তারা খাবে না।

পীরার যখন খুব ছোট ছিল তখন তাকে ট্রোয়েনে এক বৃদ্ধ দম্পতীর সঙ্গে বাস করবার জন্য পাঠিয়ে দেওয়া হয়। এর আগেও তাকে আরও চ'একবার আস্তানা বদলাতে হয়েছে। কিন্তু সে কথা এখন মনে পড়ে না। যাক, এখন সে গ্রামের মধ্যে একজন নামকরা গৌয়ার ছেলে, কিন্তু এর আগে তার প্রকৃতি ছিল নিম্প্রভ সকলকে এড়িয়ে একাকী নির্জনে থাকতে সে খুব ভালবাসত। লোকেরা যখন তার মার সম্বন্ধে আলোচনা করত, তখন তাকে দেখিয়ে “অভাগা ছেলে” বলে খেদ প্রকাশ করত। কেন ওরা ওকথা বলে? কেন রেগে গেলে পীটার বিনির্জনে তোংলাতে তোংলাতে বলত—“ছোট লোক, বেজম্মা।”

মুখে বসন্তের দাগ ওই শাদা মহিলাকে পীরার ‘মা’ বলত আর তার মামীকে বলত “বাবা”। সময় অসময়ে তাকে সে সাহায্যও করত— হয়ত মাছ ধরার সময় নৌকাতে অথবা কামারশালায় কাজের সময়।

তার শৈশব কেটেছে এমন সব লোকের সাহচর্যে—যারা হাসিকে পাপ বলে মনে করে—যাদের মন সমুদ্রের ধূসর কুয়াসার মত দারিদ্র্যের কালিমায় কদর্য্য, আর যারা নরকের ভয়ে সদাই শঙ্কিত।

একদিন কন্সম্পেক্ত হ'তে ফিরে এসে পীরার দেখতে পেলে—বৃদ্ধের। খাবার টেবিলে বসে নাক সিঁটকাচ্ছে আর দীর্ঘশ্বাস ফেলছে। কপাল থেকে ঘাম মুছে পীরার এর কারণ জিজ্ঞাসা করলে।

বড়ছেলে মুখে এক চামচ পরিষ্ক ছুঁড়ে দিলে, তারপর চোখ মুদে গিলে কললে—“হুভাগ্য পীরার!”

“হায়রে দুর্ভাগ্য বালক”—বৃদ্ধ দীর্ঘশ্বাস মোচন করে চামচেটা দেওয়ালের একটা গর্তে রেখে দিল—গর্তটা র্যাকের কাজ চালাত।

—“এবার মা ও বাবা দু’জনেই চলে গেল”—জানালার দিকে চেয়ে বড় মেয়ে ঝলল—“মা? সেকি?”

—“হ্যাঁ বাবা হ্যাঁ—” বৃদ্ধ সান্ত্বনা দিতে চেষ্টা করে—“সে স্বর্গে গেছে তার ভ্রাণকর্তার কাছে।”

তারপর দিন বয়ে যায়—পীয়ার কাঁদতে চেষ্টা করে। তার কাছে সবচেয়ে যে ব্যাপারটা খারাপ লেগেছে—সে হচ্ছে, বাড়ীর সবাই সুস্পষ্ট রূপে জানে তার মা কেথায় গেছে। স্বর্গে—সেখানে নিশ্চয়ই নয়! তবে কি করে তারা এত সুনিশ্চিত হতে পারে?

পীয়ার তার মাকে শুধু একবারমাত্র দেখেছে—যখন তিনি এই গ্রামে বেড়াতে এসেছিলেন। তখন তাঁর পরনে ছিল পাতলা একটি পোষাক—মাথায় বড় সোলার টুপি—পীয়ার এর পূর্বে এত সুন্দর আর কিছু দেখেনি। পীয়ারই তাঁর একমাত্র ছেলে নয়—তাঁর একটি মেয়েও আছে—নাম লুইস—ভিন্‌গ্রামে কোন এক পরিবারের সঙ্গে বাস করে এসব কথা তিনি প্রতিবেশীদের কারুর নিকট গোপন করেন নি। তখন তাঁর মেজাজ ছিল দিলদরিয়া—অনেক বিপদপূর্ণ গল্প বললেন আর এমন সব গান গাইলেন—যা কোনদিক দিয়েই রুচিসঙ্গত নয়। বৃদ্ধেরা তাকে দেখে মুখ ফিরিয়ে নিলে আর যুবকেরা তাকে আড়চোখে লক্ষ্য করতে লাগল। ষাবার সময় তিনি পীয়ারকে চুষনে ভরে দিয়ে গেলেন—যেতে যেতে অনেকবার পেছনে মুখ ফিরিয়ে দেখতে লাগলেন তাকে টুপির নীচে তার মুখটি বিমল হাসির আভায় দেদীপ্যমান। পীয়ারের নিকট তখন মনে হয়েছিল তার মা পৃথিবীর একজন সর্বশ্রেষ্ঠ সুন্দরী।

এখন তার সেই মা এমন রাজ্যে পৌঁছেছে যেখানে ভীষণদর্শন

নরকের কীটেরা বাস করে যুগযুগান্তর ধরে ঠপস্ঠা করলেও যেখান থেকে আর মুক্তির আশা সুদূরপর্যন্ত। সারাদিন পীয়ারের শুধু তার মা'র মুখ মনে হতে লাগল—মাথায় সেই বড় সোলার টুপি, পরণে পাতলা পোষাক—সেই গানের উৎসব আর প্রাণখোলা হাসি—।

তারপর এখন আর এক সমস্যা।

বালকটির গ্রাসাচ্ছাদনের ভার এখন কে বহিবে? অবশ্য বিবাহ রেজিষ্টার থেকে জানা যায় তার একজন বাবা আছেন—নাম তাঁর হোলম—ক্রিশ্চিয়ানাতে বাস করেন। কিন্তু যতদূর খবর পাওয়া গেছে, তার মা'র কাছ হ'তে তিনি বছদিন ফেরার অর্থাৎ তাঁর আর কোন পাতলাই পাওয়া যায় না। অতএব বালকটিকে নিয়ে এখন কি করা যায়?

এতদিনে পীয়ার বুঝতে পেরেছে, এখানে সে সম্পূর্ণ অপরিচিত—তার একমাত্র শুভার্থী এই বৃদ্ধদম্পতী তার পাতান মা আর বাবা।

কর্তদিন রাত্রে সে শুনেছে—পাশের ঘরে তাকে নিয়ে জোর বাদল বাদ চলছে—বৃদ্ধা কাঁদতে কাঁদতে বলেন—‘না-না’! আর সকলে প্রতিবাদ করে—“জান না ত সময় কি রকম খারাপ!” কিন্তু এটা পীয়ার ঠিক বুঝতে পেরেছে যে, শীঘ্রই তাকে কোন গোলাবাড়ীতে মেঘপালের রক্ষণাবেক্ষণের কাজে লাগিয়ে দেওয়া হবে।

তখন পীয়ার কন্ডলটা মাথার উপর টেনে দিত। অনেকদিন রাত্রে বৃদ্ধার ছেলেরা যদি কখনও কেউ জেগেছ ত শুনতে পেয়েছে কে যেন ঘুমের মধ্যে কাঁদছে ফুপিয়ে ফুপিয়ে দিনের বেলায় খাবারের টেবিলে সে যতদূর সম্ভবপর কম জায়গায় বসে সবচেয়ে কম খেয়ে উঠত। এবং প্রতিদিন তার খুম ভাঙত একটা আতঙ্ক নিয়ে যে, আজই হয়ত পালক মাতাকে বিদায় অভিনন্দন জানিয়ে তাকে পাড়ি দিতে হবে অপরিচিতের রাজ্যে।

ঠিক এমনি সময়ে fjordএর ধারে কুঁড়ে ঘরে একটি অভিনব—
অশ্রুতপূর্ব ঘটনা ঘটল।

একদিন একখানা রেজিষ্ট্রী চিঠি এসে উপস্থিত—প্রত্যেক কোণে
শীলমোহর করা আর ঠিকানাটা এমন পাকা হাতের লেখা যে, পড়াই
মুশ্কিল। প্রত্যেক লোক এসে বড় ছেলের চারিপাশে ভিড় জমাল—কি
রহস্য ওর মধ্যে আছে কে জানে? খামটা খুলতেই পাঁচখানা ১০ ক্রাউনের
নোট বেরিয়ে এল। “এ সব কার?” বিস্মিত কণ্ঠে সবাই চৈচিয়ে
উঠল।

এখন সমস্তা হচ্ছে সেই চিঠিতে কি লেখা আছে? চিঠি লেখক আর
কেউ নয় পীয়ারের বাবা! চিঠিতে লেখা আছে—

বালকটিকে ভাল করে রেখ—ছ’মাস অন্তর ৫০ ক্রাউন পাবে—দেখ
যেন ভাল খেতে, ভাল পরতে পায়। ইতি

—পি, হোলম, ক্যাপ্টেন।

“পীয়ার, তোমার বাবা একজন ক্যাপ্টেন—অফিসার”—তোৎলাতে
তোৎলাতে বড় মেয়ে আর এক পা পেছিয়ে গেল তাকে আরও ভাল করে
নিরীক্ষণ করতে।

“পূর্বে ওব জন্ম যা পেতাম এখন তার দ্বিগুণ পাব”—বড় ছেলে
নোটগুলো বজ্রমুষ্টিতে চেপে ধরে তার দিকে তাকাতে তাকাতে জানিয়ে
দেয় যেন স্বর্গের কোন দেবতাকে সন্মোদন করে সে সব কথা বলছে।

কিন্তু বৃদ্ধ মহিলার চিন্তাধারা তখন অন্তমুখে বয়ে চলেছে—কৃতজ্ঞতায়
সে জোড়করে ভগবানকে ধন্যবাদ জানাল—“যাক বালকটিকে আর
ভারতে হবে না।”

“যথোচিত ভাবে খাওয়াতে পরাতে”—সে ভাবনা আর নেই।
সেইদিনই পীয়ার খাবার সময় পরিজের সঙ্গে মধু পেলো। বড় ছেলে

তাকে একজোড়া মোজা কিনে এনে দিলে :—তখন তখনই পরতে হল—আর রাতে শোবার সময় বড় মেয়ে নূতন রাগের তলার তাকে একটু চাপ দিলে এ কঞ্চলটা আর পূর্বের মত লোমশূণ্য নয়। তার বাবা ক্যাপ্টেন একথা বিশ্বাস করতেও যে আশ্চর্য্য চক্রে।

সদিন থেকে পীয়ারের অবস্থা ফিরে গেল। গ্রামের লোকেরা এখন তাকে অন্তর্দৃষ্টিতে দেখতে লাগল। কেউ আর তাকে দেখে “হতভাগ্য বালক” বলে দীর্ঘশ্বাস মোচন করে না। সমবয়সীরা আর তাকে গালাগালি দিতে সাহস পায় না—বড়রা বলে, “ভবিষ্যৎ এর উজ্জ্বল।”

“—দেখ” তারা উপদেশ দেয় - “তোমার এই পিতাই তোমাকে জীবনে প্রতিষ্ঠিত করে দেবে। তুমি একজন বড়দের কেউ হবে—হয়ত বিশপই।” ক্রীষ্টমাসের সময় শুধু তার জন্মই ১০ ক্রাউনের একটা নোট এল—সে যা ইচ্ছে তাই করতে পারে এই টাকা নিয়ে। পীয়ার নোট ভাঙ্গিয়ে তার সংখ্যা আরও দ্বিগুণ করলে। বুক উঁচু করে এখন সে চলবে—বালকদের উপর সর্দারী করবে—এতে আর আশ্চর্য্য হবার কি আছে? সে ত রাজপুর! এমন কি, একদিন সেই ডাক্তারের ছেলে রুস ব্রক এসে তাকে তাস খেলা শিখিয়ে দিলে, “কিহে, এখন, নিশ্চয়ই আর বিশপ হবার আকাঙ্ক্ষা নেই”—সে জিজ্ঞাসা করে।

কিন্তু এর জন্ম কেউ বলতে পারবে না যে, পীয়ারের এখন চাল বেড়ে গেছে—মাছ ধরতে বা কামারশালার সাহায্য করতে সে এখন লজ্জা বোধ করবে। বরং যখন রক্তবর্ণ লৌহশলাকা হতে ফুলিঙ্গগুলি বের হয়—ঝিকমিক করে হাওয়ায় নাচতে থাকে—তখন তার মনে নূতন স্বপ্নের উদয় হয়—স্বপ্ন যা অনাগত ভবিষ্যে সফল হবে। বিশপ সে হবেই—যদিও সে এখন পাপী উচ্ছৃঙ্খল বণ্ডুযুবক—সময় সময় ছোটলোকদের মত শপথ

করে, অভিশাপ দেয়—সে শুধু তাদের দেখাবার জন্তে যে, ধর্মের অনাচারে পৃথিবী ফাঁক হয়ে কাউকে গিলে নেয় না। তবুও সে বিশপ হবেরই। চোখে চশমা আটা পেটমোটা পুরুতদের মত নয়;—সে হবে স্বর্গের দূত—শুভ্র বেশ, বিভাষিত আনন। এমন দিনও আসতে পাবে যখন ধাতনার নরকে গিরে তার মাকে মুক্তি দেওয়ার ক্ষমতা তার জন্মাবে আর হেমহের সক্ষ্যর রাজপুরীর বাহিরে যখন সে এসে দাঁড়াবে—শুভ্রকেশ বিশপ—তারাগুলির দিকে শুধু একবার মাত্র অঙ্গুলী সঙ্কেত—অমনি সঙ্গীতের তরঙ্গে তরঙ্গে তারা মুখর হয়ে উঠবে।...

—“ক্লিং—ক্লিং”—হাতুড়ীর শব্দ ভেসে আসছে।

গ্রীষ্মের শান্ত দীর্ঘ দিনে একদল বালক নগ্ন প্রান্তুর পেবিয়ে বনভূমির দিকে অগ্রসর হয়—গাভীগুলিকে গৃহে আনতে। দোহনের সময় যে আগতপ্রায়! যত উর্কে তারা ওঠে ততই সমুদ্রের মূর্ত্তি আরও স্পষ্ট হয়ে উঠে। ঘণ্টা দুই পর সূর্য্য অস্ত যায়; পূসরবর্ণ গাভীর সারি গুহ মুখে ঢলে—তাদের গলার ঘণ্টা বাজতে থাকে—বনভূমি আর পাহাড় মুখরিত হয়ে ওঠে। বালকদের চীৎকার ভেসে আসে—“হেই হেই”

বড়রা যেমন পান খান তেমনি এ্যালিডার গাছের ছাল তারা সোৎসায়ে চিবায়—লাল কসের পীক ফেলে। আর তাদের পারের তলে—পাহাড়ের নীচে গোলাবাড়ীগুলি অন্ধকারে স্নানায়মান হয়ে আসে—fjord এর জল আসন্ন সক্ষ্যর আনোয় হলুদবর্ণ ধারণ করে—যেন প্রকাণ্ড একখানা আরশী। লাল মেঘ, নৌকার শাদা পালের ছবি, আর ক্যাকাশে নীল পাহাড়ের ছায়া নদীর জলে প্রতিফলিত হয়।—আরও দূরে সমুদ্র আর নিগন্ত যেখানে জড়াজড়ি করে আছে, ঠিক তারই পরে শুকতারা কেকারী কাপতে কাপতে শিউরে ওঠে।

এমনি এক সন্ধ্যায় পীয়ার সবমাত্র পাহাড় থেকে নেমেছে—ঠিক সেই সময় একটি ভদ্রলোক ঘোড়ার গাড়ী চড়ে বড় রাস্তা ছেড়ে troenএর রাস্তা নিলে—দেখতে পেল ঘোড়াটা কিছুদূর গিয়ে একটা ছোট ব্রীজের কাছে এসে থেমে গেল। চালক লাগাম চেপে ধরে কসে এক চাবুক লাগাল। ঘোড়াটা প্রতিবাদ স্বরূপ পেছনের পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে উঠল—গাড়ী উল্টে যায় আর কি! “নাঃ—আমাকে দেখছি হেঁটেই যেতে হবে”—ভদ্রলোকটির ক্রুদ্ধ স্বর শোনা যায়। তিনি লাগামটা পাশের ছেলের হাতে দিয়ে নেমে পড়লেন। ঠিক সেই সময় পীয়ার সেখানে এসে উপস্থিত।

“এই ছোঁড়া” ভদ্রলোকটি জিজ্ঞাসা করল—“তুমি, এই ব্যাগটা বয়ে নিয়ে যেতে পারবে?”—আরও কিছু বলতে গিয়ে তিনি হঠাৎ ধেম্বে গেলেন—এক পা পিছিয়ে তাকে আরও নিবিষ্টভাবে নিরীক্ষণ করতে লাগলেন। “একি তুমি! তোমার নাম পীয়ার?”

‘হ্যাঁ’ পীয়ার উত্তর দেয়—একটু অদ্ভুতও লাগে—মাথার টুপি খুলে ফেলল।

“বেশ, বেশ—আমার নাম হোলম।”

বালকটি গাড়ী নিয়ে চলে গেল। একজন শহরের ভদ্রলোক আর একটি তালি দেওয়া ট্রাউজার পরা রোগা গ্রামের বালক—তারা সেখানে মুখোমুখী দাঁড়িয়ে পরস্পর পরস্পরকে নিরীক্ষণ করতে লাগল।

ভদ্রলোকটির বয়স পঞ্চাশ বা তার কিছু বেশী হবে। কিন্তু এখনও মেরুদণ্ড বেশ দোজা—বলিষ্ঠ। চুলও বেশ ঘন সন্নিবেশিত—দাঁড়িতে অবশ্য একটু পাক ধরেছে—ফেণ্ট হ্যাটের তলায় তার চোখ দুটি জল্ জল্ করছে; ওভার কোটের বুক খোলা—ওয়েষ্ট কোটে রক্ষিত ঘড়ির সোনার চেন দেখা যাচ্ছে। তাঁর এক হাতে ছাতা, একজোড়া গ্লাভস—আর

এক হাতে হাক্কা ট্রাভেলিং ব্যাগ, পায়ে চকচকে জুতা। চমৎকার দেখতে ভদ্রলোকটিকে? এমন ভদ্রলোক এপর্যন্ত পীয়ারের চোখে আর কখন পড়েনি। আর ইনিই তার পিতা!

—“তাহলে এই তোমার চেহারা—বয়সের অনুপাতে খুব বড় নও কত এখন—যোল বৎসর? তারা তোমায় ভাল খেতে পরতে দেয়ত?”—

—“হ্যাঁ”—দৃঢ়তার সহিত পীয়ার উত্তর দেয়।

তারপর তারা দু'জনে সেই fjord-এর ধারে ধূসর কুটীরের দিকে রওনা হ'ল। চলতে চলতে হঠাৎ লোকটি থেমে পড়ে—অন্ধনির্মীলিত নেত্রে কি যেন চেয়ে দেখে।—এইখানে এতদিন বাস করছ?

—“হ্যাঁ।”

—“ঐ সামনের ঐ ছোট্ট কুঁড়েঘরে?”—

—“হুঁ—ঐ বাড়ী; নাম ট্রিয়েন—

—ওদিকটা অমন বেরিয়ে রয়েছে কেন?—কোনদিন সবশুদ্ধ ভেঙে পড়বে!

পীয়ার হাসতে চেষ্ঠা করে, কিন্তু গলার মধ্যে কেমন একটা বাধা অনুভব করে। পিতামাতার বাড়ী সম্বন্ধে কোন ভদ্রলোক অবজ্ঞাসূচক কোন কথা বললে প্রাণে লাগে বই কি!

অপরিচিত ভদ্রলোকটি গৃহদ্বারে পৌছাতে এক বিরাট সাড়া পড়ে গেল। বৃদ্ধ মহিলাটি ময়দার চাম্চারি সামনে নিয়ে রুটি তৈরী করতে মহা ব্যস্ত—দেহের কতক অংশ একদম শাদা হয়ে গেছে, আর তার স্বামী নাকে চশমা এঁটে একটা জুতা সেলাই করছিলেন—মেয়ে দুইটি সূতা কাটার যন্ত্রের মধ্য হইতে এক গাফে বেরিয়ে

“এই যে, আমার নাম, হোলম”—পথিক চারিদিকে চোখ বুলিয়ে
নেয়—একটু হাসেও।

“কি ভয়ানক কথা—ক্যাপ্টেন নিজে!” বৃদ্ধা তার জামাকাপড়ে হাত
মুছতে মুছতে সবিস্ময়ে বলে।

ভদ্রলোকটি খুব অমায়িক—শীঘ্রই সকলের সঙ্গে আলাপ জমিয়ে
ফেললেন। তিনি একটি সম্মানিত আসনে উপবেশন করলেন—কথা
বলতে বলতে পিঠ চাপড়াতে থাকেন—যেন নিজের বাড়ী! বৃদ্ধার একটি
মেয়ে কয়েক দিনের জন্য শহরে এক কনসালের বাড়ীতে কাজ করেছিল,
কাজেই ভদ্রলোকদের আদব-কায়দা সে জানে। সে এক বাটী দুধ এনে
তাকে দিল খুব ভদ্রতার সহিত—“ক্যাপ্টেন যদি ইচ্ছা করেন”।

“ধন্যবাদ, তোমার নাম কি খুকি, লজ্জা পাবার কিছু নেই, বল”।

“নিকোলাইন।”

—বেশ!

—তোমার?

—“লুসিয়ানা।”

“এও বেশ নাম”।—এই বলে লাল ডোরাকাটা, ছধের পাত্রের দিকে
একবার চেয়ে নিয়ে এক চুমুকে সেটা নিঃশেষ করে ফেললেন, রুমাল
দিয়ে দাড়ি মুছে আবার নিশ্বাস নিলেন। “ব্যস—এই ভাল”; তারপর
এই বলে তিনি সকলের দিকে চাইলেন, তারাও তাঁর দিকে চাইলে;
ভদ্রলোকটি হাসলেন, টেবিলের উপরে আঙ্গুল দিয়ে শব্দ করতে লাগলেন।
“বেশ বেশ”—সব ব্যাপারেই তিনি যেন খুব সন্তুষ্ট। “এবার
নিকোলাইন”—তিনি হঠাৎ বলে উঠলেন—“তোমার টাইটেল সম্বন্ধে জ্ঞান
দেখছি খুব টনটনে—এবার জেনে রেখ—আমি আর ক্যাপ্টেন নই—
তারা আমাকে লেফটেন্যান্ট কর্ণেল করে এই দিকে পাঠিয়েছে। এখানে

তোমাদের গ্রামে আমার স্ত্রীর একখানা বাড়ী আছে—নীচুই সেখানে আস্তানা নেব। ভবিষ্যতে কোন বন্ধুবান্ধবের মারফৎ চিঠি পাঠিও যাক, এ সম্বন্ধে পরে আরও আলোচনা করা যাবে”—যতক্ষণ তিনি কথা বলছিলেন ততক্ষণ আঙ্গুল দিয়ে টেবিল বাজাচ্ছিলেন—আর মুখে সেই অমিশ্র মধুর হাসি। তাঁর হাতের দস্তানায় সোনার কাজ করা মাটের সম্মুখভাগ সোনার তারকা খচিত—পীয়ার এসব লক্ষ্য করেছে।

তিনি একটা প্যাকেট বের করে বললেন—“পীয়ার এদিকে এসে দেখ, কি এনেছি।”

বিশেষ আর কিছুই নয় একটা রূপার ঘড়ি।

পীয়ার কিন্তু তখন অনেকটা দমে গিয়েছিল—কারণ একদোড়ে সেই মুহূর্তেই সকলকে ঘড়িটা দেখিয়ে আনবার ক্ষমতা তার নেই।

—“এই তোমার পিতা”—বৃদ্ধা বলতে বলতে কেঁদে ফেলল।

কিন্তু ভদ্রলোকটি তার পিঠ চাপড়ে বললেন—“পিতা পিতা! হু, এসম্বন্ধে সঠিক কিছু বলা কঠিন—হা-হা হা!”

হা-হা-হা—বৃদ্ধটি প্রতিধ্বনি করলে—হাতে তখনও সেলাই করার হুঁচটা। এরকম রসিকতার সে বেশ সমাজদার।

এইবার ভদ্রলোকটি চারিদিক পরিদর্শন করতে বের হলেন, হাত দুটা কোটের পকেটে ঢোকান। আকাশের দিকে তাকালেন, নদী দেখলেন, পরিশেষে মন্তব্য করলেন—“বেশ, বেশ।” পীয়ার সর্বক্ষণ তাঁর অনুগমন করছে—লোকে তারার দিকে যেমন করে চায় ঠিক সেইভাবে এতক্ষণ সে তার বাবাকে নিরীক্ষণ করেছে।

প্রতিবেশীদের একটি ঘরে আজ তাকে রাত কাটাতে হবে। সেখানে ধর ও বিছানা পাওয়া গেছে—পীয়ার ব্যাগ হাতে করে পিছনে পিছনে চলল মাটিন ক্রোভান্ডদের বাড়ীতেই থাকবার ব্যবস্থা হয়েছে—তাঁকে

দেখতে অনেক লোকজন সমবেত হয়েছে। মার্টিন নিজে বাহিরে দাঁড়িয়ে আছে।

—“এ তোমার বন্ধু বুঝি। বেশ বেশ—এই নাও, একটা বড় গোলাবাড়ী কিনতে পারবে।” একখানা পাঁচ ক্রাউনের নোট—মার্টিন হাঁ করে চেয়ে রইল—নিজের চোখকে যে বিশ্বাস করা যায় না। বাস্তবিক বাবা বলতে যা বোঝায় পীয়ারের বাবা ঠিক তাই।

একজন ভদ্রলোকের পোষাক ছাড়া দেখাও বেশ মজার। “আমিও একদিন এরকম করব”—পীয়ার মনে মনে ভাবে—ব্যাগ থেকে একটি একটি করে যতই আশ্চর্য্য জিনিস বের হতে থাকে। একটা রূপার হাতওয়ালা ব্রাস। পায়চারী করতে করতে দাড়ি ও চুল আঁচড়ালেন—মাঝে মাঝে গুন গুন করে গান গাইতে লাগলেন। কলারের কাছে লাল লাইন করা আর একটা শার্ট—রাত্রে গায়ে দিয়ে শোবার ‘জন্ম’। এসব দেখে পীয়ার ঘাড় নাড়তে লাগল। বিছানায় গুয়ে রূপার সিপি আঁটা একটা ফ্লাস্ক বের করে পেয়ালায় খানিকটা মদ ঢেলে খেয়ে ফেললেন। তারপর হাত বাড়িয়ে পাইপটা টেনে নিলেন। বেশ যখন স্বাচ্ছন্দ্য অনুভব করতে লাগলেন, তখন পীয়ারের সঙ্গে কথাবার্তা আরম্ভ হল তখনও ঠোটের কোণে সেই হাসি।

—“বেশ, স্কুল কেমন চলছে?”—

পীয়ার হাত ছুটি পেছনে ভাঁজ করে এক পা সামনে বাড়িয়ে দিলে।

—“বারকে বার দিয়ে গুন করলে কত হয়?”

.....পীয়ার দশের ঘরের বেশী নামতা শেখে নি।

স্কুলে কি জিমনাস্টিক শেখায়?

—“জিম -? কি সে?”

“—এই লাকান, ভলটিং ড্রিল,—ইত্যাদি ?”—

—“কিন্তু এ সব শেখা কি খারাপ নয় ?”—

—“খারাপ ? হা-হা-হা—খারাপ বলছ ? এইরকম বৃদ্ধি এখানে সব শেখান হয় ! বে—হা হা । দেশলাইটা দাও ত দেখি ।’ নিঃশব্দে তিনি খানিকক্ষণ ধূম পান করলেন । তারপর হঠাৎ—“দেখ তোমার একটি বোন আছে জান ?”

—হ্যাঁ—

“সৎ-বোন । আমি নিজেই জানি নে কি রকম । কিন্তু আমি তোমার ভরণ-পোষণের জন্য বরাবর টাকা পাঠিয়ে আসছি । টাকাটা তোমার মার কাছেই পাঠিয়ে দিতাম—সেই হতভাগিনীর আর একটি মেয়ে ছিল কিন্তু তাকে দেখবার কেউ ছিল না । কাজেই টাকাটা দু’ভাগ করে সে তোমাদের দু’জনকে দিত । হা হা হা—হতভাগিনী ! অবশ্য এর জন্য তাকে দোষ দেওয়া যায় না : যাক, তোমার সেই সৎ-বোনকে দেখতে হবে --যতদিন না সে বড় হয়ে ওঠে । কি—ঠিক না—তোমার কি মনে হয় ?”

পীয়ারের চোখ ভেদ করে জল বেরিয়ে আসতে লাগল—ঠিক কি না ! নিশ্চয়ই ঠিক ।

পরের দিন পীয়ারের পিতা চলে গেলেন । যাবার পূর্বে ট্রোয়েনের বাসগৃহে সেজে গুজে নিলেন, মাথায় দিলেন ফেণ্ট হ্যাট, গায়ে চড়ালেন ওভারকোট । যখন শেরিফ চার্চের দ্বারে public notice. দেয়, ঠিক তার ভঙ্গিতে—তারপর বললেন—‘এই বছরই ছেলেকে স্কুল ভর্তি করে দেবে’ ।

—“নিশ্চয়ই”—রুদ্ধ তাড়াতাড়ি উত্তর দেয় ।

—“তারপর, গ্রামের সব চেয়ে ভদ্রবেশী বালকদের মত তাকে

সুসজ্জিত দেখতে চাই। স্কল-মাষ্টার আর পাদ্রীকে প্রেজেন্ট দেবার জন্তু আরও ৫০ ক্রাউন নাও।” তিনি কয়েক খানা নোট বের করে দিলেন ‘পরে’, তিনি বলে চললেন—‘ওকে একটু দেখবে শুনবে—যাতে বেশ সম্মানের সঙ্গে ও জীবনে প্রতিষ্ঠিত হতে পারে।’ কিন্তু প্রথমে দেখতে হবে, ও কি চায়—কোন বিষয়ে ওর ঝোঁক আছে। ওকে বরং একবার শহরে পাঠিয়ে দিও—এসম্বন্ধে আলোচনা করা যাবে। কনফারম্ন্ড হলেনই আমি চিঠি লিখে জানাব। আর যদি এর মনো আমার কিছু ঘটে, তাহলেও ওর জন্তু ব্যাঙ্কে কিছু টাকা জমান আছে। আমার এক বন্ধু সব জানে—তাকে লিখলেই পাবে। বেশ—এবার বিদায়”—।

—এই বলে তিনি ডাঙিনে বামে সহাস্রমুখে সকলের সহিত করমর্দন করে, ট্রপি ছলিয়ে চলে গেলেন। এর পরের কয়েকদিন পীয়ার, সেন • হা ওয়ায় ভাসতে লাগল—এই সাধারণ মাটির পৃথিবীতে পা ফেলে চলা—ভাব পক্ষে ছুঁকর হয়ে উঠল। লোকেরা ব্যাঙ্কে জমান টাকার অঙ্ক নিয়ে তার মাথা গুলিয়ে দিতে লাগল। মাত্র এক হাজার ক্রাউন হতে পারে—এক মিলিয়নও হওয়া বিচিত্র নয়। এক মিলিয়ন! এখানে সে এখন হেরীং খায়—টম, ডফি, হেরীর সঙ্গে বাজে গল্প করে—আর তার নিজের আছে পুরা এক মিলিয়ন ক্রাউন! উঃ।

হেমন্তের শেষে একদিন তার কনফারমেশন হয়ে গেল। চার্চের কাঠের বাড়ী—দেওয়াল আলকাতরা রং করা—চারিদিকে অত্যাচ্চ বৃক্ষের সারি—ঘণ্টা বাজতে লাগল মধুর স্বরে—হেমন্তের নীল আকাশ মুখর করে পীয়ারের মনে হতে লাগল ঠাকুরমা তাকে যেন আদর করে ডাকছে—‘এস এস ঘু। বৃদ্ধ—সব এস—fjord এর উপত্যকা হতে—
‘উঃ!—দক্ষিণ হতে সবাই আজ আমার কাছে এস।’ পূর্বেও গর্জ্জাটি এখানে ছিল, সপ্ত-ধুগ ধরে সে সকলকে এমনিভাবে আহ্বান করেছে—

আজ আমাদেরও ডাকছে? ছেলের দল নূতন পোষাকে সজ্জিত হয়ে সেখানে সমবেত হয়েছে—অতি-যত্নবিশিষ্ট রুমাল দিয়ে নাক মুছে পীটার রনিনজেন ঐ আসছে—ভাগ্যক্রমে এবার সে পাশ করেছে। ওর নূতন পোষাক এখনও তৈরী হয়নি—তাই জ্যাকেট পরে এসেছে। বালকেরা জিজ্ঞাসা করে—“কেমন আছ?”—ও বুড়াদের মত হাসতে চেষ্টা করে। দু’একজনের হাত শুলে ঝগড়া হয়েছে—তাদের কলহ নিষ্পত্তি হতে এখনও দেরী আছে, কিন্তু সবাই আজ পুরান ক্ষতের কথা বিস্মৃত হয়েছে। পীয়ার জোহান ফোজাকে দেখতে পেলে—বিগত জানুয়ারিতে সে তার পেন্সিল চুরি করেছিল। কিন্তু আজ সেই সামান্য জিনিষ নিয়ে মাথা ঘামাতে ইচ্ছা হচ্ছে না। “কি রে কেমন আছ?”—চার্চের সিঁড়ি বেয়ে উঠতে উঠতে দু’জনে দু’জনকে জিজ্ঞাসা করে— অর্গানের ঝঙ্কার দরজা ভেদ করে তাদের অভ্যর্থনা করতে আসছে।

এই ক্ষুদ্র গীর্জা আজ কত সুন্দর মনে হচ্ছে—দেখা হলেই যেন আদরে অভ্যর্থনা করা। এই রং করা কাচের সাসি ভেদ করে যে স্নানভ কিরণ ঘরে এসে পড়ে তাতে অতি কুৎসিত মুখও সুন্দর দেখায় অর্গানের সুর যেন আলোরই প্রতিমূর্তি—শব্দে রূপায়িত হয়েছে। নেভের এক পার্শ্বে ছেলোদের ভিজা মাথা দেখা যায়, আর এক পার্শ্বে নূতন মায়ের দল—হাতে কারচিপ, প্রেমার বুক—উৎসুক মুখ—এই প্রথম মাতৃস্বের সম্মানে তারা সম্মানিত। বড়রা আজ সকলের পশ্চাতে স্থান নিয়েছে—মাঝে মাঝে প্রার্থনা পুস্তক হাতে মুখ তুলে সামনের মেয়েদের দেখছে—কে জানে তাদের জীবনের গতি কোন মুখে ছুটবে। আন তরুণীরা ভাবছে—আজ নূতনের আবিভাব হয়েছে। হাসি-খেলার দিন আজ হতে শেষ হয়ে গেল—আমরা এখন জ্যেষ্ঠাদের সমকক্ষ।

দেওয়ালে অঁকা এ্যাঞ্জেলরা অর্গানের আর মঞ্জুর-স্বর পেয়েছে—

তারা গীর্জার ছাদকে স্বর্গের চাঁদোয়ার রূপান্তরিত করেছে। সঙ্গীত আর আলোক আর কানাকানি সব মিশে ওপরের নিঃসীম শূন্যে মিলিয়ে যাচ্ছে।

পীয়ার চিন্তা-ভারাক্রান্ত ! “যত ধনীই হই না কেন, আমি প্রীষ্ট হবই তারপর সমস্ত অর্থ দিয়ে একটা গীর্জা তৈরী করাব—যার জুড়ীদার কেউ দেখেনি’। আর সেখানে যাদের বিবাহে প্রথম পৌরোহিত্য করব—তারা হচ্ছে মার্টিন ব্রভোল্ড আর তার ছোট বোন লুইস—অবশ্য যদি সে লুইসকে পছন্দ করে”। বৈষ্য ধর, দেখ কি হয়।

কয়েকদিন পরে পীয়ার তার বাবাকে চিঠি লিখলে—শহরে আসতে ও স্কুলে ভর্তি হবার অনুমতি প্রার্থনা করে। অনেকদিন কেটে গেল—শেষে একখানা চিঠি এল, কিন্তু লেখাটা অপরিচিত হাতের। আবার বন্ধের দল ট্রয়েনে সমবেত হল—দেখতে—চিঠিতে কি লেখা আছে। সবাই আশ্চর্য্য হয়ে শুনলে—

“তুমি নিশ্চয়ই এতদিনে খবরের কাগজ থেকে জানতে পেরেছ যে, তোমার শুভার্থী কর্ণেল হোলম ঘোড়া থেকে পড়ে প্রাণত্যাগ করেছেন। তুমি যত শীঘ্র পার আমার সঙ্গে নিজে এসে দেখা কর—কতকগুলি দরকারী ব্যাপার আছে।”—ইতি কে গ্রাণ্ড, সিনীয়ার মাষ্টার।

তারা পরস্পরের মুখ চাওয়াচারি করতে লাগল।

পীয়ার কাঁদছে—ট্রয়েনবাসীদের, গরু দুটি, আর তাদের বাছুর, শাদা বেরালকে ছেড়ে যেতে হবে—এই চিন্তা তাকে বেশী পীড়া দিতে লাগল। তাকে ক্রীষ্টিয়ানাতে স্কুলে যেতে হবে—কালই। সেখান থেকে যখন ফিরবে বৃদ্ধ মাকে হয়ত তখন আর পাওয়া যাবে না।

সুতরাং বৃদ্ধা—মুখে বসন্তের দাগ, ধনুকের মত বাকান পাওয়ালা বৃদ্ধ আঁা পীয়ার—তিনজনে ভারাক্রান্ত হৃদয়ে তীরে এসে দাঁড়াল—

পীয়ার তাড়াতাড়ি ষ্টিমারে চড়ে বসল—তারপর তীরের মানব মূর্তি দুইটি
 ক্ষুদ্র হ'তে হ'তে একেবারে মিলিয়ে যেতে লাগল। একটি একটি করে
 সমস্ত কুঁড়েঘর অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে—দ্রোয়েনকেও আর দেখা যায় না—
 পাহাড় বন—যেখানে সে ring strapes কেটেছে, হারিয়ে যাওয়া পশুর
 সন্ধানে ঘুরে বেড়িয়েছে--তাদের সেই অতি পুরাতন গীর্জার চূড়া--
 যত পরিচিত জীবন, বাল্যের লীলাক্ষেত্র-- সব ধীরে ধীরে মিলিয়ে গেল—
 তার বাল্য নাট্যের শেষ অঙ্কে কেয়েন হঠাৎ সমাপ্তির যবনিকা টেনে
 দিলে।

সন্ধ্যার আগমনে ডাহিনে বামে চারিদিকে অন্ধকারের সমুদ্রে হঠাৎ আলো জ্বলে উঠল। পিঠে কাঠের বাক্স ফেলে সে রাস্তায় বেরিয়ে পড়ল—বাসস্থানের গোঁজে, যেখানে গ্রামের লোকেবা শহরে এল সাধারণত থাকে। এর আগে লফটেনের নৌকাগুলির সঙ্গে এখানে এসে সে তার সন্ধান জেনে গেছে।

পবদিন সকালে উঠে ঘরে তৈরী পোষাকে সজ্জিত হয়ে, রিভার ট্রীট পেরিয়ে চলল সে—পুলের পরে সেই পাহাড়ের সান্নিধ্য পর্য্যন্ত। কিন্তু তার পর সে ত আর পথ চেনে না। পথের লোককে জিজ্ঞেস করতে হয়—অবশেষে শাদা রং করা এক বাড়ীর সম্মুখে এসে উপস্থিত হল। এট ত সেই বাড়ী—মেখানে তার ভাগ্য পরীক্ষা হবে। গ্রামের রীতি অনুসারে সে রান্নাঘরের দিকে গেল।

একটি ছুঁপুঁটে মেয়ে—গায়ে একটা বড় শাদা গ্র্যাপবন—রান্না ঘরে কাজ করছে, টুংটাং শব্দ ভেসে আসছে—কফি বা আর কোন উপাদেয় খাণ্ডের রুচিকর গন্ধে বাতাস আমোদিত হয়ে উঠেছে। হঠাৎ দরজা খুলে গেল—লাল চুলওয়াল। একজন লোক বেরিয়ে এল—লাল নাকের উপর সোনার চশমা, চুলগুলি ঘনবিন্যস্ত—ছোট ছোট শাদা দাড়ি। বার দুই সে দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করলে—তারপর কাসী শুরু হল—থক্ থক্—রুমাল দিয়ে নাকটা মুছে নিয়ে জিজ্ঞেস করল—“উঃ কি শীত পড়েছে আর ঝঞ্জে নাই। বার্থী, আমার মোজাগুলার দশা কি হল—সেগুলো শুকিয়েছে কি?”

—“সকাল বেলা যখন থেকে—উনান ধরিয়েছি তখন থেকেই আ গুনের ধারে টাঙ্গিয়ে রেখেছি”—মাথা নেড়ে মেয়েটি উত্তর দেয়।

—“তুমি কে হে ছোকরা”—এবার সোনার চশমা পীয়ারের দিকে ফিরল—পীয়ার উঠে নমস্কার করলে।

—“আপনার সঙ্গে দেখা করতে চায়”—মেয়েটি তার হয়ে বলে।

—“আঃ দেখছি গ্রাম থেকে এসেছে। কিছু বিক্রী করবার জন্ম এনেছে নাকি ?”...

“না”—পীয়ার বললে। তার কাছে একটা চিঠি আছে।

লাল মাথা এবার সত্যসত্যই ভয়ে শিউরে উঠল—ড্রেসিং গাউন খেন পিছু হঠল কোন একটা অবলম্বন ধরবার জন্ম। মেয়েটির দিকে সতর্ক দৃষ্টি ফেলে লোকটি পীয়ারকে ইঙ্গিত করল—“হ্যা ঠিক ঠিক। এই দিকে এস।”

পীয়ার একটা ঘরে এসে উপস্থিত হল—চারিদিকে দেওয়ালে সাজান বই—আর ঠিক মধ্যখানে একটা বড় টেবিল। “বস হ ছোকরা”। স্কুলমাষ্টার বড় একটা পাইপে তামাক ভরতে ভরতে গলাটা পরিষ্কার করে নিলেন—মাঝে মাঝে বালকটির দিকে ভয়চকিত দৃষ্টিও নিক্ষেপ করতে লাগলেন। “তাহলে তুমিই পীয়ার!” পাইপ ধরিয়ে ধোঁয়া ছাড়তে থাকেন—কিন্তু হাঁচিতে পেয়ে বসল। শেষটার টেবিলের ধারে চেয়ারে গুরে পা জোড়া সামনের দিকে ছড়িয়ে আবার ধোঁয়া ছাড়তে লাগলেন।

“এই তাহলে তোমার চেহারা।” তাড়াতাড়ি হাত বাড়িয়ে ফ্রেনে হাথা একটা ছবি ধরলেন—পীয়ার দেখলে ইউনিফরম্ পরা তার বাবার চেহারা। স্কুলমাষ্টার চশমাটা তুলে কপালের ওপর ধরলেন—ছবিটার দিকে খুব নিবিষ্ট দৃষ্টি নিক্ষেপ করে চশমা রেখে দিলেন—আবার পীয়ারকে

খুব ভাল করে দেখতে লাগলেন। কয়েক মিনিট নিশ্চিন্তা—কে যেন অশ্রুট স্বরে বললে—“হঁ তাই ত দেখছি।” তারপর পীয়ারের দিকে মুখ ফিরিয়ে স্কলমাষ্টার বলে—“তোমার শুভার্থী হঠাৎ-ই মারা গেছেন—তার মৃত্যু খুবই অপ্রত্যাশিত—আজ তাকে কবর দেওয়া হবে।”

“শুভার্থী”—পীয়ার ভাবতে লাগল—“কেন বলে না ‘তোমার বাবা’!” স্কলমাষ্টার বাগানের দিকে তাকিয়ে রইলেন।

—“কিছুদিন আগে তিনি আমাকে সব কথা বলেছেন। তাঁর যা কিছু সবই তোমাকে দিয়ে গেছেন। আর তোমার উপর লক্ষ্য রাখতে আমায় বলে গেছেন—যাতে তোমার কোন অনিষ্ট না হয়। এখন—” হঠাৎ চশমা জোড়া পীয়ারের দিকে এগিয়ে এল—“এখন তুমি জীবনে প্রতিষ্ঠিত হ’তে যাচ্ছ।”

“হঁ।”—পীয়ার নিজের সীটে একটু সরে বসল।

“এখন তোমাকে ঠিক করতে হবে—কোন পথ অবলম্বন করবে।”

—“হঁ।”—পীয়ার আরও সোজা হয়ে বসল।

—“তুমি হয় ত জেলে হ’তে চাও—যাদের মধ্যে তুমি লালিত পালিত হয়েছ”—?

—“না”—পীয়ার অনিচ্ছাজ্ঞাপক ভাবে ঘাড় নাড়ল। লোকটি কি তাকে বোকা বানাতে চায়!

—“কোন রকম ব্যবসা তা হলে?”

—“না”—

“তাহলে তুমি আমেরিকায় যেতে চাও। তা বেশ অনেক সঙ্গী পাবে। এখন অনেকেই আমেরিকায় যায়—কিন্তু আমি বলতে দুঃখিত হচ্ছি যে”—

পীয়ার সম্পূর্ণ উঠে দাঁড়াল—“না না, তাও নয়।”

--“ভাড়াভাড়ি বলে ফেল”।

“আমি প্রিষ্ট হ’তে চাই”—সে শহরে কায়দায় কথাগুলো উচ্চারণ করলে।

স্কুলমাষ্টার সীট ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন—এক হাতে শুল পাইপ চেপে ধরে বললেন—“কি, কি বলছ?”

“প্রিষ্ট হব”—পীয়ার পুনরুক্তি করল, এবার সে একটু পিছু হটল—কাবণ ভয় হচ্ছিল স্কুলমাষ্টার তার দিকে পাইপ ছুঁড়ে মারবে।

কিন্তু হঠাৎ সেই লাল মুখে হাসি ফুটে উঠল—এক পাটি সবুজ দাতের সারি বের করে তিনি হাসতে লাগলেন। পীয়ারের কাছে এ ব্যাপার অপ্রত্যাশিত। তিনি অনেকটা গানের সুরে বললেন—“প্রিষ্ট, তাই বল। এঁ অতিসামান্য ব্যাপার”—তিনি চেয়ার ছেড়ে উঠে ঘবময় পায়চারী করতে লাগলেন, একবার খেমে মাথা নেড়ে খুব স্নেহের সুরে বললেন “ধিক্—ধিক্, আমরা ক্ষুদ্র মানুষরা কত বড় কিছুই না পেতে আকাজক্ষা করি।”

হঠাৎ পীয়ারকে লক্ষ্য করে জিজ্ঞেস করলেন—“তোমার কি মনে হয় না তোমার শুভার্থী তোমাকে খুব সাহায্য করেছেন?”—

“হ্যাঁ করেছেন”—পীয়ার উত্তর দিল—গলার স্বর একটু কাপতে শুরু করে দিয়েছে।

“তোমার মত শত সহস্র ছেলে আছে—যারা কনফরমেশানের পর এমনি অসহায় ভাবে পৃথিবীতে পরিত্যক্ত হয়েছে—নিজেদের পায়ের ওপর নিজেকে দাঁড়াতে হয়েছে—সামান্য সাহায্য করবে এমন একটি প্রার্থীও তাদের নেই।”

“হ্যাঁ”—পীয়ার হাঁপাতে লাগল—অনিচ্ছ্যা সঙ্কেও দৃষ্টি দ্বারের খদিকে গেল

“আমি বুঝতে পারছি না কে তোমার মাথায় এই সব উদ্ভট চিন্তা ঢুকিয়েছে”।

অনেক কসরৎ করে পীয়ার উত্তর দিলে—“আমি আশৈশব একথা ভেবে এসেছি। তাছাড়া তিনি—বাবা”—

“কি? বাবা? তোমার শুভার্থীর কথা বলছ?”

“হ্যাঁ—তিনি আমার বাবা ছিলেন—ঠিক নয় কি?”—পীয়ার হঠাৎ জিজ্ঞেস করে বসল।

স্কলমাষ্টার এবার টলতে টলতে পিছনে হটেই একটা চেয়ারে বসে পড়লেন, পীয়ারের দিকে এমন করে তাকাতো লাগলেন যেন এর আর কোন আশা নেই। যাক অনেক করে নিজেকে সামলে নিয়ে শুধু বললেন—“দেখ, তাঁকে এখন এবং পরে শুভার্থী বললেই যথেষ্ট হবে। তাঁকে কি একথা বলা যায় না?”

“নিশ্চয়ই”—পীয়ার প্রায় কেঁদে ফেললেন।

—“তুমি বোধ হয়—তোমার বন্ধুরা নিশ্চয় তোমার মাথায় এসব উদ্ভট চিন্তা ঢুকিয়েছে—সেই টাকাটার কথা ভাবছ,—না?”

—“হ্যাঁ আমার নামে ব্যাঙ্কে একটা একাউন্ট আছে ত?”

—“এই ত ঠিক বলছে—ব্যাঙ্কে টাকা আছে—আমার কেয়ারে”—

স্কলমাষ্টার ড্রয়ার থেকে সবুজ মলাট লাগান একখানা বই বের করলেন। পীয়ার বই থেকে দৃষ্টি সরাতে পারছিল না।—“এই যে—তোমার নামে ১৮ শ ক্রাউন জমা আছে।”

এক মুহূর্ত। পীয়ারের মনে হল সে যেন আস্তে আস্তে মাটির নীচে পড়ে যাচ্ছে—মেঝে যেন তাকে আর আশ্রয় দিতে পারছে না।

তার সব স্বপ্ন মিলিয়ে গেল—মিলিয়ন ক্রাউন—প্রিষ্ট—বিশপ—ক্রিস্টিয়ানা—সব।

—“যে দিন তুমি কৃষক, শিল্পী, অথবা জেলে—যে কোন ভাবে জীবনে প্রতিষ্ঠিত হ’তে পাবে এবং যখন আমি বুঝব তুমি এ সাহায্য পাবার যোগ্য—তখন তোমাকে এই পাশ বই দেওয়া হবে। বুঝলে আমি যা’ বলছি”—

—“হ্যাঁ”—

—“আমি তোমার শুভার্থীর ইচ্ছানুসারে ততদিন টাকাটো আমাব কর্তৃত্বাধীনে নিরাপদে রাখতে ইচ্ছা করি।”

“হ্যাঁ”—পীয়ার ফিস ফিস করে কি বললে।

“কি হে তুমি ক’দছ”—

—“না না,—ওউ মরণিং”—

—“না না, এখনি যেও না। বসে পড়। এখন আরও দু’একটা ব্যাপার আছে যা এখনই ঠিক করে ফেলা উচিত। আমি তোমাব মঙ্গলাকাজ্জী—একথা বিশ্বাস কর—না কর না?”—

—“করি স্মার”।

—“তাহলে কলেজে যাওয়া বা এই প্রকার অন্য কল্পনা এই মুহূর্তে মন থেকে মুছে ফেল”—

—“হ্যাঁ স্মার”।

—“ধরে নেওয়া থাক তোমার মানসিক ঔৎকর্ষ যথেষ্টই আছে—কিন্তু এই সামান্য টাকায় সে সব ইচ্ছা পূরণ করা ছুরাশা নয় কি?”

—“হ্যাঁ স্মার”—

—“আর তুমি যদি ইচ্ছা কর—আমি সানন্দে এই মুহূর্তে কোন কারিগরের কাছে শিক্ষানবীশের কাজ যোগাড় করে দিতে পারি। বিনিময়স্বরূপ থাকবার জায়গা পাবে—ইচ্ছা করলে এক বৎসর বা তার চেয়ে বেশী দিন কাপড়-জামাও পেতে পার। সে সব ব্যবস্থা আমি

করে দিতে পারব। যতদিন পর্যন্ত না নিজে রোজগার করতে পার ততদিন পকেট খরচের দরকার নেই।”

পীয়ারের বুক বিদীর্ণ করে একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল—সেখানে সে এসে পড়ল। তার চোখের সম্মুখে সবুজ মলাট লাগান বইখানা ড্রয়ারে ঢুকে গেল—চাবির গোছাও দেখতে দেখতে ড্রেসিং গাউনে অদৃশ্য হয়ে গেল। তার মনে হতে লাগল কে যেন তার চোখের সম্মুখে তর্জনী উত্তোলন করে বলছে—“হল ত?”

“তারপর আর একটা কথা—তোমার নাম সন্দেহ। তুমি কোন নাম গ্রহণ করবে ঠিক করেছ—ডাক নাম অবশ্য।”

—“আমার নাম পীয়ার হলম”—বলেই অনিচ্ছা সত্ত্বেও বালকটি একটু পিছু হটে গেল। পূর্বে বিশপও তাকে ঠিক এই কথা জিজ্ঞেস করেছিল—তখনও সে তাকে ঠিক এই রকম বলেছিল।

স্কলমাষ্টারের ওষ্ঠ বিস্ফারিত হয়ে উঠল—চোখ থেকে চশমা খুলে নিয়ে মুছে আবার তিনি চোখে পরলেন। শেষটায় বইগুলির দিকে একবার দৃষ্টি বুলিয়ে নিয়ে বললেন—“হ্যাঁ, ঠিক ঠিক, আমিও প্রায় তাই ভেবেছিলাম।”

তারপর একটু এগিয়ে এসে পীয়ারের কাঁধে হাত রেখে স্নেহের স্বরে বললেন—“দেখ এটা প্রপ্নের অতীত”।

পীয়ারের সমস্ত দেহের মধ্য দিয়ে একটা শিহরণ চলে গেল। সে কি কোন ভুল করেছে :

—“দেখ এ নামে আরও অনেকে ত এখানে থাকতে পারে এ কথাটি কি একবার ভেবে দেখেছ।”

—“হ্যাঁ, কিন্তু”—

“এক মিনিট,—তারা যদি জানতে পারে তাহলে তাদের কি রকম

মনস্তাপের কারণ হবে সে কথাটাও ভাবা দরকার। আমি তোমাকে ঠিক ভদ্রলোকের মত বলছি। কাজেই একজন নিরীহ বিধবা আর তার ছেলেমেয়েদের ওপর নিশ্চয়ই তুমি এরকম বিরাট দুঃখের বোঝা চাপাতে চাইবে না। এতে কাঁদবার কি আছে? জীবন—বালক—জীবনে এমনই অনেক দুঃখ সহ্য করতে হবে। তোমাদের বাড়ীর নাম কি—যেখানে বাস কর।”

—“ট্রিয়েন—”

—“ট্রিয়েন, বেশ ভাল নাম। তা হলে আজ থেকে তোমার নাম হবে পীয়ার ট্রিয়েন।”

—“হ্যাঁ—হ্যাঁ। গ্রাব—”

—এবং কেউ যদি তোমার বাবার নাম করে, ভুলেও কখন শুভাঙ্গীর নাম কর না।”

—“হ্যাঁ—”

—বেশ, মন ঠিক করই আমার কাছে চলে এস। আমি তোমার বন্ধু—হিতাকাঙ্ক্ষী। তুমি অবশ্য আমেরিকায় যেতে চাইবে না। বেশ, বেশ—রান্নাঘরে চল, দেখি তোমার বেকফাষ্টের জন্য কিছু পাওয়া যায় কি-না।

পীয়ার মূহূর্তের মধ্যে রান্নাঘরে এসে একখানা চেয়ার দখল করল। আবার কফির সেই রুচিকর গন্ধ। “বার্থা”—স্কুলমাষ্টার একটু সহানুভূতির ভাব মিশিয়ে বললেন—“আমার এই ছোট বন্ধুকে কিছু খাইয়ে দাও ত।” এই বলে ষ্টোভের ওপর একটা ট্রিং হতে মোজাগুলি নিয়ে তাকে বিদায় জানিয়ে সেই দরজার মতো অদৃশ্য হয়ে গেলেন।

যখন ঘরে তৈরী নীল জামা পরে, মাথায় সূচোল টুপি একটি গ্রাম্যবালক শহরের রাস্তায় রাস্তায় যদচ্ছা বিচরণ করে বেড়ায় - তখন কেউই তাকে লক্ষ্য করে না। দুই পকেটে হাত ঢুকিয়ে সে দোকানের জান্দাব দিকে অবাক বিষ্ময়ে চাইতে চাইতে পথ চলে, শিষ দেয়—চারিদিকের সব কিছু বুভুক্ষু নয়নে তাকিয়ে দেখে—হয়ত কিছুই দেখে না! তবু মনে হয়—সেই সূচোল টুপির তলের মাথার মতো, যে ক্ষুদ্র জগত আছে, তথাৎ যেন তা' বিলয় প্রাপ্ত হয়েছে—কান্নার হাত হাতে রক্ষা পাবার জন্য সে হয়ত শিষ দেয়—তার দুরবস্থার কথা এমনি করে পথের লোকের কাছে গোপন কবতে চেষ্টা করে। একটা গাড়ী এড়াবার জন্য সে এক পাশে সব দাঁড়ায়—এই করতে আর একজন পথচারীর ঘাড় পড়ে—তার হাতের সিগার নর্দমায় পড়ে যায়। “হতচ্ছাড়া—গ্রামের বোকা ছেলে।” লোকটি সরোষে গর্জে ওটে : কিন্তু পরমূহুর্তেই বালকটির কথা সব ভুলে যায় আবার পথ চলতে আবহু করে। কিন্তু কিছুদূর যেতেই একটা বড় কুকুব একটি প্রাঙ্গন হতে ছুটে বেরিয়ে আসে—একটি মোটা বুড়িকে মাটিতে ধাক্কা মেরে ফেলে দেয়। সেই সূচোল টুপিওয়াল বালকটি শত চেষ্টা করেও এবার হামির বেগ রুদ্ধ করতে পারে না—সশব্দে ফেটে পড়ে।

সেই দিন অপরাহ্নে পীয়ার একটি দুর্গের তলায় ব্যামপার্টের উপর খসে ঘাসের ডগা কামড়াচ্ছিল আর হাতের আঙ্গুল মটকাচ্ছিল।

আরও নীচে নগরের সীমানার আরম্ভ। স্নিগ্ধ অক্টোবরের সূর্যালোকে স্নাতা তটিনী। যানবাহনের শব্দ—ওয়ার্কশপ ও বন্দর হ'তে জন-কোলাহল—তামাটে অঙ্ককার ভেদ ক'রে তার কাছে ভেসে আসছিল। সেইখানে সে শুক্ন হয়ে বসে আছে—আর রাইফেলধারী প্রহরী ওপরে দেওয়ালের ধারে পায়চারি করছে—লেফট রাইট-লেফট।

বস্তুত তুমি খুব উঁচুতে উঠতে পার—হয়ত বা পড়েও যেতে পার খুব নিম্নে—কিন্তু পতনে যতক্ষণ না সত্যসত্যই তোমার ঘাড় ভেঙে যায় ততক্ষণ তোমার সমূহ ক্ষতি কিছু হবে না।

ক্রমশঃ পীয়ারের মনে হতে' লাগল—সে ত তখনও বেঁচে আছে। পৃথিবী বিরুদ্ধে চলে গেলে, সব গেল—তখন থাক না কেন এমন লোক—যার কাছে তুমি সমবেদনা ও উপদেশের জন্য হাত পাততে পার। কিন্তু যখন তোমার চারিদিকে সব অপরিচিতের দল, তখন একাকী নিরালায় বসে বসে ঘাসের ডগা মোচড়ান অথবা নিজের জন্য একটু চিন্তা বিলাস করা ছাড়া আর কি উপায় আছে? পীয়ার সেই ড্রেসিং গাউনের কথা ভাবতে লাগল—যে তার ব্যাঙ্কবুকখানা আটকে শুধু চাবির গোছা মুখের সামনে বাজিয়ে ছিল—যে তাকে বিশপ হতে দিলে না, বরং তাকে টেনে হিঁচড়ে কোন ব্যবসার জোয়ালে জুতে দিতে চেষ্টা করেছিল—যেখানে তাকে আজীবন শুধু প্রেসিং আয়রন বহন করতে হত—একজন অতি নগণ্য পীয়ার ট্রয়েন হিসেবে জীবন কাটিয়ে দিতে হত। কিন্তু এরকম করে জীবন কাটাতে সে চায় না, সেখানে বসে সে নিজেকে তাভাতে লাগল এবং কোন জায়গা হতে এমন কিছু সংগ্রহ করতে চেষ্টা করল, যার অভাব পূর্বে কোনদিন সে অনুভব করেনি। স্বকীয় বুদ্ধি, প্রতিভা, ইচ্ছাকে এই বিরাট পৃথিবীর বিরুদ্ধে জাগিয়ে তুলতে হবে। এখন আর তার কি

করবার আছে? প্রথমে ট্রয়েনে ফিরে যাবে ভাবল—সেখানে বুদ্ধ পিতা-মাতার সঙ্গে আলোচনা করবে—তারা হয়ত তার দুঃখে সমবেদনা দেখিয়ে শুধু বলবে—“হতভাগ্য বালক”—হয়ত ঈশ্বরের নিকট তার মঙ্গলের জন্য প্রার্থনা করবে। কিন্তু দুএকদিন যেতে না যেতে আহারের সময় তারা হয়ত পরস্পরের মুখ চাওয়াচাষি করবে—এখন ত আর তার আহারের জন্য কেউ টাকা পাঠাবে না—তা ছাড়া দিন কালের অবস্থাও খারাপ। না, সেখানকার আশ্রয় তার ফুরিয়ে গেছে। কিন্তু তাহলে সে কি করবে? বাস্তবিক পৃথিবীতে একাকী বেচে থাকার মত বিড়ম্বনা আর নেই।

কিছুক্ষণ পরেই সে চার্চ-ইয়ার্ডের পাশে পাহাড়ের ধারে এসে উপস্থিত হল—সেখানে পীতাম্ব বৃক্ষের নীচে বসে পিতাকে কোথায় কবর দেওয়া হবে ভাবতে লাগল—ঐ শিক্ষক আর তাঁর মধ্যে কি আকাশপাতাল ব্যবধান! ধর্মের দোহাই দেওয়া তাঁর নিকট নিস্প্রয়োজন—তাঁর ছেলে তাঁকে কি বলবে না বলবে তা নিয়ে মাথা ঘামানও তিনি কোন দিন দরকার বোধ করেন না। কেন তিনি চলে গেলেন মরবার তাঁর কি দরকার ছিল! সেই সুদর্শন, বলিষ্ঠ লোকটি, যিনি রূপার হ্যাণ্ডেল লাগান ব্রাশ দিয়ে চুল ও দাড়ি আঁচড়িয়ে ছিলেন—এখন তিনি কফিনের মধ্যে গুয়ে আছেন—শীঘ্রই মাটির আচ্ছাদনে তাকে ঢেকে ফেলা হবে—এ কথা ভাবতে বড়ই অশ্রুচর্য্য ঠেকে!

লোকজন সব আসছে চার্চ-ইয়ার্ডের দিকে। সকলের গায়ে কালো কাপড়—মাথায় লম্বা চক্চকে টুপি। তাদের মধ্যে কয়েকজন অফিসারও আছে—তাদের মাথার টুপিতে পাখীর পালক, কোমরে শ্রাশ—তারপর একদল সৈন্য—পেতলের যন্ত্রাদি নিয়ে উপস্থিত হ'ল। ভীড়ের সঙ্গে পীয়ারও চার্চ-ইয়ার্ডে ঢুকে পড়লে, কিন্তু সকলের সঙ্গে না মিশে সে

দূরে একটা স্মৃতি স্তম্ভের পাশে দাঁড়িয়ে রইল। “এ নিশ্চয়ই পিতার শবের শোভাযাত্রা”—সে মনে মনে ভাবল—তৎক্ষণাৎ উন্মুখ হয়ে রইল।

এ নিশ্চয়ই ক্যাডেট স্কুলের ছাত্রেরা—তাই সারিতে ভাগ হয়ে কবর উন্মোচন করবার জন্তু মার্চ করতে করতে আসছে—সমস্ত জায়গাটি এবার লোকে লোকারণ্য হয়ে গেল—অনেক মেয়েও চোখে কুমাল গুঁজে সেখানে দাঁড়িয়েছিল। একজন কালো পোষাক পরা বয়ীয়াসী মহিলা ইউনিফর্ম পরিহিত লম্বা লোকের হাতে ভার দিয়ে চ্যাপেলের দিকে অগ্রসর হল।

“এ নিশ্চয়ই আমার সংবান আর ঐ তরুণ লেফটেন্যান্ট আমার সংভাই।” কি অদ্ভুত এই সব! চার্চ থেকে ভজন-গান শুরু হল। কিছুক্ষণ পরে ছয়জন সার্জেন্ট মানায় বিভূষিত একটি কফিন বহন করে নিয়ে এল। “এবার অস্ত্রশস্ত্র উপহার দাও”—আদেশ হ’ল—ঝাণ্ডের দল একটা মার্চের বাজনা বাজাতে বাজাতে তুই সৈন্যদলের সারির মধ্যে এসে দাঁড়াল। তারপর একদল মোনার। সেই কালো পোষাক পরা মহিলাটি কুমালে মুখ ঢেকে আবার কাঁদতে কাঁদতে এসে উপস্থিত হল। সে আর চলতে পারছে না—যদিও সেই লম্বা অফিসারের হাতে ভার দিয়ে এসেছে। তারপর কফিনের ঠিক পেছনে আর একজন লম্বা জমকাল ইউনিফর্ম পরিহিত লোক এসে উপস্থিত হল। মাথায় পালক আঁটা টুপি, কাঁধে সোনার এপিউলেট, বেটে বাঁদা সোর্ড—হাতে দুটো স্বর্ণখচিত তারা লাগান একটি কুশান। মোনারদের লম্বা সারি একটু সরে দাঁড়াল, আর একটু—কবরের পার্শ্বে থাকা হস্তে ধর্মধাজকের মূর্তি দেখা যাচ্ছে।

পিতার সম্বন্ধে ধর্মধাজক কি বলে শোনবার জন্তু পীয়ার উৎকর্ষ

হয়ে রইল। অজ্ঞাতসারেই সে একটু এগিয়ে এল—যদিও বুঝতে পারছে—শেখী এগিয়ে আসাটা ঠিক হবে না।

একটা গান হ'ল—ব্যাণ্ডের বাজনার সঙ্গে। পীয়ার মাথা হ'তে টুপি খুলে ফেললে। সে এমন মশগুল হয়ে গিয়েছিল যে, একজন মোনার তাকে খুব গভীরভাবে নিরীক্ষণ করছে তা সে লক্ষ্যই করেনি—ঠাৎ লোকটি দল ছেড়ে তার দিকে অগ্রসর হ'ল। তার মাথায় লম্বা ঝকঝকে টুপি, চোখে চশমা অঁটা। পীয়ার তাকে চিনতে পারলে তখন—যখন সে তার হাতে চাপ দিলে। এ সেই স্কুলমাষ্টার—পীয়ারের দিকে সে এমন ভয় ও ক্রোধ মিশ্রিত মুখে তাকাতে লাগল যেন চশমা ভেদ করে আগুনের হুকা বেরিয়ে আসছে!

“তুমি—তুমি কি পাগল হয়েছ”—দৃঢ়মুষ্টিতে পীয়ারের হাত ধরে তার কানে কানে সে ফিসফিস করে তর্জ্জন করে উঠল। “এখানে কি দরকার? আজকে তুমি একটা কেলেকারী ঘটাতে চাও? শীগগির চলে যাও এখান থেকে। যাও—ভগবানের নাম নিয়ে বলছি—কেউ দেখবার আগে এখান থেকে শীগগির সরে পড়”। পীয়ার পেছন ফিরেই দে—লম্বা! যাবার সময় সে স্পষ্ট গুনতে পেল—“যদি আবার কোনদিন চেষ্টা কর”—এদিকে ভজনের সুর উচ্চ হতে উচ্চ উঠতে লাগল—তারই রেশ যেন তার পিঠে ধাক্কা মেরে তাকে তাড়িয়ে নিয়ে চলল।

সে থামল—যখন শহরের অনেকটা এসে পড়ছে, তখন। একটা জিনিষ তার নিকট জলের মত পরিষ্কার হয়ে গেল যে, স্কুলমাষ্টারের নিকট যাওয়ার পথ তার চিরতরে বন্ধ হয়ে গেছে। সব শেষ। যদি নিশ্চিত হতে পারত, সে যা করেছে—তা এমন কিছু মারাত্মক নয়, যার জন্তু জেলে যেতে হতে পারে!

পরে ট্রয়েন পরিবার যখন দৈনন্দিনিক আহার সমাধা করতে বাস্তু তখন বড় ছেলে জানলা দিয়ে প্রথম পীয়ারকে দেখতে পেয়ে তার আগমন বার্তা জানিয়ে দিলে—পীয়ার আসছে।

“রক্ষা করুন ভগবান”—ঘরে প্রবেশ করতেই ট্রয়েন পত্নী জিজ্ঞেস করল—“কি হয়েছে পীয়ার, তোমার কি কোন অসুখ করেছে?”

সে রাত্রে আবার সেই বহুপরিচিত স্কিন রাগের তলায় আবার শয়ন। বৃদ্ধা জননী তার শিয়রে বসে সান্ত্বনার সুরে পরমেশ্বরের নাম শোনাতে লাগল। কাপড়ের তলায় পীয়ার হস্ত দৃঢ় মুষ্টিবদ্ধ করলে কেন যেন তার মনে হল—ঈশ্বরও ঠিক ঐ স্কলমাষ্টারেরই মত। তবুও বৃদ্ধা তার পাশে বসে গল্প করছে—এটা তার খুব ভাল লাগতে লাগল।

ভাবপর যে সে এত দিন পরে এসেছে, তার জন্ম তাকে অনেক সহ্য করতে হয়েছে। রাস্তা দিয়ে চলতে চলতে শুনতে পেত—চাপা কানাকানি চলেছে—“ঐ যে ‘প্রিষ্ট’ চলেছে”। খাবারের টেবিলে বসে সে প্রতি গ্রাসের জন্ম লজ্জানুভব করত—সেই দূর গোলাবাড়ীতে দিন মজুর হিসাবে চাকরির সন্ধান করতে লাগল—সামান্য যা কিছু অর্জন করা যায় তাতে তার ভরণ-পোষণের খরচটা ত চলে যাবে। শীতের সমাগমে অন্তদের মত—কিশোর বালক যদিও সে—তবুও তাকে লফটনে মাছ ধরার কাজে সাহায্য করতে হ’ল।

একদিন ক্লস এক ছুটির পর তাকে গার্জার এক পাশে টেনে নিয়ে গেল কতকগুলো বিষয় আলোচনা করতে। ক্লস চলে যাচ্ছে—শহরে, কোন মেকানিকাল ওয়ার্কশপে কাজ করবে, তারপর সেখানে থেকে ইঞ্জিনার হবার জন্ম টেকনিকাল কলেজে ঢুকবে। তখন সে পীয়ারের কাছে, শহরে কি ঘটেছিল তার বিস্তারিত বিবরণ শুনতে চাইলে। কারণ

লোকে যখন তাকে দেখে বিক্রপের ভঙ্গিতে মুখ ভ্যাজ্জাত—প্রিষ্ট হবার মত উচ্চাকাঙ্ক্ষা যার ছিল—সে এখন পথের ভিখারী হয়েছে ভেবে—তখন রুস ব্রকের ইচ্ছা হ'ত লোকগুলোকে আচ্ছা করে ঠুকে দেয়।

এই ভাবে ষোল বছরের দুই বালক কথা বলতে বলতে পায়চারী করতে লাগল। অনাগত দিনে পীয়ার কোনদিন ভোগেনি এই বন্ধুর কথা, যে হাজার শিকারে তাকে সাহায্য করেছিল। “আমার কথা শোন” রুস জোর করে—“তুই ত এর মধ্যেই কামারের কাজ শিখে ফেলেছিস ; কোন একটা ওয়ার্কশপে ঢুকে যা’—অবসর সময়ে বই পড়, যাতে টেকনিকাল কলেজে চোকবার জন্ম এন্ট্রেন্স পরীক্ষা দিতে পারিস। তিন বছর কলেজে আটাশ ক্রাউন—তারপর একজন বিখ্যাত ইঞ্জিনীয়ার—কাউকে আধ-পয়সা ধারতে হবে না”। পীয়ার মাথা নাড়ল ; সে জানত, সেই স্কুলমাষ্টারের কাছে টাকা চাওয়া ত দূরের কথা—তাকে মুখ দেখাতেই পারবে না। না না, সব শেষ হয়ে গেছে—তার পক্ষে আজ সকল পথ চিররুদ্ধ।

চুলায় যাক—“একটা বাঁদর-মুখো স্কুলমাষ্টার তোমায় টাকা দেবে না—আমাকে নিয়ে যাস্ ত তোর সঙ্গে—একবার দেখব—সে বেটা কেমন !” এই বলে রুস ব্রক মুষ্টিবদ্ধ করে বাতাসে প্রচণ্ড বেগে ঘুসি চালিয়ে দিলে।

জানুয়ারী মাসে দেখা গেল, পীয়ার ওয়েলফিন পরে কুয়াসা ও শিলা-রষ্টির মধ্যে একটা জেলে-বোটে চড়ে উত্তরে মৎস্য-ক্ষেত্রের দিকে চলেছে ; সেই দীর্ঘ শীত সে জেলেদের জীবন যাপন করলে। ডাঙ্গায় একটা ছোট ঢালা ঘরের মধ্যে পাঁচজন মাঝি ‘সারডিনস্’ এর মত এমন ঘেসাঘেসি হয়ে গুয়ে থাকত যে, ইচ্ছা করলেই এক কোপে তাদের সকলকে কেটে ফেলা যেত। আর সমুদ্রে একটি সুন্দর দিনে কোন কাজ না করে গীতে

কাঁপতে কাঁপতে অর্ধ দিন কেটে যায়—একটা ঝড়ো হাওয়া ওঠে—তখন অসীম সমুদ্রে শুধু দাঁড় টানা চলে—হীমশীতল তরঙ্গ—একটানা দাঁড় টানতে টানতে—হাত ফেটে রক্ত বের হতে থাকে—জীবনীশক্তি যেন চলে যায় ! পীয়ারকে সুদীর্ঘ শীতকাল এমনি কঠোর অভিজ্ঞতা ভোগ করতে হয়েছে—সময় সময় ভেবেছে, অর্থাৎ যখন সে ভাবতে পেরেছে—কি করে তথাকথিত ভদ্রমানুষ তাকে এইরূপ জীবনে ঠেলে দিয়েছে—কেন না বেঁচে থাকা তার পক্ষে অণ্যায় আস্পর্শ। চৌদ্দ সপ্তাহ কেটে গেছে—নৌকাগুলি ফিরে আসছে—লফটনের নদীতে বসন্ত ঘে দোল দিয়ে গেছে ! পীয়ার তার উপার্জনের টাকা গুনল—অতি যৎসামান্য। তাকে নিজের ভরণ-পোষণের জন্তু টাকা ধার করতে হ'ত—সুখের কথা হবে, যদি সে এই আয়ের টাকা দিয়ে ধার শোধ করতে পারে।

কয়েকদিন পরে শহরের কোন ইঞ্জিনীয়ারিং ওয়ার্কশপের গেটের সামনে একটা বালককে দেখা গেল—“কুম ব্রক এখানে থাকে ?”

“—কে পীয়ার—তুই ! লফটনে গিয়েছিলি—খুব রোজগার করেছিস না ?”

তারপর দুটি বালক পরস্পরের বেশ নিরীক্ষণ করতে লাগল—কুম গস্তীর মুখ—ওয়ার্কশপের ড্রেসে, আর পীয়ার ঝড়-বৃষ্টি-রোদে পোড়া'।

ফ্যাক্টরী ম্যানেজার কুমের এক কাকা—সেই দিন সন্ধ্যায় সে কাকার কাছে গেল, এ্যাপ্রেন্টিস হিসাবে খাটবার জন্তু নূতন একটি লোককে নিয়ে। সে কামারের কাজ কিছু জানে,—ঘণ্টায় ছ'পেন্স হিসাবে ভৎক্ষণাৎ তাকে নেওয়া হ'ল।

—‘তোমার নাম’—

—“পীয়ার”—তার গলা আটকে এল।

—“ইলম”—কুম ধরিয়ে দেয়।

—“পীয়ার হুম—বেশ তাতেই চলবে।”

ছেলে দু’টি চলে আসে—মনের ভাবখানা যেন আজ তারা একটা ভয়ঙ্কর সাহসের কাজ কিছু করেছে। এখন বিপদ যদি কখন আসে, তারা দু’জনে তার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করবে।

সী'ষ্ট্রিটের একটা সঙ্কীর্ণ গলিতে গরসেথ বাস করে। তার পরিবার বলতে—রোগা অস্থিচর্মসার স্ত্রী দুটো অর্ধোপবাসী ঘোড়া, কতকগুলো পোকামাকড় ;—তার একটা শ্লেজ গাড়ীও আছে। জবমাষ্টারের লাল নাক আর চোখদুটি গাঢ় হলুদবর্ণ। সে একজন বন্ধ মাতাল—সারা রাত মদ খেয়ে কাটায় আর বাড়ী ফেরে ঠিক সকালের দিকে—যখন তার স্ত্রী সবে শয্যা ত্যাগ করবার যোগাড় করেছে। সারা সকাল তার কাটে গরসেথকে গাল দিয়ে—মাতালের কখনও ভাল হয় না। কিন্তু এদিকে গরসেথ নিঃশঙ্কচিত্তে নাক ডাকাতে থাকে।

ঘাড়ে বাক্স নিয়ে পীয়ার যখন অভিনয়-প্রাঙ্গনে এসে উপস্থিত, তখন গরসেথ উঠানে হাঁটু গেড়ে একজোড়া গাড়ীর চামড়ার এ্যাপরনে ভেসেলিন লাগাতে ব্যস্ত—আর তার রক্তচক্ষু ঠোঁট পুরু স্ত্রী রান্নাঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে তাকে গালিগালাজ করছে—‘অসচ্চরিত্র, বদমায়েস, পৃথিবীর আবর্জনা।’ গরসেথ একভাবে ভেসেলিন লাগাতে লাগল—টাক মাথায় সূর্য্যের কিরণ এসে পড়ছে আর মাঝে মাঝে সে মাথা তুলে গর্জন করছে—“চুপ কর বলছি।”

“এখানে কি ঘর খালি আছে”—পীয়ার জিজ্ঞাসা করলে।

একটি লাল নাক এগিয়ে এল আর তার পেছনে যামুখটি ট্রাউজারে হাত মুছতে মুছতে খোঁড়াতে খোঁড়াতে উপস্থিত। “হ্যাঁ, আছে”—এই বলে তাকে উঠান পেরিয়ে সিঁড়ি দিয়ে একটা ছোট ঘরে নিয়ে এল। ঘরেতে কাঁচের সার্শি লাগান—রাস্তার ধারে দুটো জানালা

আর উঠানের দিকে মুখকরা একটা অন্ধেক জানালা আছে। খড়ের উপর বিছান একটা শয্যা—এক জোড়া চেয়ার ও একটা টেবিল—
—টেবিলটা সেই অন্ধেক জানালার সম্মুখে অবস্থিত। ভাড়া মাসে বার টাকা।

—রাজি। পীয়ার তখন তখনই ঘর ভাড়া নিলে—এক মাসের ভাড়া অগ্রিম দিয়ে লোকটির হাত থেকে নিস্তার পেয়ে বাস্কের উপর বসে পড়ল,—তারপর চারিদিক দেখতে লাগল। অনেকেরই মাথা গোজবার জায়গা নেই—কিন্তু পীয়ারের তবু একখানা নিজের ঘর আছে। বাহিরে—উঠানে আবার স্ত্রীলোকটির গর্ভাবস্থা শুরু হয়েছে আর নীচের আস্তাবল থেকে অশ্রান্ত ঘোড়ার খুরের শব্দ আসছে—মাঝে মাঝে অশ্ববরেরাও চিহি চিহি ক'রে অভিযোগ জানায়।

পীয়ার জেলেদের আস্তানায়, কৃষকদের বাড়ীতে দিন কাটিয়েছে—কাছেই এসব তাকে একটুও বিচলিত করতে পারলে না। তবুও নিজের বলতে ত আজ একটা স্থান হয়েছে—এই ঘরের মধ্যে অন্তত তার প্রভুত্ব অপ্রতিহত থাকবে।

এবার আহারের ব্যবস্থা করতে হবে। সে বের হয়ে গেল প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র কিনে আনতে—বাক্সটি সাধারণ গ্রাম্য ছিনিষে ভরে ফেললে। 'দিনারে'র সময় সে বাস্কের ডালার ওপর বসলে—তারপর ঘরের রুটি আর ঠাণ্ডা মাংস বেশ করে খেয়ে নিলে।

এবার নূতন কাজের আরম্ভ। সে এসব পছন্দ করে, কি করে না—সে প্রশ্ন অবৈধ। কারুর কাছে সাহায্য ভিক্ষা না করে পৃথিবীতে মাথা জাগিয়ে তোলবার এই সূযোগ। এ সূযোগের সদ্যবহার সে করবে। শীঘ্রই তার নূতন জীবনের স্বপ্ন নূতন রূপ ধরে তার কাছে ফুটে উঠল।

সে এখন মই'এর নীচে—একজন সামান্য কামার মাত্র—কিন্তু ঐ ত উর্দে দেখা যাচ্ছে চীফ ইঞ্জিনিয়ারের মূর্তি—চোখে সোনার চশমা অঁটা—গায়ে শাদা ওয়েস্টকোট—ঐখানে সে একদিন উঠবে—নিজের আসন সে করে নেবে। আশু ক এবার কোন স্কুল মাষ্টার বাধা দিতে—চেপ্টা করে দেখুক। তারা একদিন তাকে চার্কইয়ার্ড থেকে তাড়িয়ে দিয়েছে—এর প্রতিশোধ আর একদিন সে নেবে। তার মনস্কামনা সিদ্ধ হ'তে হয়ত বছরের পর বছর কেটে যাবে, কিন্তু একদিন সে তার বাবার মত বড় হবে—সেদিন সে সকলকে স্নদে আসলে পরিশোধ করবে।

কুয়াসার ঘোমটাটানা প্রভাতে যখন সে হাতে ডিনারের পাত্র নিয়ে কর্মক্ষেত্রে যেত, কাঠের পুলের ওপর তার পদধ্বনি—তার মনের গোপন ইচ্ছাকেই প্রকাশ করত যেন—“আজ একটা নূতন কিছু শিখতে হবে—সম্পূর্ণ নূতন।”

বন্দরের বড় বড় কারখানা—জাহাজ সারাবার কারখানা—কলকজার দোকান—এরাই যেন একটা শহর। এই ধোঁয়া আর আগুনের রাজ্য—হাতুড়ী আর হুইসেলের শব্দ—জনতা আর জন-কোলাহল—এই সবের মধ্য দিয়ে পথ কেটে সে চলেছে—মনে এক স্থির সঙ্কল্প—“শিখতে হবে—কেবল শিখতে হবে।” তার চারিপাশে এমন অনেকে আছে—তারা যতটুকু জানে, তাতেই পরম সন্তুষ্ট—অধিক জানবার বা অধিক দূর অগ্রসর হবার ইচ্ছা তাদের আদৌ নেই। তারা ব্যর্থ মুটে-মজুর হিসেবেই জীবন কাটিয়ে দেবে, কিন্তু সে এগিয়ে যাবে অক্লান্ত গতিতে, যতদিন না সে একজন মতাপণ্ডিত হ'তে পারে। কয়েক মাস তাকে কামারশালায় কাজ করতে হবে—তারপর মেশিনের দোকানে—তারপর ছুতার আর পেইন্টারদের সঙ্গে—শেষে ডক ইয়ার্ডে। সমস্ত কাজ করতে কয়েক বছর কেটে যাবে। কিন্তু এই সমস্ত কাজ তার নিকট একটা নূতন

বাইবেল—শ্রেষ্ঠ পুস্তক—তাকে কণ্ঠস্থ করতে হবে। চাই একটু ধৈর্য্য!

এ এক নূতন নূতন এ্যাডভেনচারের লীলাক্ষেত্র—দিনের মধ্যে কতবার সে আশ্চর্য্য বিশ্বয়ে মুগ্ধ হয়ে যায়! কত নূতনত্ব, কত অভাবনীয়ের দিকে সে চেয়েছে। কিন্তু তারা কেহই ঈশ্বরের সৃষ্টি নয়—সাধারণ মানবের হাতেগড়া জিনিস। শুধু একটা বোতাম টেপ—অমনি এক দৈবীমায়া জন্ম নেবে। সে এসব জিনিসের দিকে গভীর ভাবে চেয়ে থাকে—এদের কথা ভেবে কতদিন দীর্ঘ রজনী কাটিয়ে দিয়েছে সে। এসবার পশ্চাতে কিছু আছে নিশ্চয়ই—কিছু আছে—কোনও শক্তি, হয়ত তা ভগবানের দেওয়া নয়। এই সব ইঞ্জিনীয়াররা—যদিও ধর্ম-প্রচার বা প্রার্থনা করেন না, তবুও এঁরা এক প্রকারের ধর্মযাজক। এ এক অভিনব জগত।

একদিন তাকে একটা প্রকাণ্ড বয়লারের রিভেটিংএর কাজ করতে দেওয়া হল—এই প্রথম সে শক্তি নিয়ে কাজ করছে—যে শক্তি তার নিজের নয়। একটা লম্বা নলের মধ্যে অনেকটা বাতাস 'কমপ্রেস' করা আছে—এরাই রিভেটিংগুলোকে বয়লারের মধ্যে হতে ককশ শব্দে স্বস্থানে ঠেলে পাঠিয়ে দিচ্ছে বিদ্যুৎগতিতে। তাদের ঘরু ঘরু শব্দ সমস্ত শহরকে মুখরিত করে তুলেছে। সেই শব্দে মাথা ধরে, কানে তাল লাগে—কিন্তু তবুও পীয়ার আনন্দ পায়। অক্লান্ত শ্রম সে করে—এখানে এখন সে প্রভু—একচ্ছত্র অধিপতি—সর্বনিয়ন্তা। জীবনে এই প্রথম নূতন অভিজ্ঞতা—সারা দেহ মনে পুলক শিহরণ জাগাতে থাকে।

কিন্তু দীর্ঘ সঙ্কায় সে একাকী বই পড়ে কাটায়—নীচের আস্তাবল হতে বোড়ার ফুরের শব্দ ভেসে আসে। গভীর রাত্রে যখন শুতে যায়, তখন একটা চিন্তাই তাকে কেবল আঘাত করে—সে একা—

একা। ক্লস ব্রক তার কাকাদের সঙ্গে একটা সুন্দর বাড়ীতে বাস করে—পাটিতে যায়। আর সে এখানে একাকী পড়ে থাকে। যদি আজ রাত্ৰিতে সে মরে যায়—কেউ তার জন্ত এক বিন্দু অশ্রুও বিসর্জন করবে না। এই অপরিচিত নির্দয় পৃথিবীতে সে একা—সম্পূর্ণ একা।

সময় সময় ট্রোয়েনের বৃদ্ধা মা'র কথা মনে হয়—সেই গীর্জার কথাও। তার ছাদটা এত উঁচু যে অর্গানের সুরও অত দূরে পৌঁছাতে পারে না—আর প্রত্যেকের মুখটি কত সৌন্দর্য্যভরা! সঙ্ক্যা-বন্দনা কিন্তু তার নিকট আর পূর্বের মত মধুর ঠেকে না। যে মই'এর সিঁড়ি বেয়ে তাকে উঠতে হবে, তার শীর্ষে ত কই কোন বিশপের মুক্তি দেখা যায় না? সেখানে এখন বসে আছে একজন চীফ ইঞ্জিনিয়ার—ঈশ্বরের সঙ্গে তার কোনই সম্পর্ক নেই—অনাগত মানব মানবীর দুঃখ-সুখের সন্ধান সে রাখে না। এখন নরকে যেরে তার মাকে সেই দুঃখের যন্ত্রণা হ'তে মুক্তি দেবার ইচ্ছাও চলে গেছে। যা' শক্তি ও সামর্থ্য সে সঞ্চয় করেছে—কই, তার সাহায্যে হেমন্তের কোন সঙ্ক্যায় তারাভরা আকাশে অঙ্গুলি নির্দেশ করে সে ত কোন নক্ষত্রকেও সঙ্গীতে মুখর করে তুলতে পেরেছে না।

পীয়ারের জীবনে অনেক কিছু হারিয়ে গেছে। সে যেন ক্রমশঃ তীরভূমি হতে দূরে সরে যাচ্ছে—লাল মেঘের দল কোথায় আকাশ ছুঁয়ে আছে—সেখানকার বাতাস শুধু স্বপ্নে ভরা;—সেখান হ'তে সে চলেছে—দূরে অতি দূরে, নৃতনের সন্ধানে। এক তন্দমনীয় শক্তি তাকে সেইদিক চালিত করে নিয়ে চলেছে।

একদিন রবিবার সে খুব পড়ায় মগ্ন—এমন সময় ক্লস ব্রক শিষ দিতে দিতে এসে দরজা খুলে ঘরে ঢুকল—মাথার টুপিটা পেছনের দিকে ঝুলিয়ে দেওয়া!

“কি:র—এইখানে থাকিস বুঝি” ?

“হ্যাঁ, এই আমার ঘর—ঐ চেয়ারে বস্।”

কিন্তু ক্লস দাড়িয়ে রইল—পকেটে হাত ঢোকান—ঘরের চারিদিক দেখতে লাগল। “তবু রক্ষে”—শেষটায় সে মুখ খুললে—“নিজের ছবি টেবিলের ওপর রাখ নি।”

“কেন, এটা এর আগে দেখিসনি’—প্রত্যেকেরই এরকম আছে।”

“তাদের নিজের ফটো নয়—গাধা কোথাকার। যদি কেউ এটা দেখে ত এর শেষ পরিণতির কথা আর গুনতে হবে না।”

পীয়ার ফটোগ্রাফটা হাতে নিয়ে বিছানার তলায় লুকিয়ে রাখল। বাস্তবিকই তার ভুল হয়েছে। “কিন্তু এটা”—দেওয়ালে টাঙ্গান একটা বড়ীন ছবির দিকে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে সে বলল।

ক্লসের মুখে চোখে আত্মসচেতনের ভাব—খানিকটা টোব্যাকো পাইপে পুরে নিলে—“ও ঐটে” ? এবার সে কষ্ট করে হাসতে চেষ্টা করলে না।

“হ্যাঁ, ঐটে—চার পেনস্ দাম—কেমন সুন্দর পেন্টিং না ?”

“পেন্টিং! হ্যাঁ হ্যাঁ। বেশ ভাল। আরে এটা ‘অলিয়োগ্রাফ’—
ভোর বুদ্ধিসুদ্ধি যদি কিছু থেকে থাকে।”

“ও তাই নাকি। তুই দেখি সব জানিস”—

“তোকে একদিন আর্ট গ্যালারীতে নিয়ে যাব—রীয়েল পেন্টিং কাকে বলে—দেখতে পাবি।”

“ওটা কি বই—ইংলিশ রীডার ?”

“হ্যাঁ”—পীয়ার খুব উৎসাহের সহিত উত্তর দেয়—“একটা কবিতা পড়ি শোন।”

ক্লস বাধা দেবার পূর্বেই পীয়ার পড়তে আরম্ভ করে দিল।

পড়া শেষ হলে ক্লস কয়েক মিনিট নিঃশব্দে বসে রইল, শেষে বলল—
‘হ’—আমাদের শেষ টিচার এরোকে জেবলেনু যদি তোমার ঐ পড়া
শুনত, তা হলে...সত্যি বলছি—তাকে নাস করবার জন্য একজন
নাসকে ডাকতে হত।’

সহের একটা সীমা আছে। পীরার বইখানাকে দেওয়ালে ছুঁড়ে
দিয়ে তাকে গোল্লায় যেতে বললে। ক্লস অতি কষ্টে আরম্ভ করলে—
“দেখ, এনট্রান্স দিতে হলে রীতিমত পড়া-শুনা করতে হবে—অতএব
একজন ‘টিউটর’ দেখ।”

“তোমার পক্ষে টিউটর - ওসব বড় বড় কথা বলা সহজ। কিন্তু
আমার প্রতিঘণ্টার আয় মাত্র দুপেন্স।”

“আচ্ছা, আমি একজন ‘টিউটর’ জোগাড় করে দেব—সপ্তাহে দু’দিন
তোমায় ইংরেজী, অঙ্ক, ইতিহাস পড়িয়ে যাবে—প্রতি লেসেনের জন্য
দুপেন্স—এ নিশ্চয় দিতে পারবি?”

পীরার এবার শান্ত মুক্তি ধারণ করেছে, মুখে বাখাভরা চাউনি।
“হ্যাঁ, পারি—যদি মাখন খাওয়া ছেড়ে দি এবং কফির বদলে জল পান
করি।”

ক্লস হেসে উঠল, কিন্তু চোখ জলে ভরে’ এল। দুর্ভাগ্য যে তার বন্ধুকে
দুপেন্স দিয়ে সাহায্য করবার ক্ষমতাও তার নেই। আর দিলেও সে
নেবে কেন?

এই ভাবে গ্রীষ্ম কেটে গেল। রবিবারে বাড়ীতে বসে বসে সে
দেখে—ছেলেরা সব গ্রামের দিকে চলেছে—মাঠে, ঘাটে, বনে তারা
সমস্ত দিনটা কাটাবে যদৃচ্ছা বিচরণ করে—আর সে ঘরে বসে একাকী
বই পড়ছে। বিকালের দিকে, যে জানলাটা রাস্তার ধারে—সেখানে
দাঁড়িয়ে সে দেখতে পাবে—ছেলে মেয়ের দল হট্টগোল করতে করছে

ফিরে আসছে—কারুর হাতে ফুল, কারুর টুপিতে কচি ডাল পাতা—যুক্ত
বাতাস আর রবি কিরণ তাদের যেন মাতাল করে দিয়েছে ! তবুও বাড়ীতে
বসে তাকে পড়তে হবে !

আর শরতে যখন রাত্রি একটু গভীর হয়ে আসে, তখন সে শোবার
আগে রাস্তায় একটু বেড়াতে বের হয়—ঐ যে ঐ শাদা বাড়ী দেখা যাচ্ছে,
যেখানে ম্যানেজার থাকে—ততদূর পর্য্যন্ত। এটা ক্লসদের বাড়ী।
জানলার মধ্য দিয়ে আলো দেখা যায়—মাঝে মাঝে গানের সুর।
এখানে যে সুখী পরিবারের বাস, তারা এমন সব জিনিষ জানে বা
কাজ করে—যা' কোন বই পুস্তকে পাওয়া যায় না। কিন্তু তাতে কি ?
এখনও অনেকটা দূর যেতে হবে—এখনও সামনে দীর্ঘ পথ প্রসারিত,
কিন্তু তাকে সেখানে পৌঁছতে হবেই।

একদিন ক্লস কথায় কথায় কর্ণেল হলমের স্ত্রী কোথায় থাকে বললে
এবং পীয়ারও একদিন হাঁটতে হাঁটতে সেই বাড়ীর নিকট এসে উপস্থিত
এল। বাড়ীটা রীভার স্ট্রিটের ধারে ; চারিপাশে বড় বড় গাছের সারি।
পীয়ার সেখানে একটা বাগানের বেড়াতে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে রইল—
একটা অভাবনীয় উত্তেজনায় সমস্ত দেহ কাঁপতে লাগল। দোতলাতে,
সারি সারি জানুলা—আলোময়। ভিতরে একজন বালকের হাসির শব্দ
শোনা যাচ্ছে, একটি মেয়েও গাইছে যেন ! নিশ্চয়ই কোন পার্টি হচ্ছে।
পীয়ার বাতাসে কলার উন্টে দিয়ে—হাঁটতে হাঁটতে আবার শহরে তার
আস্তাবলের ঘরে ফিরে এল।

তার মত নিরালার নির্বাসিত বালকের পক্ষে শনিবার একটা উৎসব
বিশেষ। এই দিন সে ভাল করে স্নান করে, জামা কাপড় পরিষ্কার,
বেশ পরিবর্তন ও নূতন বেশ পরিধান করে। ধোয়া কাপড়ের গন্ধ—
'মুখে বসন্তের দাগওয়ালা একজন বৃদ্ধার কথা স্মরণ করিয়ে দেয়—যে

কাপড় ছিঁড়ে গেলে সেলাই করে দিত—জামা কাপড় ভাঁজ করে রাখত সে খুব সতর্কতার সহিত নূতন জামা কাপড় পরে ; মনে হয় আজই যেন রবিবার ।

মাঝে মাঝে যেদিন রবিবারটা দীর্ঘ মনে হয়, পীয়ার নিকটবর্তী কোন একটা চার্চে ঢুকে পড়ে, ধর্মযাজক 'যা' বলে সব সত্য—সন্দেহ নেই । কিন্তু পীয়ার কোন কথাতেই কান দেয় না—খালি মনে পড়ে সেই উঁচু ছাদ, রং-করাজানলা, ভজন গান আর অর্গানের সুর । এখানেও লোকদের মুখ দেখতে অন্তরকম—রাস্তার লোকজনের মুখের সঙ্গে রাতদিন পার্থক্য । তাদের চিন্তাধারা যেন কোন স্বর্গীয় আভাষ আভাবিত । কত সুন্দর এই স্থান—কত আরামদায়ক ! পীয়াবের মনে হয়—সকলের সঙ্গে সে যেন সত্যের বন্ধনে বন্ধ, কিন্তু সকলেই তার অপরিচিত ।

হঠাৎ একদিন একটা ভজন গানের সময় কে যেন অন্তর থেকে বললে —“তোমার বোনকে আসতে চিঠি লিখ—সেও ত তোমার মত পৃথিবীতে একাকী !”

একদিন সন্ধ্যায় বসে সত্য সত্যই পীয়ার চিঠি লিখল । সে লিখলে অবশ্য খুব মেজাজ দেখিয়ে—টাকার দরকার থাকলে বা অন্য কোন রকম সাহায্যের দরকার হলে, সে যেন সত্বর তাকে জানায় । যদি শহরে আসতে পারে, তার সঙ্গে থাকবে । ইতি । তোমার ভাই, পীয়ার হলম, ইঞ্জিনীয়ার এ্যাপ্রেন্টিস্ ।

কয়েকদিন পরে একখানা চিঠি এসে খুব সুন্দর বাক্য হরপে লেখা । লুইস এই সেদিন কনফর্মড্ হয়েছে । যে কৃষকের সঙ্গে সে বাস করে, সে সারা শীত তাকে 'ডেয়রী মেড' হিসেবে রাখতে চায় । কিন্তু লুইস এত গুরুভার কাজ করতে পারবে না—ভয় পায় । কাজেই আগাম

রবিবার সন্ধ্যায় যে নৌকা আসবে, তাতে চড়ে সে শহরে আসছে।
ভালবাসা জেন। ইতি। তোমার বোন লুইস হেগেন।

পীয়ার চমকে উঠল—প্রকাণ্ড দায়িত্ব সে কাঁধে তুলে নিচ্ছে।

রবিবার সন্ধ্যায় নীল স্ফুটো পরে, আর ফেণ্ট হ্যাটটা মাথায় চাপিয়ে
সে তীরের দিকে অগ্রসর হল। জীবনে এই প্রথম কারুর ভার তাকে
নিতে হচ্ছে, আজ হতে তার চেয়ে হীন অবস্থার একজনের সে হবে পিতা
—হিতকামী। আর এক নূতন জীবনের আরম্ভ। সেই হাসিখুসী
ভদ্রলোকের কথা মনে পড়ে যায়—যে ট্রোয়েনে এসেছিল তার ছেলের
নক্ষানে। ঠিক এই ভাবেই ত তল্লাসী করতে হয়—সেই ভদ্রলোকের মত
সে হবে। অনিচ্ছাসত্ত্বেও পিতার সেই হাসি, হাঁটার সেই ভঙ্গী, চোখের দৃষ্টি
সেই রকম উদাসীন, তেমনি উচ্ছৃঙ্খল আচরণ তার দেহে ফুটে উঠতে লাগল।

“বেশ বেশ বেশ”—সে মনে মনে বলতে লাগল। কল্পনার সে
দখতে পাচ্ছে—তার মুখেও সেই রকম পরিষ্কার শাদা দাড়ি।

সবুজ ষ্টিমবোট মোড় ঘুরে বন্দরে প্রবেশ করল;—কাঠের পুল খুলে
দওয়া হল; খালাসীরা উপর হতে লাফিয়ে পড়ল। যাত্রীরা হড়মুড় করে তীরে
অবতরণ করল। পীয়ার কি করে তাকে চিনবে—তার বোনকে সে
কখনও চোখে দেখেনি। ডেকের ভীড় ক্রমশ পাতলা হয়ে গেল—বন্দর
ছেড়ে সবাই শহরের দিকে চলল।

একটি কৃষক মেয়ে একহাতে একটি বাক্স আর এক হাতে একটি
ভায়োলিন কেস—পীয়ারের দৃষ্টি আকর্ষণ করলে। ধূসর পোষাকে সে
নজ্জিত—মাথায় রেশমী চুলে কালো একখানি রুমাল—মুখ যদিও শুষ্ক
কিন্তু ধরণটি ভারী চমৎকার। তার মা'র মত—তার মা-ই যেন বোল
বছরের মেয়ের রূপ ধরে এসেছে। এদিক-ওদিক চাইছে সে—এবার
তার ওপর দৃষ্টি পড়ল, ভয়চকিত, জিজ্ঞাসু দৃষ্টি—

“তুমি কি লুইস ?”—

—“তুমি পীয়ার ?”—

মূহূর্তকাল তারা পরস্পরকে গভীর ভাবে পর্যবেক্ষণ করলে তাবপর করমর্দন ।

নিজেরাই বাক্স হাতে করে শহরের দিকে চলল । পীয়ার এর মধ্যোঁট এমন শহুরে হয়ে উঠেছে যে, রাস্তা দিঘে বাক্স হাতে একটি কুমক বালিকার পাশে পাশে যেতে সে লজ্জাবোধ করছিল । উঃ ওর জুতাজোড়া কি রকম ফট্ ফট্ শব্দ করছে ! কিন্তু প্রতিমূহূর্তেই লজ্জা করার জগ্ন সে মনে মনে লজ্জিত হয়ে উঠেছে ! ঐ নীল ক্রয়গল তার দিকে চেয়ে দেখছে — কি বলছে ? বলছে বোধ হয়—“আমি এসেছি, তুমি ছাড়া পৃথিবীতে আমার আর কেউ নেই ।”—ওই তার অভিবাক্তি ।

“তুমি ওটা বাজাতে পার”—বেহালাটাকে দেখিয়ে পীয়ার জিজ্ঞাসা করে ।

“ও বাজে”—সে শুধু হাসে । বললে যে সেক্সটন পরিবারের সঙ্গে বাস করত, কনফরমেশনের সময় তারা তাকে একটা নূতন পোষাক দিতে পারেনি”—কিন্তু পরিবর্তে এই বেহালাটা তাকে দিয়েছে ।

‘তারা তোমায় কনফরমেশনের সময় একটা নূতন পোষাক দিতে পারেনি ।’

‘না’—

—‘কিন্তু অগ্নাণ্ড মেয়েরা যখন নূতন পোষাক পরে তোমায় ঘিরে দাড়িয়েছিল তখন তোমার বিস্মী লাগেনি ।’

মূহূর্তের জগ্ন সে চোখ বুজলে—“ও ভয়ঙ্কর বিস্মী ।’

কিছুক্ষণ পরে, সে আবার জিজ্ঞাসা করলে—“তুমি কি অনেক জায়গায় থেকেছ ।’

—“অনুভব পক্ষে পাঁচ জায়গায়।”

—“ছ্যাঃ এ আর কি ? আমি ন’বার বাড়ী বদল করেছি।” মেয়েটি আবার হাসছে।

বাড়ীতে এসে লুইস চারিদিক তাকিয়ে দেখতে লাগল। এ রকম স্থানে থাকবে সে আশা করে নি’। শহরে সে কোনদিন আসেনি’—শহরের বন্ধ হাওয়ায় নিশ্বাস নিতে নাসিকা কুঞ্চিত হয়ে ওঠে। ওঃ—ঘরটা কি অন্ধকার—গুমোট !

“আগে আলোটা জ্বালি”—পীয়ার বলে।

সে একটু লাজুকের মত হাসল এবং কোথায় শোরে জিজ্ঞাসা করলে।

—“ঠিক কথা”—পীয়ার মাথা চুলকাতে লাগল—“মাত্র একটা বিছানা আছে।

একথায় দু’জনেই একসঙ্গে হেসে উঠল।

“তা’হলে আমাদের একজনকে মেঝেতে থাকতে হবে”—মেয়েটি বললে।

“ঠিক—ঠিক বলেছ”—পীয়ার উৎসাহিত হয়ে ওঠে—“আমার দু’টো বালিশ আছে, একটা তুমি নিও। দু’টো কম্বলও আছে—ঠাণ্ডায় ভুগতে হবে না।”

—“না হয়, আমার আর একটা জামা আছে—পরে নেব। তোমার কোন পুরান ওভারকোট নেই ?—

—“চমৎকার ! এ নিয়ে আর মাথা ঘামাতে হবে না”—

‘কিন্তু কোথেকে তুমি খাবার আন ?’—যেন সে এক্ষুণি সমস্ত পরিষ্কার করে বুঝে নিতে চায়। পীয়ার স্বীকার করতে বাধ্য হল যে, তখন তখনই তাকে কোন রেষ্টারায় নিয়ে গিয়ে খাওয়াবার ক্ষমতা তার নেই। টিউটারের মাহিনাও কাল চুকিয়ে দিতে হবে। তার বাক্স খালি।

“রাত্রে ঐ ষ্টোভে কফি গরম করি”—সে বললে—“গরম খাবার ঐ বাক্সে থাকে। যাক, এখন ‘সাপারে’র ব্যবস্থা করতে হবে।”

একটা বাক্স খুলে রুটি ও খানিকটা মাখন বের করল, কেটলীটা ষ্টোভে চাপিয়ে দিলে। লুইস পীয়ারকে টেবিল হতে কাগজ পরিষ্কার করতে সাহায্য করল—টেবিলের ওপর খাবার সাজিয়ে নিলে। কিন্তু ছুরি যে মাত্র একখানা! বেশ মজা, যাক অর্গোণে তারা চেয়ার দখল করল—অবশ্য প্রত্যেকেরই একখানা চেয়ার ছিল। নিজেদের বাড়ীতে এই প্রথম তাদের দু’জনের একত্রে আহাৰ।

ঠিক হল—লুইসই মেঝেতে শোবে—তারা দু’জনে এক পশলা খুব হেসে নিলে।

পীয়ার লুইসকে খুব ভাল করে ঢেকে দিলে—যাতে ঠাণ্ডা না লাগে। আলো নিভিয়ে দেওয়া হল; বাহিরে তখন প্রবল হাওয়া বইছে। উত্তরে বাতাস বাড়ীর ছাদের ওপরে সগর্জনে হু হু শব্দে বয়ে চলেছে। ঘুম আসাব আগে পর্য্যন্ত তারা অন্ধকারে শুয়ে শুয়ে গল্প করতে লাগল।

পীয়ারের নিকট ভারী আশ্চর্য্য ঠেকছে—পৃথিবীতে তারও একজন আত্মীয় আছে জেনে; সে আবার একটি মেয়ে—অতি ছোট, কিশোরী; তারই পাশে মেঝেতে সে শুয়ে আছে—পৃথিবীতে তার ভাল মনের জগু সে দায়ী।

লুইস পাশ ফিরে গুল। মেঝেটা নিশ্চই খুব শক্ত ঠেকছে।

—‘লুইস?’

—‘কি?’

—‘তুই কখনও মাকে দেখেছিস?’

—‘না।’

—‘বাবাকে?’

—‘বাবাকে ?’—সে হাসল।

—‘কেন, বাবাকেও দেখিস্‌নি ?’

—‘কি করে দেখব ? বোকা কোথাকার। কে বলেছে মা জানত
—কে তিনি ?’

কিছুক্ষণ চুপচাপ। তারপর হঠাৎ পীয়ার বোকার মত বলে উঠল
—‘তা হলে এ পৃথিবীতে আমরা নিঃসঙ্গ — কেবল তুমি আর আমি !’

‘হাঁ, একরকম তাই !’

—‘লুইস তুই এখন কি করবি, ঠিক করেছিস্’—

‘তুমি ?’

পীয়ার তাকে তার জীবনের কৰ্ম-পন্থা বলে গেল। প্রথমে সে
কিছুই প্রতিবাদ করলে না—যেন সে তার মনের পটে অঁাকা জীবনের
স্বপ্নে বিভোর।

শেষে সে মুখ খুলল—আচ্ছা, ধাত্রীবিদ্যা শিখতে কি খুব টাকার দরকার
তোমার কি মনে হয় ?’

‘ধাত্রী হওয়া—এই তোমার জীবনের উদ্দেশ্য ?’ পীয়ার হাসি সম্বরণ
করতে পারলে না। তাহলে এতদিন সে মনে মনে এই স্বপ্নের জাল
বুনেছে।

‘কেন আমার হাত দুটো কি একাজের পক্ষে খুব বেশী লম্বা ?’—সে
সাহসে ভর করে জিজ্ঞাসা করল ; কারণ, পীয়ারের স্বগতোক্তি সে
শুনতে পেয়েছে।

পীয়ারের মন করুণায় আদ্ৰ হয়ে উঠল। বহুপূর্বেই সে লক্ষ্য
করেছে তার করুণ সুন্দর মুখশ্রীর সঙ্গে লাল ফোলা ফোলা হাত দুখানি
কি বেমানানই না দেখায় ! গ্রামের লোকেরা একরকম ছোট ছোট
হাতকে ‘মিড্‌ওয়াইফের হাত’ বলে।

“যা-হোক করে, কোনমতে একটা ব্যবস্থা করে নিতে হবে।” পীয়ার উৎসাহ দেয়। কিন্তু সে জানে, স্কুলে “মিডওয়াইফারী” শিখতে গেলে অনেক ক্রাউন খরচা করতে হবে। আর অত টাকা রোজগার করা তার পক্ষে সময়সাপেক্ষ—কয়েকবছর লেগে যাবে। হতভাগিনীকে তাহলে দীর্ঘ দিন প্রতীক্ষা করে থাকতে হবে।

তারপর তারা নীরব হয়ে গেল। উত্তরে বাতাস বাড়ীর ছাদের ওপর হু হু করে বয়ে চলেছে। দেখতে দেখতে ভাই বোন ঘুমের কোণে চুলে পড়ল।

পরদিন প্রভাতে পীয়ার উঠে দেখে—লুইস্ তার বহুক্ষণ পূনোই উঠেছে—শোভে কফি করছে। একটা বাক্স হতে পেটিকোট খুলে সে পেরেকের সঙ্গে বুলিয়ে দিলে, দেওয়ালে এক জোড়া নতন জুতা ঠেস দিয়ে রাখল—কতকগুলো নীচে পরবার জন্ম কাপড় ও উলেন ষ্ট্রিক্ বের করে দেখে, আবার বাক্সবন্দী করে রেখে দিল। সেই বাক্সের মধোই তার সমস্ত সম্পত্তি।

পীয়ার উঠতে চেষ্টা করল। “ওকি, নীচে ও কিসের শব্দ!”—লুইস্ হঠাৎ চীৎকার করে উঠল।

—“ও নিয়ে মাথা ঘামাবার দরকার নেই,”—পীয়ার সাহস দেয়—“জবমাষ্টার আর তার স্ত্রী ঝগড়া করছে—প্রত্যহ সকালেই এ রকম অভিনয় হয়ে থাকে। ভয় নেই—অভ্যাস হয়ে যাবে।”

তারা আবার টেবিলের ধারে বসে কফি পান করে,—পরস্পরের দিকে চেয়ে হাসে। লুইস্ ইতিমধ্যে চুলটা ঠিক করে নিয়েছে—দুটি সুন্দর বিনুনী কাঁধের ওপর এলিয়ে পড়েছে। পীয়ারের কাজে যাবার সময় হয়ে এল। লুইস্কে বাড়ী ছেড়ে বেশী দূরে যেতে নিষেধ করে (তাহলে পথ হারিয়ে ফেলতে পারে) তরতর করে সিঁড়ি বেয়ে নেমে গেল।

সেখানে গিয়ে ক্লসের সঙ্গে দেখা—তাকে বোনের আগমন বার্তা

জানালাল .

—“তার কি ব্যবস্থা করবে”—ক্লস জিজ্ঞাসা করল ।

—“এখন সে থাকবে আমার সঙ্গে”—

তোমার ত মাত্র একটি ঘর, একটি বিছানা ?”

—“কেন, সে মেঝেতে শোবে ।”

—“সে—তোমার বোন মেঝেতে শোবে—আর তুমি দিবি চৌকিতে
নিদ্রা দেবে ?”

পীয়ার দেখলে—তার ভুল হয়েছে । “আরে না-না আমি শুধু
কথার কথা বলছিলাম ।” তাড়াতাড়ি কথার মোড় ঘোরাতে হয়—
“না, লুইসই চৌকির ওপর শোবে ।”

বাড়ী ফিরে এসে দেখে লুইস মাষ্টারের স্মীর কাছ থেকে “ফ্রাইং
প্যান” ধার করে এনে বেকন সেকছে—কয়েকটা আলুও সিদ্ধ করেছে ।
ওখনই তারা বাদশাহী ভোজের সন্ধ্যাবহার করতে লেগে গেল ।

হঠাৎ লুইসের দৃষ্টি দেওয়ালে টাঙ্গান রঙ্গীন চিত্রের দিকে পড়ল—
পীয়ারকে ওটা পেটিং কি না, জিজ্ঞাসা করায় সে বেশ উৎসাহিত হয়ে
উঠল । ওটা পেইনটিং ? হ্যাঃ একটা আলিওগ্রাফ মাত্র । কিছু
জানে না ! আচ্ছা তোমাকে আর্ট গ্যালারীতে নিয়ে গিয়ে আসল
পেইনটিং কাকে বলে দেখিয়ে নিয়ে আসব । এই বলে সে টেবিল
বাজাতে আরম্ভ করলে—“বেশ, বেশ, বেশ ।”

তাদের মধ্যে ঠিকঠাক হল—লুইস চাকুরীর সন্ধান করবে—তাহলে
তাদের অবস্থার একটা সুরাহা হতে পারে । এবং প্রথম চেষ্টাই
সাফল্যমণ্ডিত হল । একটা রেন্ডর’র মেঝে পরিষ্কার আর আলু ছাড়াবার
কাজ সে পেল ।

শোবার সময় পীয়ার লুইসকে বিছানায় শোবার জন্য পীড়াপীড়ি করতে লাগল। “কাল রাতে আমি শুধু ঠাট্টা করেছিলাম”—পীয়ার বুঝিয়ে দিলে—শহরের নিয়ম হচ্ছে মেয়েরা সবচেয়ে ভাল জিনিসটা পাবে—একেই বলে সভাভা”—এই বলে সে শক্ত মেঝেতে সটান শুয়ে পড়ল। এ আর এক অভিনব অভিজ্ঞতা। ছোট্ট সঙ্কীর্ণ কামরা, হঠাৎ যেন অনেকটা বেড়ে উঠেছে—নবান অতিথিকে স্থান দেবার জন্য। এরকম ভাবে মেঝেতে শুতে একটুও কষ্ট হচ্ছে না—সে ত ইচ্ছে করেই শুয়েছে—বোনের জন্য।

ল্যাম্প নিভিয়ে দেওয়া হল—শুয়ে শুয়ে কয়েক মিনিট সে তার নিখাস-প্রখাস ধ্বনি শুনতে লাগল। তারপর শেষে—

—‘লুইস?’

—‘কি?’

‘তোমার বাবা—বাবার নাম কি হেগেন?’

—‘হ্যাঁ—সার্টিফিকেটে তাই লেখা আছে।’

—‘তা হলে তুমি ফ্রোকেন হেগেন—বেশ নাম, না?’

—‘হ্যাঁ: তুমি ঠাট্টা করছ।’

—‘আর তুমি যখন ‘মিডওয়াইফ’ হবে, তখন অতি সহজেই একজন ডাক্তারকে বিয়ে করতে পারবে।’

—‘ফাজিল, —এ রকম হাত যার—তার ভাগ্যে কখনও হয় না।’

—‘তুমি কি মনে কর—তোমার হাত খুব গম্বা—যে একজন ডাক্তারকে বিয়ে করার পক্ষে নেহাৎ অনুপযুক্ত।’

—‘তোমার মাথায় ছিট আছে। হা-হা-হা।’

—হা হা-হা .

ভার্সা কন্বলের তলায় খুব আরাম করে গুটিগুটি ঘেরে শুয়ে পড়ল ;

মনেব মধো শান্তি ও আনন্দের ভাব—উৎফুল্ল মনে কোন বন্ধুর সঙ্গে
একত্রে এক ঘরে শুলে এ রকম শান্তি ও আরাম উপভোগ করা যায়।

— “গুড নাইট, লুইস।”

— “গুড নাইট, পীয়ার।”

এই ভাবে অনেকদিন কেটে গেছে—শীত গত প্রায়। এখন লুইসও রোজগার করতে আরম্ভ করেছে। তারা এখন বেশ দু'পয়সা খরচ করতে পারে—রেষ্টুরায় গিয়ে রোজ ইচ্ছে হলে চার পেন্স দামের মাংসের চপের ন্যায় দামী খাবার খাওয়ার ক্ষমতাও তাদের হয়েছে। পীয়ারের জন্য একখানা খাট কেনা হয়েছে—খাটখানা দিনের বেলা ভাঁজ করে রেখে দেওয়া যায়। পোষাক খোলা বা পববার সময় তাদের দু'জনের মধ্যে একটা স্ক্রীন থাকা দরকার—অসুস্থ রুচির দিক দিয়ে শোভনকর হয়। তাই তারা লুইসের উলের শালখানা টাঙিয়ে নিয়েছে। লুইস আজকাল তার ভায়ের মত গ্রাম্যতা ছেড়ে শহরে আদবকায়দাও আয়ত্ত্ব করতে আরম্ভ করেছে।

বিছনায় শুয়ে ঘুম আসাব আগে এখন প্রায়ই পীয়ারের মাথায় এক দু'ভাষনা এসে ভর করে—“বালিকাটিকে দেখতে ঠিক তার মার মত -- যদি সেও তার মা'র পদাঙ্ক অনুসরণ করে? না না, তা কখনই হতে পারে না। ফ্রোকেন হেগেন তুমি এখন বড় হয়েছে—যাতে এরকম অনভিপ্রেত কিছু না ঘটে সেটা তোমার দেখতে হবে।

দিনের বেলায় দু'জনের দেখাসাক্ষাৎ খুব কম হত। কারণ খুব ভোরেই তারা বেরিয়ে যেত এবং পীয়ারের ফিরতে প্রায়ই সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসে। পীয়ার যখন লুইসকে পুরুষের সাহচর্যা সধাঙ্ক সতর্ক করে লোকচার দেয়—সে শুধু শ্রান শুনে হাসে। একদিন ক্লস ব্রক তাদের সঙ্গে দেখা করতে এসে লুইসের সঙ্গে কথা বলতে বলতে চোখ ঘুরাচ্ছিল—পীয়ার ত দেখে

চাটাই আগুন—ইচ্ছা হচ্ছিল তার গদার কলার ধরে তৎক্ষণাৎ তাকে ছুড়ে নাচ ফেলে দেয়।

ক্রীষ্টমাস আগত প্রায়। শীতের দীর্ঘ সঙ্কায় তারা রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়াত—চোখ বলসান আলোয় শোভিত, চিত্তচাঞ্চল্য সৃষ্টিকারী ঝকঝকে উজ্জ্বল সোনা আর পোষাক ভরা দোকানগুলি ঘুরে ঘুরে দেখত। এটা-ওটার দাম জিজ্ঞাসা করে লুইস খালি পীয়ারকে উদ্বাস্ত করে তুলতে লাগল—‘এই লেস, ওই ঘড়িটা, স্কাট, বোচ।’ “দাড়া আগে ডাক্তারের সঙ্গে তোমার বিয়ে হোক”—পীয়ার উত্তর দেয়—“তা হলে সব কিনতে পারবি।” তাদের কারুরই কোন ওভারকোট ছিল না। শীত অনুভব করলে পীয়ার কোটের কলারটা উন্টিয়ে দিত—এবং লুইসের পক্ষে পুরান পোষাকটাই যথেষ্ট ছিল আর গ্রামে কেনা ভাল শ্রাবস তাকে বেশ গরমে রাখত। এখন সে কুমালের বদলে একটা টুপি কিনেছে—এবং টুপি পরে চারিদিকে সচকিত দৃষ্টি নিষ্ক্ষেপ করবার লোভ সে সম্বরণ করতে পারত না—ভাবত লোকে দেখুক তাকে, কত সুন্দর দেখাচ্ছে।

ক্রীষ্টমাসের দিন সঙ্কায় এক বালতি জল দিয়ে তারা সমস্ত ঘর ধুয়ে ফেলল। তারপর তারা ছুজনে গ্রামের লোকদের মত পরস্পরের পিঠ ও কাঁধ ঘষে বেশ করে স্নান করল। পীয়ার এখন শহরে বনে গেছে—কাজেই ধোনের জন্তু হুঁচারটে প্রেজেন্ট কিনে ফেললে। কিন্তু লুইস এসব কায়দায় অনভ্যস্ত, কাজেই কেনা হয়নি—সে শুধু নিজের অপটুতায় কেঁদে ভাসালে। তারা সিরাপ মাথিয়ে কুটি খেলে—তারপর চকোলেট। শেষে লুইস বেহালা নিয়ে তার জানা সবচেয়ে ভাল গদ বাজালে আর পীয়ার বাইবেল থেকে ক্রীষ্টমাস লেসন পড়ে শোনাল। ট্রোয়েনে যে রকম করতে চেয়েছিল ঠিক সেইভাবেই তারা ক্রীষ্টমাস সঙ্কায় কাটাল।

সেদিন রাতে বিছানায় শুয়ে আলো নিভিয়ে দেওয়ার পরও তারা অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত জেগে ছিল—ভবিষ্যতের কর্মপদ্ধতি সম্বন্ধে আলোচনা করতে। জীবনে যখন তারা প্রতিষ্ঠিত হবে, তখন তারা পরস্পরের অতি নিকট সান্নিধ্যে বাস করবে প্রতিজ্ঞা করল। তাহলে তাদের ছেলেমেয়েরা একত্রে খেলবার বা বাস করবার সুযোগ পাবে। লুইস কি সত্যই একথা ভাবেনি? এটা কি খুব সুন্দর আইডিয়া নয়? নিশ্চয়ই সুন্দর। পীয়ারের এ ঠিক মনের কথা? নিশ্চয়ই এর মধ্যে কোন খাদ নেই।

এরপর শীতের সঙ্ক্যায় লুইস যখন উদগ্রীব প্রতীক্ষা নিয়ে পীয়ারের জন্ম অপেক্ষা করত, পীয়ার তখন ওভার টাইম কাজ করত—তখন মাঝে মাঝে সত্যই সে ভয়ে শিউরে উঠত। ঐ ত সিঁড়িতে তার পদধ্বনি শোনা যাচ্ছে। যদি কোন দিন এই পদধ্বনি দ্রুত অথবা ব্যগ্রতাসূচক বলে মনে হ'ত লুইস ঠিক কাপতে আরম্ভ করে দিত। আর পীয়ার ঠিক সেই সময়ে সশব্দে গৃহের মধ্যে ঢুকে চেঁচিয়ে উঠত—“হ্যালো লুসি—আজ একটা নূতন জিনিষ শিখেছি।”

“—সত্যি পীয়ার—”

তারপর বাক্যের স্রোত বয়ে চলে—মোটর, প্রেসার, সিলিণ্ডার। এই রকম শত সহস্র জিনিষ সম্বন্ধে। লুইস বসে শোনে, মুখে হাসিগু রেখা খেলে যায়। কিন্তু সে এর বিন্দু বিসর্গও বুঝতে পারে না—পীয়ার যখন একথা জানতে পারে, সে ত রাগে অগ্নিশর্মা হয়ে যায়—তাকে গোমূর্খ বলে গালাগালি দিতে আরম্ভ করে।

কত সুদীর্ঘ সঙ্ক্যা গেছে, সে বাড়ী বসে পড়েছে—একা, কোন দিন বা তার শিক্ষকের সঙ্গে—আর লুসি সে সময় বসে থেকেছে এমন আড়ষ্টভাবে যে, সূচ নিয়ে এক লাইন সেলাই করবার ক্ষমতা পর্য্যন্ত সে

হারিয়ে ফেলত। হঠাৎ পীয়ারের একদিন কি খেয়াল হ'ল যে, তার বোনেরও লেখাপড়া শেখা উচিত। অমনি তাকে সে ইতিহাসের পড়া দেখিয়ে দিলে—পরদিন বিকেলে তাকে পড়া দিতে হবে। কিন্তু শেখবার সময় কোথায়? তখন সে তার বানান শোধরাবার জন্য তাকে ডিকটেশন দিতে আরম্ভ করল—কিন্তু পড়বার সময় ঘুমে তার চোখ জড়িয়ে আসত। দিনের বেলায় তাকে মেঝে ধুতে—কতগুলো আলুর খোসা ছাড়াতে হয়েছে—কাজেই এখন তার সারা দেহ সীসের মত ভারী ঠেকে।

কিন্তু পীয়ার রাগে গরগর করতে করতে সারা মেঝে পায়চারী করতে থাকে; বলে—“দেখ লুসি, তুমি যদি লেখাপড়া না শিখে পৃথিবীতে উন্নতি করবার আশা করে থেকে থাক ত সে তোমার মারাত্মক ভুল।” কিন্তু তবুও সে তাকে এক লাইন শেখাতে পারেনি, শুধু পেরেছে চোখে জল বের করতে। কিন্তু পর মুহূর্তেই আবার তার মাথা টেবিলে ঢলে পড়ে—ঘুমে অচেতন হয়ে। পীয়ার বুঝতে পারে এর আর কোন প্রতিকার নেই। কাজেই সে আস্তে আস্তে তাকে তুলে নিয়ে বিছানায় শুইয়ে দিত, খুব সস্তর্পণে—পাছে সে জেগে ওঠে।

একদিন বসন্তে পীয়ার রোগে পড়ল। ডাক্তার এসে ঘরের চারিদিকের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করে, ভুরু কুঁচকে লুইসকে বলল—লুইস তখনও ভাল ছিল—“এটা কি মানুষের বসবাস করবার জায়গা? এখানে বাস করলে ভাল থাকবে কি করে আশা কর?” তিনি পীয়ারকে পরীক্ষা করতে লাগলেন, সে খক খক করে কাসছিল—মুখ আগুনের মত লাল। “ঠিক যা ভেবেছি, বুকের অসুখ।” তিনি আর একবার ঘরের চারিদিকে তাকালেন, “একে বরং এখনি হস্পিটালে পাঠিয়ে দাও”—তিনি বলে গেলেন।

পীয়ারকে নিয়ে যাবে এই শঙ্কার সেখানে সে বসে পড়ল। ডাক্তার

যাবার সময় তাকেও একটু গভীরভাবে নিরীক্ষণ করে বলে গেলেন—
“তুমিও একটু সাবধানে খেক। তোমায় দেখে মনে হচ্ছে, আলো
হাওয়াপূর্ণ একটি সুন্দর গৃহে স্থান পরিবর্তন তোমার পক্ষে খুব দরকার
গুড মর্নিং।”

ডাক্তার বিদায় হবার কিছুক্ষণ পরেই হস্পিটাল-এ্যামবুলান্স এল-
ষ্ট্রেচারে করে পীয়ারকে नीচে নামিয়ে নিয়ে যাওয়া হল। চাকার ওপর
বসান সবুজ রং করা একটা বাক্সের দরজা খুলে গেল আর পীয়ারকে
গহ্বর উদরসাৎ করে নিলে। লুইসকে তার সঙ্গে যেতে দেবে না। সারা
সন্ধ্যায় সে একাকী ঘরে বসে কেবল কেঁদে চোখ ভাসাল।

তখনকার দিনে হস্পিটালের অবস্থা ছিল অতি পুরাতন ধরণের—
পারতপক্ষে কেহ তার কাছে ঘেঁসত না। ভেতরে যে দুর্দশা, দৈন্যাবস্থা
তা বাইরের দেওয়ালের দিকে চাইলেই স্পষ্ট বোঝা যেত। সাধারণ
ওয়ার্ডের অর্থাৎ যেখানে গরীবেরা থাকত, সেখানে এত রোগীর ভীড় হয়
এবং এত বিচিত্র তাদের রোগ যে, তারা নিজেরাই রোগ ছড়াত।
অস্ত্রোপচারের কাজ খুব নির্কিঁয়ে সমাধা হত—রোগীদিগকে ষ্ট্রেচারে
করে বাহিরের উঠানে নিয়ে আসা হত এমন কি দুর্জয় শীতের সময়ও।
রোগীর গায়ে একখানা কম্বল চড়ান থাকত—কাজেই সকলে ভাবত
তাকে গোরখানায় নিয়ে যাওয়া হচ্ছে।

পীয়ার চোখ খুলেই তার পায়ে কাছ শাদা ব্লাউজপরা কে দাঁড়িয়ে
আছে দেখতে পেল। “এবার জ্ঞান ফিরে আসছে”—লোকটি বলল—
বোধ হয় ডাক্তার হবে। পীয়ার পরে নাসের কাছ থেকে জানতে
পেরেছিল যে, চক্ষিশেষ্টারও বেনী সে অজ্ঞান হয়ে ছিল।

দিনের পর দিন বিছানায় শুয়ে পীয়ারের মনে হত একটা উত্তপ্ত
লাল লৌহশলাকা তার বুক ভেদ করে ঠেলে উঠছে—তার শ্বাসপ্রশ্বাস বন্ধ

করে দিচ্ছে। ঘণ্টায় ঘণ্টায় একজন লোক এসে তার মুখে মদ আর
গ্যাপ্‌থা পুরে দিত—আর সকাল সন্ধ্যায় তাকে খুব যত্ন সহকারে স্নান
করান হত। ঘর ক্রমশ উজ্জ্বল হতে লাগল—খাবারের স্বাদ সে পেতে
লাগল তারপর পাশের বেডের লোক চিনতে ও তাদের সঙ্গে কথা বলতে
সক্ষম হল।

তার পাশের বেডে একটি কালো চুলওয়ালা জাহাজের খালানী ছিল—
খালানীটির মুখের রং পীতাম্ব, নাক ভাঙ্গা। তার রোগ পীরারের রোগ
হতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। কিন্তু সে নাসকে ভাল খাবার দেওয়া হচ্ছে না
বলে অশ্লীল গালাগালি করত—কর্তৃপক্ষকে এ সম্বন্ধে 'রিপোর্ট' করবে—
এমন ভয়ও দেখাত। তার আর একপাশের বেডে থাকত একজন জীর্ণ-
শীর্ণ মুচি—তার মুখে একগাল দাড়ি—ঠিক ছবির যীসাস ক্রাইষ্টের মত।
তার চোখেমুখে প্রবল জ্বরের ছাপ সুপরিষ্কৃত—সে ক্যানসার রোগাক্রান্ত।
আর তার ঠিক পায়ের কাছে থাকত—প্রফেট মোজেসের মত
চেহারাওয়ালা এক ব্যক্তি, তার মুখে ও মাথায় শণের মত শাদা চুল।
যশ্মা রোগাক্রান্ত সে—পৃথিবীতে তার থাকবার মেয়াদও ফুরিয়ে এসেছে।
সে কাসলে ঠিক রীভেটিং মেশিনের আওয়াজের মত শোনাত। সে খালি
বলত—“হ'য়, যদি একবার কোনমতে জার্মানী পৌঁছতে পারতাম,
তাহলে এখনও বাঁচবার আশা ছিল।” আর এর পাশে আর একটি
লোক থাকত, তার মুখে ছোট ছোট দাড়ি, আর চোখে অন্তর্ভেদী দৃষ্টি।
এর মাথার একটু গোদমাল আছে—সে সর্বদাই মনে করত, সে যেন
একজন সেনাধ্যক্ষ। প্রায়ই সে রাত্রিবেলা শয্যা ছেড়ে লাফিয়ে উঠে,
সোজা হয়ে বসে চেঁচাত—“এ্যাটেনশান”—তার কর্কশ কণ্ঠে সকলের
নুম ভেঙ্গে যেত। এই ঘরে আর এক ব্যক্তি ছিল—তার সারা দেহ
চরারোগ্য কতে ভরা, সে শয্যায় গুয়ে খালি এপাশ ওপাশ করত আর

প্রবল আর্তনাদ করত। একদিন লোশনের জন্তু যে এ্যালকোহল ব্যবহার করা হয়, তারই খানিকটা খেয়ে ফেললে। এরপর থেকে সে একবার কাঁদত আর একবার হাসত। আর একজন লাল দাড়িওয়ালা চোখে চশমা আঁটা কমাশিয়াল ম্যানেজার সেখানে ছিল—সে নিজের মাথায় নিজে গুলী করেছিল। ডাক্তারের চেষ্টা করে মাথা থেকে গুলী বের করে দিয়েছে। এখন সে বিছানায় শুয়ে ঈশ্বরের নিকট কেবল আশু মুক্তির প্রার্থনা জানায়।

রাত্রিতে এই বিরাট কক্ষে দ্যাম্পার স্তমিত আলোকে জেগে থাকতে পীয়ারের কাছে বড়ই অদ্ভুত ঠেকত—মনে হত মৃত্যুরাজ্যের অধিবাসীরা তার চারিপাশে ঘুরে বেড়াচ্ছে। কিন্তু দিনের বেলায় যখন রোগী রোগিণীদের আত্মীয় বন্ধুবান্ধব তাদের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ করতে আসত তখন পীয়ার আর কোন মতেই কান্নার বেগ রুদ্ধ করতে পারত না। মুচিটির স্ত্রী ও একটি মেয়ে আছে—তারা তার পাশে বসে সতৃষ্ণ নয়নে চেয়ে থাকত তার পানে—যেন কোন মতেই তাকে যেতে দেবে না। প্রফেটেরও স্ত্রী আছে—সে শুধু অধীরভাবে কাঁদত। এমনিভাবে প্রত্যেকেরই কোন না কোন আত্মীয় স্বজন আছে, যারা 'গাদের তত্ত্বাবধান করতে আসত। কিন্তু লুইস—কোথায় সে, কেন সে আসছে না?

ডাইনের বেডের লোকটির একটি বোন আছে—লুঠিয়ে পড়া ময়লা সিক্কের গাউন পরে সে খুব সেজেগুজে আসত। তার "পায়ে হীলতোলা জুতা—কিন্তু তার মাথার টুপিটা বড়ই অদ্ভুত—জমকাল পালক লাগান। "কি হে কেমন আছ?"—সে জিজ্ঞাসা করত; পায়ের ওপর পা তুলে দিয়ে বসত। তারপর তারা অদ্ভুত নামওয়ালা লোকের সম্বন্ধে অদ্ভুত সব গল্প করত। 'গ্যালিওট,' 'কিংরীং' এই রকম অনেক কথা সম্ভবতঃ

তাদের বন্ধু হবে। একদিন সে ছোট্ট বোতলে করে এক বোতল ত্র্যাণ্ডি নিয়ে এল—‘হেজহগের প্রেজেন্ট’। এটিকে সে বিছানার চাদরে জড়িয়ে এনেছিল। সে চলে যাওয়ার পর বোতলের ছিপি খুলে পীয়ারকে বলল—
“নাও চটপট খেয়ে নাও একচুমুক।” না, পীয়ার পান করবে না!
তারপর ঢকঢক শব্দ শোন। গেল—তারপর গান সপ্তমসুরে।

অবশেষে একদিন লুইস এল—মাথায় তার পরিচ্ছন্ন টুপি—হাতে ছোট্ট একটা বাণ্ডুল। ঘরে ঢুকেই সে চারিদিকে একবার চোখ বুন্ডিয়ে নিলে—রোগীর ঘরের ভাপসা গন্ধ তাকে অজ্ঞান করে ফেলবে মনে হল। তারপর সে পীয়ারকে দেখতে পেল—মুখে এক ঞশলা হাসি খেলে গেল। অতি সন্তর্পণে সে এগিয়ে এল পীয়ারের দিকে। উঃ পীয়ারের কি পরিবর্তন হয়ে গেছে—তার কাছে ভারী আশ্চর্য্য ঠেকছিল। সে পীয়ারের পাশে এসে বসল—অঁখির পাতা জলে ভারী হয়ে আসে, কিন্তু মুখে তখনও সেই স্বর্গীয় হাসির দীপ্তি।

“ঘাক্, তা হলে শেষটায় তুই আসতে পেরেছিস্”—পীয়ার বলে।

—“তারা এর আগে আমায় ঢুকতে দেয় নি যে”—কঁদতে কঁদতে লুইস উত্তর দেয়। ক্রমশঃ পীয়ার জানতে পারল—রোজই সে এসেছে, কিন্তু রোজই তাকে বিমুখ হয়ে ফিরে যেতে হয়েছে। রোগী যে কারুর সঙ্গে কথা বলতে অক্ষম—এত সে পীড়িত!

নাক খাঁদা সেই লোকটি সারসের মত ঘাড় উঁচিয়ে দেখে নিলে—কে এই বিনম্র স্ফেয়েটি। কিন্তু তখন সে তার ছোট্ট পুটলিটি খুলেছে। ভায়ের জন্ম বোন সামান্য কিছু এনেছে—এক বোতল লেমনেড আর কয়েকটা কমলালেবু।

কিন্তু এর দু একদিন পরে এমন একটা ঘটনা ঘটল—যার স্মৃতি শেষ জীবনে প্রায়ই তার মনে উপস্থিত হয়েছে—অপূর্ব শোভাসম্ভার নিয়ে।

সেদিন অপরাহ্নের দিকে পীয়ার ঘুমিয়ে পড়েছিল—যখন জাগল, তখন আলো জ্বালা হয়ে গেছে—একটা পীত স্তিমিত ড্যাতি সারা কক্ষটি ছেয়ে আছে। অণ্ডেরা সব ঘুমিয়ে আছে মনে হল। চারিদিকে একটা সীমাহীন নিস্তব্ধতা বিরাজ করছে—কেবল মাঝে মাঝে সেই ক্ষতগ্রস্ত রোগীর অক্ষুট আর্তনাদ শোনা যাচ্ছিল। এমন সময় দরজা খুলে গেল। পীয়ার দেখল—লুইস ঘরে ঢুকছে—ধীরে অতি সন্তর্পণে—বগলের তলায় তার সেই বেহালার বাজ। সে পীয়ারের কাছে এল না ঘরের মধ্যে বেহালা বাজাতে লাগল—সেই পরিচিত গদ—The mighty host in white array. (শৈত্যমান সেই বীরের দল)।

ক্ষতগ্রস্ত রোগীর গোড়ানী খেমে গেল—অণ্ডাণ্ড রোগীদেরও চোখের পাতা খুলে গেল। সেই নাকভাঙ্গা খালসী শয্যার ওপর উঠে বসল—আর মুচির জ্বরের বোর কেটে গেল—হাতের ওপর মাথা রেখে সে কিস কিস করে বললে—“এই ত সেই ত্রাণকর্তা—আমি জানতুম তুমি আসবে। অথও নীরবতা—লুইস বাজিরে চলেছে তার সাধ্যমত—দৃষ্টি নিবন্ধ বেহালার তারের ওপর। ক্ষয়রোগী কামতে ভুলে গেল করপোরাল ‘এ্যাটেনশান’ অবস্থায় শুয়ে রইল—আর সেই কমান্ডার ট্র্যাভেলার হাতজোড় করে তার দিকে নিম্পলক নেত্রে চেয়ে রইল।

বেহালার সহজ সরল সুর সেই মৃতপ্রায় হতভাগ্যদের জীবনে যেন নূতন প্রাণের সাড়া এনে দিল—তারই রূপের বিভায় তাদের আনন উজ্জ্বল। আর সেই আধা আলোয় যখন লুইস দাঁড়িয়েছিল তখন পীয়ারের নিকটও মনে হচ্ছিল, সে যেন সুরের সঙ্গে সৃষ্টি হয়েছে; অনন্ত শূন্যে পক্ষ মেলে মিলিয়ে যাবার ক্ষমতা তার আছে।

গান শেষ হলে সে মন্থরগতিতে ভায়ের কাছে এল, তার কপালে

হাত বুলিয়ে দিলে, তারপর যেমন এসেছিল তেমনি সন্তুর্ণনে নিঃশব্দে -
- বাঁরে ধীরে অদৃশ্য হয়ে গেল।

এরপর সেই অঁধারবিমলিন কক্ষে অনেকক্ষণ নিস্তব্ধতা বিরাজ
করেছিল, অবশেষে সেই মরণমুখী মূর্চার কণ্ঠই প্রথম শোনা গেল
- “আমি জানতাম, তুমি আসবে—তোমায় নমস্কার”

হস্পিটাল ত্যাগ করার সঙ্গে সঙ্গেই পীয়ারকে কাজে যোগ দিতে
ডাক্তার নিষেধ করল। বরং কয়েকদিনের ছুটি নিয়ে গ্রামে যেয়ে
স্বাস্থ্য পুনরুদ্ধার করতে উপদেশ দিল। “বলা সহজ” পীয়ার মনে
ভাবল জানে না ত ক’দিন পরেই তাকে আবার ওয়ার্কশপে যোগ দিতে
হবে।

কিন্তু বোনের সঙ্গে তার আচরণের অনেক পরিবর্তন দেখা গেল।
পূর্বের চেয়ে এখন সে অনেক বেশী বিবেচক হয়েছে। শীঘ্রই সে তাকে
একটা স্টিচশিল্পের কাজ যোগাড় করে দিলে—অস্তুত ঘর ধোয়ার মত
বিশীল কাজের হাত থেকে তাকে মুক্তি দিতে পেরেছে।

এখন লুইসের হাত আর পূর্বের মত লালও হয় না—ফোলেও না—
বরং ক্রমশ তাদের কর্মনীষতা বাড়ছে।

পরের শীতে সঙ্ঘ্যার শ্রান্ত অবসরে পীয়ার যখন পড়ত, লুইস তখন
নিজের জন্ম একটা পোষাক তৈরী করলে—একটা নূতন টুপিও—সেই
পোষাকে তাকে দেখাত যেন ঠিক একটি তরী যুবতী নারী। তাকে
সঙ্গে নিয়ে পীয়ার যখন রাস্তায় বের হত, রাস্তার লোকেরা তার দিকে
চোরে থাকত—আর সে ঘুসি বাগিয়ে খালি গর্জন করত। অবশেষে
এমন দাঁড়াল পুঁথ, একদিন লুইস তার ভাইকে বলতে বাধ্য হ’ল—“দেখ
দ্যাও তুমি যদি ওরকম কর, তাহলে আর কখনই তোমার সঙ্গে বেড়াতে
পেরে হব না”

পীয়ার গর্জাত—“বেশ, কিছু বলব না—কিন্তু তোমার জীবনেও যেন সেই পুরাতন নাট্যের অভিনয় না হয়, দেখতে হবে।”

—“কিন্তু তুমি ভুলে যাচ্ছ—আমি এখন বড় হয়েছি ; লোকে আমার দিকে তাকাবেই—তুমি তা বন্ধ করতে পারবে না—”

ক্লস ব্রক ইতিমধ্যে টেকনিক্যাল কলেজে ভর্তি হয়েছে—মাথার টুপিতে কলেজের ব্যাজ, মুখে সিগারেট—ছড়ি ঘোড়াতে ঘোড়াতে সে পথ চলে। মাথায়ও সে অনেকটা বেড়ে উঠেছে—বুকের ছাতিও বুদ্ধি পেয়েছে—নাচের ছন্দে এখন সে পথ চলে। মাথার চুল তেরছা হয়ে কপালের ওপর এসে পড়ে আর মুখে সর্বদাই যেন—“কি হয়েছে, আমি প্রস্তুত”—এমনি একটা ভাব প্রচ্ছন্ন থাকে।

একদিন বিকেলে সে লুইসকে তার সঙ্গে থিয়েটারে যেতে আহ্বান করলে। আনন্দের পুলক-শিহরণে সে লাল হয়ে গেল—পীয়ারও তার অনুরোধ উপেক্ষা করতে পারলে না। এরপর আর এক রবিবারে ক্লস আবার এসে উপস্থিত—লুইসকে বেড়াতে যেতে বলতে। এবার আর সে পীয়ারের সম্মতির জন্তু অপেক্ষা করলে না—তৎক্ষণাৎ তার সঙ্গে রওনা হ'ল। সেদিন রাতে বাড়ী ফিরলে লুইসকে পীয়ারের কাছে তীর ভৎসনা শুনতে হয়েছিল।

পীয়ার শীঘ্রই আবিষ্কার করলে, বালিকাটি আজকাল অর্ধনির্মীলিত নয়নে নিজের স্বপ্নের ঘোরে পথ চলে—সে মধুময় স্বপ্নের কথা পীয়ারকেও বলবে না। দিবসের সঙ্গে সঙ্গে তার করযুগল ক্রমশ শ্বেতবর্ণ ধারণ করছে—এখন সে চলে অতি লঘু পদক্ষেপে—যেন অশ্রুতপূর্ণ সঙ্গীতের ছন্দে নৃত্য করতে করতে। গৃহস্থালীর কার্যের সঙ্গে সন্তোষে শুন শুন করে গান গায়, যেন তার মবে আনন্দের বান ডেকেছে—তার একটা নির্গমনের পথ চাইত।

বসন্তের এক শনিবারে লুসি বাড়ী ফিরে সবে রাত্রির খাবারের ব্যবস্থা করেছে, এমন সময় খুব সেজে গুজে পীয়ার এসে উপস্থিত—হাতে একটা পার্শেল।

—“কি লুসি ! কি করছ—আজকে একটা অদ্ভুত ভোজ হবে।”

—“ব্যাপার কি ?”

“ব্যাপার, আমি এনট্রান্স পরীক্ষা পাশ করেছি—এবার টেকনিক্যাল কলেজে ঢুকব—আসছে শরতে।”

—“সত্যি”—সে হাত মুছে ভায়ের হাত চেপে ধরলে।

—“এই নাও ছসেজ—‘এনকোভিস’ আর এই এক বোতল ব্র্যান্ডি—আমার জীবনে এই প্রথম নিজেকে কেনা ব্র্যান্ডি। ক্রসও শীঘ্র এসে পড়বে। এই যে পনীর—আজ একটা বড় রকম উৎসব করতে হবে।”

ক্রস এল—তারপর চলল উৎসবের সমারোহ। তারা দু’বন্ধু মিলে মদ খেলে, ধূমপান করলে—বাক্যের স্রোত বহিয়ে দিলে আর লুইস তার বেহালা নিয়ে একটা জাতীয় সঙ্গীতের সৃষ্টি করল। তার দিকে চেয়ে চেয়ে ক্রসের আর আশ মেটে না! তার মুখে শুধু এক কথা “আরো গান আরো”।

দুই বন্ধুতে তারপর গৃহ ছেড়ে রাস্তায় বেরিয়ে পড়ল। ক্রস পীয়ারের হাত ধরে দূরে ঐ নদীর ওপরে ক্ষীণ শশী যেখানে উড়ে উঠেছে—তার দিকে অঙ্গুলী নির্দেশ করে প্রতিজ্ঞা করল—তাকে সে কখনই ভুলে কখনই না—কখনই না। তা ছাড়া সে এখন সোশ্যালিষ্ট—শ্রেণী বিভাজনের বিরুদ্ধে রিভোলিউশান আনবে। আর লুইস—তার মত পুথিবীতে নেই। পীয়ার শীঘ্রই জানতে পারবে ক্রসের কাহিনী—তারা পরস্পরের নিকট যে প্রেমের

১০

হঠাৎ এক সময় পীয়ার ক্রসকে ধাক্কা মেরে অন্তর্ভেদিদৃষ্টি মেলে তার দিকে চেয়ে থাকে - “যা, এখন বাড়ী যা’—যুমিরে নে -’ সে বলে।

“ছে, তুই কি মনে করিস্—বাড়ীর লোকদের উপেক্ষা করবার—সারা দুনিয়াকে উপেক্ষা করবার ক্ষমতা আমার নেই।”

—“গুড নাইট”—পীয়ার চলে যায়।

পরদিন প্রভাতে বিছনায় শুয়ে লুইস্ হঠাৎ হাসতে আরম্ভ করে দিলে

“কি হচ্ছে”—বিক্রপের সুরে পীয়ারকে ডিজ্ঞাসা করে।

“দাড়ি কামাচ্ছি”—ক্ষুর চালাতে চালাতে পীয়ার উত্তর দেয়।

“দাড়ি কামাচ্ছ—কি সাজ্বাতিক কথা, তুমি কি গালের চামড়া ক্ষুর দিয়ে চেঁছে ফেলতে চাও? মুখে তো দাড়ির ‘দ’ও নেই—”

—“চুপ কর বলছি—জানিস্ আজকে আমার কি করতে হবে”—

“কি করতে হবে? নিশ্চয়ই কোন বিধবা বুড়ীকে বিয়ে করতে যাচ্ছ না”—

“না রে না—আমি সেই শিক্ষকের কাছে যাচ্ছি—ব্যাঙ্ক বুক আনতে—”

এই কথা শুনে লুইস উঠে বসল—“তাই বল”—

নিশ্চয়ই—এর জন্মই সে আজ বৎসরাধিক কাল সাধনা করে এসেছে, আজ তা সম্পন্ন করতেই হবে। আজ সে দেখাবে, সে দুর্বল শিশু—না, মানুষের মত মানুষ। সে সেভ্ করছে এই প্রথম—খুবই সত্য। আজ-ক-র দিন তার জীবনে এক স্মরণীয় ঘটনা।

কামান’ শেষ হলে, ভাল করে সেজেগুজে পীয়ার বেরিয়ে গেল।

লুইস্ সারা সকাল তার প্রতীক্ষায় বসে রইল। ^{কিন্তু} ^{সি}—তার ^{কি} ^{পায়ের} ^{শব্দ} ^{শোনা} ^{যাচ্ছে!}

—“ছ্যা”,— বলে পীয়ার ঘরের মধ্যে এসে উপস্থিত হ'ল।

“কি হ'ল, পেয়েছ”—লুইস জিজ্ঞাসা করে।

সে এক পশলা হেসে নিলে, তারপর রুমাল দিয়ে কপালের ঘাম মুছে পকেট থেকে সবুজ মলাট দেওয়া একখানি বই বের করল। “এই বই—মাসে তিন ক্রাউন করে তিন বছর পাওয়া যাবে। বই, ফি, কাপড় জামা কিনতে বেগ পেতে হবে—যাক সে মানিয়ে নেওয়া যাবে। লোকে যাই বলুক, বাবা কাজের লোক ছিলেন—”

—“কিন্তু কি করে আনলে—স্কুলমাষ্টার কি বললে—”

প্রথমেই জিজ্ঞাসা করল—“তুমি কি মনে কর—তুমি টেকনিক্যাল কলেজে ঢুকতে পারবে?”

বললাম, “আমি পাশ করেছি—”

“সত্যি”। এই বলেই নাকের ওপর থেকে চশমা খুলে ফেললে—
“মাও - যাও, ও সব বাজে ভোগা দেওয়ার জায়গা এ নয়।”

আমি তখন সার্টিফিকেট দেখালাম। এবার তার গলার সুর নরম হয়ে এল—“তাই নাকি। এই রকম আরও কত কথা। দেখ, লুসি গ্লিম নামে আর একটা ছেলে এই সীজনে কলেজে প্রবেশ করবে—”

—“বোধ হয় তোমার সেই বৈমাত্র ভাই—”

কিন্তু সেই বৃদ্ধ ড্রেসিং গাউন বললে—“না এ কখনই হতে পারে না—”

আমি বললাম,—“আমার জন্মও পৃথিবীতে স্থান আছে, আমার এখন সেই ব্যাক বই দরকার।”

“...র ওপর তোমার লিগ্যাল রাইট আছে”—সে ভীষণ চটে

বললাম—“তা হলে একজন লুইয়ারের সঙ্গে কন্সাল্ট করব,

এতে আমার অধিকার আছে কি না। এবার সে রেগে হাত পা ছুড়তে লাগল। যাক্, ক্রমশ তার রাগ পড়ে এল।”

তারপর সে বললে—“তোমার নাম ট্রোয়েন—পীয়ার ট্রোয়েন। হো-হো—পীয়ার ট্রোয়েন।”

“তার কি এ নাম পছন্দ নয়। ট্রালা লা-লা—যাক্, চল বাহিরে গিয়ে একটু হাওয়া বাতাস লাগান যাক্।

পীয়ার তখন অথবা পরেও ক্লস ব্রক সম্বন্ধে কিছু বলেনি।

আর ক্লস গরমের ছুটিতে বাড়ী যাচ্ছে। এই ভাবে গ্রীষ্মের মধুর তাপ ভরা দিনগুলি কেটে যেতে লাগল—সারা সন্ধ্যা রোদে পুড়ে ছাঁরখার হয়ে গেল আর নর্দম। আস্তাবল থেকে এমন দুর্গন্ধ আসতে লাগল সে সময় তাদের দম আটকে আসত যেন। একদিন পীয়ার লুইসকে বলল—“দেখ, বেশী ভাড়া দিয়ে একটা ভাল বাড়ী দেখতে হবে।” লুইসেরও এতে সম্মতি আছে। শরতে—ষতদিন তার কলেজে জয়েন করবার সময় না আসছে ততদিন পীয়ার সেই ওয়ার্কশপে কাজ করবে। একটা দিনও ছুটিতে কাটাবার উপায় নেই।

একদিন সকালবেলা সে কতকগুলো কুলী নিয়ে রুশিয়ান গ্রেন্ বোটের ইঞ্জিন সারাতে যাবার উপক্রম করেছে, এমন সময় লুইস এসে বলল—“দেখ ত দাদা,—গলার এখানে লাগছে কেন।” পীয়ার চামচ নিয়ে তার জিভ চেপে ধরে দেখতে চেষ্টা করলে, কিন্তু কিছুই দেখতে পেলো না। “বরং একজন ডাক্তারের কাছে গলারটা দেখিয়ে
-আয়।”

লুইস তত গা' করলে না, বললে —“ভারী ত অত মাথা ঘামাবার দরকার নেই।”

পীয়ারকেও কাজের চাপের জন্ম বাইরে থাকতে

বাড়ীতে ফেরবার সময় তার লুইসের কথা মনে হ'ল—তার গলার অস্থির কথা—তৎক্ষণাৎ সে ছুটে চলল। বাড়ীতে এসে দেখলে, জ্বমাষ্টার একটা চাকায় গ্রীজ মাখাচ্ছে আর তার স্ত্রী একটা জানালা থেকে গলা বের করে তার সঙ্গে ঝগড়া করছে।

“তোমার বোন”—পীয়ার আসতেই সেই খাঁদা মোটা নাকওয়াল মুখ বললে—“হস্পিটালে গেছে, ডিপথেরিয়া হস্পিটালে। সপ্তাহখানেক আগে একজন ডাক্তার এসে নিয়ে গেছে। তারপর থেকে রোজই এখানে খাঁজ করছে—কে—সে, কোথায় বাড়ী। আমরা ত কিছুই জানি না। তোমার কথাও জিজ্ঞেস করলে—কিন্তু তুমি কোথায় গছ—তাও জানি না। আমার মনে হয়, মেয়েটার অবস্থা খুব খারাপ।”

পীয়ার উর্কখাসে ছুটিল তখন গ্রীষ্মকাল। বাতাস গরম ও ভারী। তবুও সে ছুটে চলল—সারা সীষ্টীট দিয়ে—জেলদের বাড়ী পেরিয়ে আরও কিছুদূর গেছে, এমন সময় দেখলে—পথে একটা গরুরগাড়ী আসছে—সামান্য গাড়ী তার ওপর একটা ‘কফিন’। গাড়ীতে একজন বসে’ আর পেছনে টুপি হাতে আর একটি লোক আসছে। পীয়ার আরও জোরে ছুটল—ওই যে দূরে দেখা যায় সেই হলদে বাড়ী। ডিপথেরিয়া রোগীদের ওপর কি নিশ্চয়ম অত্যাচার করা হয়, সে সব কথা তার মনে হল—কি করে’ বাতাস গমনাগমনের জন্ত গলা কেটে শ্বাসনলী তৈরী করা হয়—অথবা উত্তপ্ত লৌহশলাকা দিয়ে খানিকটা অংশ পুড়িয়ে দেওয়া হয়—সে সব কথা। উঃ—যখন সে এসে গ্রেটের সামনে দাঁড়িয়ে কলিংবেল বাজাল, তখন তার সারা গা’ দিয়ে ঘামের বন্যা ছুটে চলেছে—ক্রান্তিতে ভেঙ্গে পড়ছে!

ভিতরে পদশব্দ শোনা গেল চাবি ঘোরানর শব্দ—তারপর লাল

দাড়িওয়াল। একটি মাথা বেরিয়ে এল—তার চোখে কঠিন দৃষ্টি, ক্রব
ওপর চ'টো তিনটে তিল—

—“কাকে চাই?”

“ফ্রোকেন হাগেন—লুইস হাগেন—সে কেমন আছে—”

“লু—লুইস হাগেন? লুইস হাগেন নামে একটি বালিকার কথা
জিজ্ঞাসা করছ?”

—“হ্যাঁ—সে আমার বোন—আমি তাকে দেখতে চাই। কেমন
আছে সে?”

—“আচ্ছা একটু দাড়াও। এক সপ্তাহ আগে যাকে এখানে আনা
হ'য়েছিল,—সেই বালিকার কথা কি জিজ্ঞাসা করছ?”

—“হ্যাঁ—হ্যাঁ, আমায় চুকতে দিন!”

—“মেয়েটি কে—কোথায় থাকে, তার কে আত্মীয় আছে, এসব
খবর জানতে আমাদের কি অসুবিধায় না পড়তে হয়েছে। অবশ্য এরকম
ওয়েদার তাকে বাচান কখনই সম্ভবপর নয়। কেন, যখন আসছিলে,
তখন একটা কফিন গরুর গাড়ী করে নিয়ে যেতে দেখনি?”—

—“কি—বল—ছেন?”

“অবশ্য আরও আগে তোমার আসা উচিত ছিল। পীয়ারকে ডেকে
দেবার জন্তু সে বাব বার বলেছে। লেভেজারে সে একখানা চিঠিও
লিখেছিল। তুমিই নিশ্চয় পীয়ার। শেষে তুমি এলে, কিন্তু আজ চার
পাঁচ দিন হল সে মারা গেছে। সেন্ট ম্যারি চার্চইয়ার্ড তাকে কবর
দেওয়ার জন্তু নিয়ে যাওয়া হয়েছে”।

পীয়ার ফিরে শহরের দিকে তাকাল—রোজক্লিষ্ট ধূম বিমলিয়া।
আবার শহরের দিকে সে হাঁটতে শুরু করে দিল। কিন্তু প্রতি পদক্ষেপে
তার গতি শক্তি বাড়তে লাগল—শেষে সে টুপি হাতে নিয়ে ছুটতে

স্বপ্ন করে দিল—হাঁফাতে হাঁফাতে—কায়র চোখ ঝাপসা হয়ে আসছে। আমি কি মদ খেয়েছি?—এই চিন্তা তার মস্তিষ্কের মধ্যে চরকির মত ঘুরতে লাগল—কেন সে জাগতে পারছে না? কি এ? কি? তবুও সে দৌড়াতে লাগল—কই গাড়ী ত দেখা যায় না—জেলেনের এই আগুনা খালি অলিগলিতে ভরা। আবার সী ষ্ট্রীটে এসে পড়ল—ঐ ত দূরে দেখা যাচ্ছে—সেই গরুর গাড়ী মন্থর গতিতে চলেছে! ঠিক সেই সময় গাড়ীটা ডাইনে বাঁক ফিরে অদৃশ্য হয়ে গেল—পীয়ার সেই বাঁকের মুখে মথন উপস্থিত হল। তখন গাড়ীখানিকে দেখা গেল না! তবুও সে উদভ্রান্তের মত ছুটেতে লাগল! ছেলেমেয়েরা লাল বেলুন ওড়াচ্ছে—বাস্কেট হাতে নারী, ছড়ি হাতে কত পুরুষ চলেছে! কিন্তু পীয়ার সে ভীড় ঠেলে গন্তব্য পথের দিকে ছুটে চলল—সামনে যারা পড়ল, তাদের ধাক্কা দিতে দিতে। কিং ষ্ট্রীটে এসে আবার গাড়ীখানিকে দেখতে পেলো এবার আরও কাছে। গাড়ীর পেছনে পেছনে যে লোকটি চলেছে, তার মাথায় লাল কোকড়ান চুল—খোঁড়াতে খোঁড়াতে সে চলেছে। যে মৃতদেহের কোন মোণার পাওয়া যায় না—এরাই তার কাজ করে জীবিকা নির্বাহ করে। গাড়ীখানিও চার্চইয়ার্ডে ঢুকল, পীয়ারও এসে পৌঁছাল। কিন্তু সে আর চলতে পারছে না—পায়ের ওপর ভর দিয়ে দাঁড়াবার শক্তি চলে গেছে—প্রতি পদক্ষেপে খালি হেঁচট খেতে লাগল।

গাড়ীর গতিবেগ থেমে গেল—পীয়ার একটা গাছে হেলান দিয়ে লাড়াল। আর একজন তৃতীয় ব্যক্তি এল—বোধ হয় কবর খননকারী। সে তাদের বর্ধপোকথন গুনতে লাগল।

গাডোয়ান ঘড়ি বের করে বলল—“সময় ত হয়ে গেছে”।

“ক্লার্ক বললে, পাদ্রী এখনই আসবে”—কবর খননকারী বললে।

সেই পাদ্রী দৃষ্টিপথে উপস্থিত হলেন—গায়ে কালো কোট -

ফিউনারেল ডে'তে এই পোষাকই তিনি পরে থাকেন পীয়ার একট
বেকের উপর বসে পড়ল। কফিনটাকে গাড়ী হতে তোলা হল—কবর
স্থানে নিয়ে গিয়ে কবরও দেওয়া হল—সব ক্রিয়াকলাপ সে দেখলে।

চোখে চশমা অঁটা এক ব্যক্তি হীম বুক থেকে মল্লোচ্চারণ করল—
পাদ্রী খোস্তা উঠালেন। খোস্তার প্রথম মাটি লুইসের কফিনে পড়া
শব্দ পীয়ারের নৃকে যেন হাতুড়ীর ঘা মারলে—সে মাটিতে পড়ে গেল।

যখন সে জাগল তখন সে স্থান জনশূণ্য। ঘণ্টাধ্বনি বাতাসে ভেসে
আসছে, চার্চইয়ার্ডের আর এক প্রদেশে লোক সমাগম হয়েছে, দেখ
গেল। পীয়ার একই জায়গাতেই এক ভাবে বসে রইল—শান্ত ধীর
নিশ্চল ভাবে।

সন্ধ্যার সময় সেই কবর খননকারী আবার গেট বন্ধ করতে ফিরে
গেল। যুবকটিকে বাড়ি ধরে বের করে দিতে হবে নাকি—তা'হলে যদি
বা তার জ্ঞান হয়!

— “গেট বন্ধ করবার সময় হয়েছে—তোমাকে এবার যেতে হবে”
—সে বলল।

পীয়ার উঠে দাঁড়াল, হাঁটতে চেষ্টা করল—ক্রমশ গোড়াতে খোঁড়াতে
গেটের মধ্য দিয়ে রাস্তায় এসে পড়ল। তারপর এক সময় দেখলে,
আস্তাবলের ওপরের একটি ঘরের সিঁড়ি বেয়ে সে উঠছে। এই ত তারই
রুম—বিছানার ওপর সে নিজেকে ছুঁড়ে দিয়ে মড়ার মত পড়ে
বসিল।

দিনের বেলা গেছে গুমট গরম—এখন বৃষ্টিধারায় তাই'গলে পড়ছে
ছাদের ওপর ধারাপতনের শব্দ শোনা যাচ্ছে। হঠাৎ পীয়ার লাফিয়ে
উঠল। তাই ত লুইস নিশ্চয় এই বৃষ্টির মধ্যে বেরিয়ে পড়েছে—তার ও
ছাতার দরকার; মূর্ত্তের মধ্যে সে খুঁজতে উঠে পড়ল—কি মনে করে

আবার বসে পড়ল—আস্তে আস্তে বিছানার ওপর ক্লান্ত দেহ এলিয়ে

সে হাঁটু গুটিয়ে মাথাটা হাতের মধ্যে ঢুকিয়ে শুয়ে পড়ল। তাব মগজের মধ্যে নানা চিন্তার স্রোত বয়ে চলেছে—ঝড়, মৃত্যু—একজন উদাসীন শাসকের কর্তৃত্বাধীনে পৃথিবীর বিরাট মানবতার ভাগ্যের কথা।

জীবন এই প্রথম বিধাতার বিরুদ্ধে শির উত্তোলন করে বলল—“এর মধ্যে বিবেচনা বুদ্ধি কিছু নেই। এ অসম্ভব—এ আমি মেনে নিতে পারব না।”

তারপর রাত্রিতে রোজকার মত সাক্ষ্য প্রার্থনা বলবার জন্ম আপনা হতেই হাততুটি একত্রবদ্ধ হয়ে এল—শিশু বয়স হ’তে সে এরকম করে এসেছে—সে হঠাৎ সশব্দে হেসে উঠল, দৃঢ়মুষ্টি বদ্ধ করে বললে—‘না এ কখন হ’তে পারে না—কখন না।’

আবার তার মনে হ’ল,—পাঠশালার গুরুমশায়ের মত আমাদের এই ভগবান। (তিনি তাদের পক্ষ নেন, জীবনে যারা সুপ্রতিষ্ঠিত। হুঁ) ঠিকই ত তাদের পিতামাতা আছে, ভাই বোন গৃহ অর্থ আছে—তাদের জন্মই আমার ভাবনা—তাদের আমি বিপদে রক্ষা করি।) আর এখানে যে একটি নিঃসহায় বালক পৃথিবীতে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করবার জন্ম আশ্রয় চেষ্টা করছে—তার আমি একটি মাত্র অবলম্বন যা তার আছে—ত্যাগ কেড়ে নেব। এ বালক আমার কেহই নয়। এর শাস্তি হওয়া উচিত, কেননা সে গরীব—পৃথিবীতে সে পড়ে থাকুক—কেননা তাকে দেখবার কেউ নেই। এ বালক আমার কেউ নয়—এর জন্ম একটুও ভাবিনা।) ও-হো, সে মুষ্টি দৃঢ়বদ্ধ করে দেওয়ালে আঘাত করতে লাগল।

তার ক্ষুদ্র পৃথিবী আজ চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে গেছে। হয় ঈশ্বর পৃথিবীতে নেই—আর যদি থেকে থাকেন, তিনি উদাসীন, নিষ্করণ, পাষণ্ড ছোটোই খারাপ। স্বর্গের নন্দনকানন আজ মিলিয়ে গেছে মোবে—ওপরে শুধু সীমাহীন শূন্যতার রাজ্য। বোকার মত হাতছোড় কবে ভগবানের কাছে দয়া ভিক্ষা করতে যেও না। পৃথিবীতে নিজের পানে দাঁড়াও—মাথা তুলে ধর—ঈশ্বর, ভাগ্যা—সকলকে উপেক্ষা কর, যেমন তুমি করেছ ছোটবেলায় তোমার গুরুমশায়কে। তোমার মায়েব জীবনে তুমি অবাঞ্ছিত—তিনি আজ আর কোথাও নেই। তিনি কবে মরে গেছেন—মবে পঞ্চভূতে মিশে গেছেন। তার চেয়েও বড় কথা তোমার বা তাঁর অথবা কারুর জন্ম এ পৃথিবীতে স্থান নেই

তখনও সে সেইভাবে গুরে রইল। যুমেব ক্রোড়ে আশ্রয় পেলে ভাল হ'ত। কিন্তু ক্রমশঃ সে যেন আধ-আলো অন্ধকারময় দিগন্ত প্রসারী কুহেলীর মধ্যে ডুবছে—কে যেন তাকে দিচ্ছে দোল—কালো সোনালী তরঙ্গের সাথে সাথে। এ কি, সে ও কিসের শব্দ শুনতে পাচ্ছে! ও কিসের শব্দ! ভায়োলিনের।—সেই পরিচিত সুর লুইস্—তুই—তুই বাজাচ্ছিস? সে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে, ঐ তবল অন্ধকারে। উঃ কি রোগা হয়ে গেছে। কিন্তু তবুও সে বাজাচ্ছে। এখন সে এই তবল জ্যোতির অর্থ বুঝতে পারলে।

প্রতিদিনের পৃথিবীর বাহিরে এ আর এক নতন পৃথিবী—তার সম্পূর্ণ নিজস্ব। “পীয়ার আমাকে এখানে থাকতে দাও” লুইস্ যেন বলছে। পীয়ারের মধ্যেও কে যেন উত্তর দেয়—“নিশ্চয় লুইস্, তুমি এখানে থাকবে। যদিও ঈশ্বর নেই, অবিনশ্বরতার কথা যদিও ভূয়া—তবুও তুমি এখানে থাকবে।” তখন পুঠসের মুখে হাসি ফুটে উঠল। তখনও সে বেহালা বাজাচ্ছে। সে যেন স্বর্গ ও স্বর্গের দেবতাকে

উপেক্ষা করে এক নূতন গীর্জা গড়ে তুলছে লুসির জন্য আর অহস্তে
 সে সেই গীর্জার ঘণ্টায় তুলছে শান্ত সুরের বন্ধার। তার ভাগে
 একি ঘটছে? তাকে সাধুনা দেবার কেউ নেই; তবুও শোকের তীব্রতা
 কমে আসতে থাকে—শুয়ে শুয়ে সে' যারা বেঁচে আছে তাদের সবাইকে
 আকাশ আলোক নক্ষত্র মণ্ডলীকে তার অন্তরতম সঙ্গীর নিকট হ'তে
 কিছু অর্ঘ্য স্বরূপ অর্পণ করতে থাকে। শেষে এক সময় মনে হতে
 লাগল—এ ত্রিভুবন তার সঙ্গে যেন বন্দনা গানের প্রচণ্ড ঢেউ-এ
 উৎসিষ্ট হচ্ছে। চোখের পাতা বন্ধ করে সেখানে সে শুয়ে রইল হাত
 দুটি ছড়িয়ে। চোখ খুলতেও ভয় করে। পাছে সব মিলিয়ে যায়
 —শুধু মনে হয় সে যেন একটা স্বপ্ন দেখছে—কি সুন্দর!

টেকনিক্যাল কলেজের ছুটির ঘণ্টা বাজতে আরম্ভ করেছে -- একদল ছাত্র 'গেট' ভেদ করে বেরিয়ে, ছোট ছোট দলে ভাগ হয়ে -- তারপর শহরে যে ঘর বাড়ীর দিকে রওনা হল ।

যুবকদের জনতা -- সতের হতে তিরিশ বছর পর্য্যন্ত সকল বয়সেরই ছেলে এর মধ্যে আছে । অন্য কোন উপায় না দেখে, পিতামাতা তাদের এখানে পাঠিয়েছে -- কারণ, আর কিছু না হোক ইঞ্জিনিয়ার হতে পারবে ! চিরদিনের তরুণ মন, বইএর চেয়ে বিলাসের দিকে তাদের লক্ষ্য বেশী । কোন রকমে অল্প পরিশ্রমে পরীক্ষাটা পাশ করতে পারলেই হল -- এই রকম তাদের ভাব । কতকগুলো সৈনিক শ্রেণীর যুবক আছে -- তারা হয়ত শেষে সেনা দলে ভর্তি হবে, কিন্তু ইঞ্জিনিয়ার হতে তা বাধা নেই । আবার কতকগুলো কৃষকশ্রেণীর বালক আছে -- তারা কোনমতে বই মুখস্থ করে এক চাম্বে ইন্টারমিডিয়েট পাশ করেছে । এখন ঘরে-তৈরী ধূসর পোষাকের ওপর কলেজী ক্যাপ চাপিয়ে কলেজে -- যথাসময়ে পাশ করে বড়লোক হবার স্বপ্ন দেখে । আবার কতকগুলো তরুণ উৎসাহীর দল আছে -- তারা শেষে হয়ত অভিনেতা হবে -- আবার একদল ব্যর্থমনোরথ অ্যাক্টার-সমালোচকদের কলমের খোঁচার হাত থেকে রক্ষা পেয়ে ইঞ্জিনিয়ার হবার জন্য কোন মতে বেঁচে আছে ।

যখন এই সব তরুণের দল হাসিখুশী দায়িত্বহীন ভাবে পথ চলে যুদ্ধাদর এদের দেখে দুঃখ করবার আছে । কারণ, প্রত্যেকের ভাগ্য

কি কি লেখা আছে তা অতি সহজেই বলা যায়। কলেজের জীবন শেষ হবে আর ভ্রাম্যমান পাখীর মত এরা সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়বে। কেউ বা আফ্রিকায় দারুণ গ্রীষ্মে সন্দীপন হয়ে মারা যাবে - কেউ বা চীনে দস্যুদের হাতে প্রাণ হারাবে - কেউ কেউ বা আত্মীয় বন্ধুবান্ধব হতে বহু দূরে পেরুতে কোন কলিয়ারীর কর্তা হবে। অথবা সাউথ আফ্রিকায় কোন ফ্যাক্টরীর ম্যানেজার হবে। সমস্ত পৃথিবীই এদের আবাস ভূমি। কেবলমাত্র গুটি কতক ছোকরা - প্রায়ই কলেজের ভাল ছেলেরা নয়—দেশের কোন ছোট রেলওয়েতে চাকরী পাবে : অফিসে বসে পাঁচ বছর অন্তর বার পাউণ্ড করে মাহিনা বৃদ্ধি লক্ষ্য করবে।

“তোমার ভাইটি একটি মূর্তিমান শয়তান”—একদিন কলেজের ছুটির পথ বগলে বই নিয়ে পথ চলতে চলতে ক্লস বক পীষারকে বলল।

“দেখ, তোমাকে আমি সাবধান করে দিচ্ছি—ভবিষ্যতে ওকে আর কখন আমার ভাই বলবে না। এবং আমার বাবার সম্বন্ধেও কাউকে কিছু বলবে না—কেউ যদি আমার কথা জিজ্ঞাসা করে ত বল’—ক্লসকের ছেলে। নাম হলম—বাবার গোলাবাড়ীর নামানুসারে ঐ নামে ডাকা হয়। মনে থাকবে ত?”

“বেশ তাই হবে—অত উত্তেজিত হচ্ছিস কেন?”

“তুমি কি মনে কর, ঐ ফুলবাবুর সঙ্গে বন্ধুত্ব করতে না পেরে আমি বেঁচে মরে আছি?”

“—না না আমি কি তাই বলছি”—ক্লস বাড়টা একটু সঙ্কুচিত করে আবার শিষ দিতে দিতে পথ চলল।

“অথবা তাদের সুখী পরিবারে কোন গণ্ডগোল পাকান আমার ইচ্ছে।

ওর মন থেকে এ চিন্তা আমি একদিন মুছে দেব—কিন্তু সে অন্য ভাবে।”

“হয়েছে হয়েছে যেতে দাও। তুমি নিশ্চয়ই লোকে তার সম্বন্ধে যা বলে সত্য করতে পার।” রুস তার ইতিহাস বলতে শুরু করে দেয়। “ফারডিনাণ্ড হলম তার বাড়ীর লোকদের হতাশ করে দিয়েছে। সামরিক বিদ্যালয়ে লেখাপড়া সে অনেকদিন ছেড়ে দিয়েছে—তার মতে সৈন্যরা এবং তাদের আদব কায়দা অত্যন্ত হাস্যকর। তারপর সে ‘থিয়োলজি’র চর্চা শুরু করে—কিন্তু আরও খারাপ লাগে! শেষে ইঞ্জিনিয়ারিং হাফে একমাত্র ভদ্রলোকের পাঠ্য জিনিষ—তাই এই টেকনিক্যাল কলেজে নোঙ্গর ফেলেছে। কি রকম মনে হয়?”—রুস জিজ্ঞাসা করে।

“এতে আমি আশ্চর্য হবার কিছু দেখি না।”

“দাঁড়াও দাঁড়াও, সবে গল্পের শুরু হয়েছে। এক সপ্তাহ আগে সে একজন পুলিশকে ঠেঙ্গিয়েছে—কারণ, সে নাকি একটি ছেলেকে অপমান বা ঐরকম কিছু করেছিল। তারপর গ্রেপ্তার, পুলিশ-কোর্ট, জরিম না—ঐরকম নানা হাজারি—সে এক কেলেকারী কাণ্ড! গত শীতে তাদের বাড়ীর এক ঝির মেয়ের সঙ্গেই প্রেম জমিয়ে দিল! তার মা, তার অবর্তমানে মেয়েটিকে স্থানান্তরে পাঠিয়ে দেয়। এতে সে মা’র সঙ্গে ঝগড়া করে বাড়ী যাওয়া একেবারে বন্ধ করেছে। এখন আর কোন কাজ নেই—শুধু ধনীলোকদের ও তাদের কাজের বিরুদ্ধে বড় বড় লম্বাচণ্ডা লেবুচার করে। এবার কি রকম মনে হয়?”

—“আচ্ছা এর সঙ্গে আমার কি সম্পর্ক আছে?”

—“আমার ত মনে হয়, এসব গল্পের মধ্যে সত্য খুব কম আছে”—

রুস বলল,—“বাহোক আমার তরফ থেকে তাকে যতদূর সাধ্য জানতে

চেষ্টা করব। শুনেছি - ওর নাকি অনেক পড়াশুনা আছে - মাথাও নাকি খুব পরিষ্কার।

কলেজে প্রথম দিন ঢুকেই পীয়ার জেনেছে - কে ফার্ডিনাণ্ড হলম এবং বেশ নিবিড়ভাবে তাকে লক্ষ্য করেছে। বেশ লম্বা চওড়া চেহারা, মাথায় সোনালী চুল, মুখে তিল। কচ্ছপের খোলে তৈরী ফ্রেমের কালো চশমা চোখে। সে "কলেজক্যাপ" মাথায় দেয় না, পরে - নিজের ধূসর ফেণ্ট শ্রাট। তার বয়স - আনুমানিক চব্বিশ বছর।

* * *

- "দাড়াও" পীয়ার মনে মনে ভাবল - "দাড়াও ছোকরা, - চার্লস হয়ার্ড থেকে যখন আমাকে তাড়িয়ে দিয়েছিল। তখন তুমি সেখানে ছিলে। কিন্তু তাকে কোন ফায়দা হবে না। তুমি আমার চেয়ে আগে সংসার ক্ষেত্রে ঢুকেছ সত্যি, এটা ওটা অনেক কিছু জান। কিন্তু তবু অপেক্ষা কর।"

একদিন সকালে কোয়ার্টেজলে সে দেখতে পেল ফার্ডিনাণ্ড তাঁকে দেখছে। আরও ভাল করে দেখবার জন্য সে চশমা পরলে পীয়ার সেই মুহূর্তে সেখান থেকে সরে গেল।

ফার্ডিনাণ্ড ম্যান্ট্রিক ভাল করে পাশ করেছে বলে - তার চেয়ে আরও উঁচু ক্লাশে স্থান পেয়েছে। তা ছাড়া তার কোস সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। রাস্তা, রেলওয়ে তৈরী করবার কোস : কাজেই কড়িডর বা কোয়ার্টেজলে ছাড়া তার সঙ্গে দেখা হবার আর অন্য কোন উপায় নেই।

একদিন বিকেলে - ঠিক ক্রীষ্টমাসের পরে - পীয়ার বড় ডিজাইনের হলে কাজ করছিল। এমন সময় তার পেছনে পায়ের শব্দ হল, মুখ ফিরিয়েই দেখলে - ক্লস ব্রক আর ফার্ডিনাণ্ড দাঁড়িয়ে আছে।

- "আমি তোমার সঙ্গে বন্ধুত্ব করতে চাই" - হলম বলল, ক্লস

পরিচয় করিয়ে দিলে। হুম হ্যাগুশেক করবার জন্য শাদা হাত বাড়িয়ে দিল—প্রথম আঙ্গুলে একটা আংটি। “আমাদের নামের সঙ্গে মিল আছে দেখছি।”

রুক এইমাত্র বললে,—হুম নামক কোনগ্রামের নাম অনুসারে তোমার নাম-করণ হয়েছে।

—“হ্যাঁ, তোমার বাবা একজন সাধারণ কৃষক ছিলেন”—পীয়ার উত্তর দেয়—সঙ্গে সঙ্গে নিজের ওপর বিরক্তি আসে নিজেকে এতখানি ভয় প্রতিপন্ন করায়।

“বেশ বেশ সবই ভাল”—হাসতে হাসতে ফাউনাগু জবাব দেয়। “কিছু মনে করোনা—ফাউটার্মে কি এই সব ছবি আঁকাচ্ছে। সামরিক বিদ্যালয়ে একাজ অনেক করেছি, একাজ সম্বন্ধে একটু অভিজ্ঞতা আছে।”

পীয়ার মনে মনে ভাবলে—“তুমি আমাকে উপদেশ দিতে এসেছ, না?” কিন্তু মুখে বললে—“না, ড্রিংটা ব্ল্যাকবোর্ডে ছিল—সিনিয়র স্টুডেন্টরা রেখে গেছে—দেখছি কিছু বোঝা যায় কি না—”

ফাউনাগু আড়চোখে তাকে একবার দেখে নিলে—তারপর মাথা নেড়ে বললে—“আবার দেখা হবে—গুড বাই।”

তার জুতার মসমস শব্দ শোনা গেল। তার সহজ সাবলীল ভাবভঙ্গী, তার গলার স্বর—সবই যেন পীয়ারকে ছোট করে দেখাল। তাতে কি—কিছুদিন অপেক্ষা কর—তারপর দেখা যাবে।

দিন চলে যায়—তারপর সপ্তাহও। ফাউনাগুকে পরাভূত করবার পরিবর্তে পীয়ারের আর একজন জুটে গেল।

তার ঘরে লুইসের জামা কাপড় এখনও অস্পৃশ্য রয়েছে—বিছানার তলায় সেই জুতা জোড়া। লুইস আরার একদিন আসবে, দরজা খুলে ঘরে ঢুকবে। “এখন যে কোথায়—কেন সে মরে গেল? তার সঙ্গে


কি আবার দেখা হবে—” প্রতিদিন রাতে শোবার সময় এই জটিল সমস্যাটাই তাকে এতদিন ভাবিয়ে তুলেছে।

হস্পিটালে রোগীদের পাশে দাঁড়িয়ে সে ভায়োলিন বাজাচ্ছে—এ দৃশ্য এখনও তার চোখের সম্মুখে ভাসে। কিন্তু এখন মনে হয়—সে শাদা পোষাক পরে আছে—সে যেন স্বপন দেশের পরী! সে যেন তার গানও শুনতে পাচ্ছে—সেই সঙ্গীত ধারা তার মনে দিচ্ছে মুক্ত দোল। এ যেন তার একটি ক্ষুদ্র জগৎ গড়ে উঠেছে যেখানে রবিবারের বিশ্বাস ও ভক্তির জগৎ সে আশ্রয় নিতে পারে। এমন কি, মাঝে মাঝে দিনের বেলা কাজের মধ্যে বেহালার সুরে তার মনের কান গুঞ্জরিত হয়ে ওঠে—যেন দূর দূরান্তর হতে আসা এক আলোবন্দর তাকে আঘাত করে গানে মুগ্ধ করে তোলে—নিজেব অজ্ঞাতসারে সে হেসে ওঠে।

প্রায়ই গীর্জার অর্গানের সুরের বিরাট তরঙ্গে নিজের অশুভ দেবতাকে মুক্ত করে দেবার আকাঙ্ক্ষা সে অনুভব করে। কিন্তু গীর্জায়—আর কোন দিন সে প্রবেশ করেনি’। উপেক্ষার ভাব নিয়ে সে তার পাশ কাটিয়ে চলে যায়। হ’তে পারে ঈশ্বরেরই অভীপ্সা—সেইসকল তার কাছ থেকে কেড়ে নেওয়া কিন্তু সে সেই অভীপ্সাকে ধন্যবাদ দিতে পারে না—তার কাছে মাথা নত করতেও পারে না। যেন অনাদি ভবিষ্যে একটা কিছু সঙ্গ হলে তার বোঝাপড়া—সেই চিন্তা তার মন অধিকার করে আছে; আর সেই বোঝা পড়ার পর হবে তার মুক্তি—চিরন্তন মুক্তি।

রবিবারে যখন চার্চের ঘণ্টা বেজে ওঠে—পীয়ার তাড়াতাড়ি বই নিয়ে আসে—শান্তির সন্ধানে; অধীত বিদ্যা কি তাকে ভক্তনের আনন্দ দিতে পারে? যখন সে প্রথম কারখানায় কাজ আরম্ভ করে তখন সবই

অদ্ভুত ঠেকত। আর আজ—আজ সে নিজে দৈবীয়ারা সৃষ্টি করবার ক্ষমতা অর্জন করেছে। শুধু পড়া আর পড়া—বই, শিক্ষক—সব থেকেই সে তার জ্ঞান বাড়াবে—চিন্তা-রাতদিন সে কেবল চিন্তা করেই চলেছে। কলেজের পড়াই ষাথষ্ট—কিন্তু পীরারের আরও চাই। তার জ্ঞান প্রশ্নের পব প্রশ্ন অপেক্ষা করে রয়েছে—সমস্যায় পর সমস্যা—নূতন নূতন বাধা—দূরে দূরে অপরিচিতের রাজ্য। কেমিস্ট্রী, ফিজিক্স আর গণিতের রাজ্য। সবে সে প্রবেশ পত্র পেয়েছে—এখনও রাজ্যের পর রাজ্য পড়ে আছে—ছুটে চল, ছুটে চল। সে দিন কি আসবে—যেদিন শেষ সীমানায় পৌঁছবে? ঐ দেখ শিক্ষকেরা—এত ত জ্ঞান অর্জন করেছে, কিন্তু সাধারণের তুলনায় কতটুকু শ্রেষ্ঠতা, কতটুকু শক্তি তারা পেয়েছে? লেখাপড়া মানুষকে কি সে শক্তি দিতে পারে—যার বলে একদিন রাত্রে সে এই একবার তারাগুলিকে অশ্রুনি সঙ্কত করবে আর নক্ষত্রমণ্ডল সঙ্গীতের তরঙ্গে তরঙ্গে নেচে উঠবে? আজ আর ওসব চিন্তা নয়—এগিয়ে চল কিন্তু আবার জ্ঞান মানুষকে কি সেই রবিবারের বন্দনা গানের বিমল আনন্দের স্বাদ দিতে পারে, যা মানুষকে সমস্যা হতে মুক্ত করে এক নামহীন আনন্দের রাজ্যে ভাসিয়ে নিয়ে যায়—যেখানে তাব আত্মা বাড়তে বাড়তে অনন্ত শূন্যকে আবৃত করে ফেলে? এগিয়ে চল—বৃথা সময় নষ্ট না করে—এগিয়ে চল।

বসন্ত এসেছে; নগরের বড় রাস্তার ধারে—বৃক্ষের সারিতে সবে কচিপাতা গজাতে আরম্ভ করেছে,—এমনি একটি দিনে ফার্ডিনাণ্ড হলম আর ক্লস ব্রক নর্থস্ট্রীটে একটা ক্যাফেতে মুখোমুখি বসে। “ঐ যে তোমার বন্ধু যাচ্ছে”—ফার্ডিনাণ্ড বলে। 

রাস্তার অপর পাশে পোর্টঅফিসের ধার দিয়ে পীরার যাচ্ছে।

কাপড় ধুলি-মলিন, জুতা অপরিষ্কার—ধীরে ধীরে সে এগিয়ে চলেছে—
মাথায় কলেজের টুপি। সামনের দিকে একটু ঝাঁক চলেছে— রাস্তার
দু'ঘট্টে সব কিছুর ওপরেই শোনদৃষ্টি রয়েছে।

“আশ্চর্য্য, ওকি ভাবছে, বলতে পার” ক্লস জিজ্ঞাসা করে।

“দেখ, বোধ হয় এরকম গাড়ী ও কখনও দেখে নি’—আরে
ডাইভারকে কেন গাড়ী থামাতে বলছে!”

“ও নিশ্চয়ই এবার চাকার মধ্যে ঢুকবে : ‘বেট’ রাখছি—”হাস্তে
হাস্তে ক্লস জানলা থেকে সরে দাঁড়াল—যাতে না দেখতে পায়।

“দেখ—কি রকম রোগা দেখাচ্ছে”—চশমা খুলতে খুলতে ফার্ডিনাণ্ড
বলে—“বাড়ীর অবস্থা বোধ হয় খুব ভাল নয়।”

ক্লস পূর্ণ দৃষ্টিতে তার দিকে চেয়ে বলল—‘আমার মতে ও টাকার
ভারে ক্লান্ত হয়ে পড়েনি’—

আবার বীয়ার, ধূমপান—গল্প গুজব। হঠাৎ ফার্ডিনাণ্ড মন্তব্য
করলে—“আচ্ছা, তোমার বন্ধুর মা বাপ কি এখনও বেঁচে আছে?—”

ক্লস পীয়ারের পারিবারিক ব্যাপারে ঢুকতে চায় না, বললে—“হয়ত
নেই।”

“আমি প্রশ্নের ওপর প্রশ্ন তুলে তোমায় বিরক্ত করছি, সত্য। কিন্তু
বাস্তবিকই ছেলেটির সম্বন্ধে আমি খুব কৌতূহলী। ওর মুখের মধ্যে
একটা আকর্ষণী-শক্তি আছে, আর ওর চলা—এরকম ভাবে চলতে
আমি যেন কাউকে দেখেছি।—ওনেছি, ও নাকি ইঞ্জিনের মত
খাটে!”

—খাটে! এরকম করলে, শীঘ্রই ওর স্বাস্থ্যের মাথাটি খাবে।

স্বাস্থ্য—ওর আইডিয়া, জ্ঞান দিয়ে সব বুঝতে পারবে. ও একদিন

—হাঃ হাঃ হাঃ—”

“কি ?”

“—এই ভগবানকে বুঝতে শিখবে ?”

ফার্ডিনাণ্ড জানলার মধ্য দিয়ে তাকিয়ে ছিল, বললে—“আশ্চর্য্য।”

“গত সোমবার পাহাড়ে ওর সঙ্গে দেখা—ভূ-তত্ত্বের প্রায়কটিকাল জ্ঞান সংগ্রহ করছে। যদি কোথাও কোন লোকচার তর সে এ্যাষ্ট্রোনমিই হোক অথবা কোন ফরাসী কবির সম্বন্ধেই হোক, ধরে নেওয়া যেতে পারে নিঃসন্দেহ সেখানে সে আছে—নোট নিচ্ছে! এরকম লোকের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় পারবে? যদি কোনখানে একটা নূতন নাম পেয়েছে—বর, এই যেমন ‘এরিষ্টোটল’—অর্থাৎ সে লাইব্রেরীতে যাবে জানতে—কেন সে? তারপর রাত জেগে গ্রীক থেকে অনুবাদ পড়বে। এরকম লোককে নিয়ে কি করা যায়! শুধু একটা বিষয়ে ওর কোন জ্ঞান নেই।”

—“কোন বিষয়?”

—“কেন,—মদ আর মেয়ে—তাছাড়া, সাধারণ হাসিঠাট্টাও ওর ধাতে নয় না। আমার মনে হয়—ও কোন মেয়ের সঙ্গে এপর্য্যন্ত প্রেম করেনি -”

“ওসব ওর বরাতে জুটবে না”—ফার্ডিনাণ্ড যেন একটু দুঃখের সহিত বললে।

তারপর তঁজনে চুপ করে বসে রইল। ক্লস মাঝে মাঝে অগ্ৰমন্থ হয়ে পড়ছিল আর ফার্ডিনাণ্ড থেকে থেকে পীয়ার সম্বন্ধে তঁএকটা কথা জিজ্ঞাসা করছিল। ইতিমধ্যে দ্বিতীয় গ্লাস বিশেষ হয়ে গেছে। ক্লস কথায় কথায় বলতে বাধ্য হয়েছে যে, “পীয়ারের মা যেইরকম হুঁয় উচ্চ ছিল, ঠিক সে রকম হতে পারেনি।”

“আর তার বাবা?”—ফার্ডিনাণ্ড জিজ্ঞাসা করে।

এই অপ্রত্যাশিত প্রশ্নে ক্লস অপ্রতিভ হয়ে পড়ে—“তা - তার সম্বন্ধে কেউ কিছু জানে না”—তোৎলাতে তোৎলাতে সে উত্তর দেয়—“যদি জানতাম, তা হলে তোমাকে বলতাম।—কে তার বাবা—কেউ জানে না। বোধ হয় তিনি আমেরিকায় থাকেন।”

“আমি লক্ষ্য করে দেখেছি—যখনই গুর বাড়ীর সম্বন্ধে কিছু জিজ্ঞাসা করি, তুমি কেমন যেন রহস্যময় হয়ে ওঠ।” ফাডিনাও হাসতে হাসতে বলল। ক্লসেব মনে হয় যেন তার বন্ধুর মুখ একটু ফ্যাকাসে দেখাচ্ছে।

এই ঘটনার কয়েক দিন পরে পীয়ার আস্তাবলের ওপরে তার ঘরে বাসে আছে এমন সময় সিঁড়িতে পদধ্বনি শোনা গেল—দরজা খুলে ফাডিনাও এসে উপস্থিত।

অনিচ্ছাসত্ত্বেও পীয়ার উঠে দাঁড়াল—পেছনের চেয়ারটা চেপে ধরলে—যেন নিজেকে সামলে নেবার জ্ঞ। যদি এই বাবু ছেলেটি এসে থাকে—এর। যাক সেই স্কুলমাষ্টারের নিকট হতে—তার নাম কেড়ে নিতে, তাহলে এই মুহূর্তে ওকে ধাক্কা মেরে নীচে ফেলে দেবে!

—“তুমি কোথায় থাক দেখতে ইচ্ছা হয়েছিল”—ফাডিনাও আরম্ভ করল, টুপিটা রেখে, একখানা চেয়ার টেনে নিয়ে বসল—“তোমাকে দেখেছি—অবাক করে দিয়েছি। মাফ কর ভাই—তোমাকে এই অসময়ে বিরক্ত করেছি বলে। কিন্তু আসল কারণ, তোমার সঙ্গে গুটিকতক কথা আছে।”

—“ও, ভাই বলুন”—পীয়ার বসল যতটা সম্ভব দূরে পারা যায়।
—“আমি লক্ষ্য করে দেখেছি—যে ক’দিন তোমার সঙ্গে আমার দেখা—
—তুমি আমায় ঠিক পছন্দ কর না। কিন্তু এটা আমি
টাইনে।”

“তার মানে”—পীয়ার প্রশ্ন করল—হাস্বে কি না, সে ঠিক করতে পারলে না।

“আমি তোমার সঙ্গে বন্ধুত্ব পাতাতে চাই। কিন্তু তুমি আমার সম্বন্ধে যতটা জান আমি তোমার সম্বন্ধে ততটা জানি না। কি হে—তুমিও এরকম আঙুল দিয়ে টেবিল চাপড়াও নাকি? হা-হা-হা: আমার বাবারও ঐ রকম স্বভাব ছিল।”

পীয়ার নিঃশব্দে তার দিকে চেয়ে রইল—কিন্তু টেবিল বাজান খেমে গেছে।

—“তুমি যেমন ভাবে থাক, তা দেখে আমার হিংসে হয়। কোনদিন যদি তুমি লক্ষপতি হও তখন টাকা বাঁচাবার ভাবনা তোমার ভাবতে হবে না—তুমি আমাদের চেয়ে জীবনে ঢের বেশী অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছ। বই থেকে তুমি যে জ্ঞান আহরণ করছ, তা তোমার অন্তর্ভাবে আধ্যাত্মিক জ্ঞানের সহায়তা করবে। আমরা সব কতকগুলো ছাইভগ্ন মাথার মধ্যে জড় করছি। তুমি নিশ্চয়ই একজন বড় ইঞ্জিনিয়ার হবে।”

—“হ্যাঁ”—পীয়ার বলে—তার মুখের ভাবখানা যেন—এতে তোমার কি এসে যাবে!

‘আমার মনে হয় টেকনিসিয়নকে খ্রীষ্টের সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে—অর্থাৎ প্রমেথিয়াসের বংশধর। মানুষ প্রতিমূহুর্তে প্রকৃতিকে পরাজিত করার সঙ্গে সঙ্গে ঈশ্বরের ক্ষমতাকে ক্ষুণ্ণ করছে। আমরা আগুন, বাষ্প, ইম্পাত নিয়ে স্বর্গের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছি। এমন একদিন আসবে যখন আর আমরা প্রার্থনা দরকার বোধ করব না। এবং এমন একদিন আসবে যখন স্বর্গরাজ্যের অধিবাসীরা^১ যা^২ দৃষ্টতা স্বীকার করবে। তোমার কি মনে হয়? আমার মতে^৩ ...^৪ তা নিশ্চয়ই ইঞ্জিনিয়ারদের পছন্দ করে না’—

“শুন্তে বেশ ভালই লাগে”—পীরার সংক্ষেপে উত্তর দিলে। কিন্তু মনে মনে স্বীকার করতে বাধ্য হ’ল যে, তার মনের সত্যিকার চিন্তা-বারা আর একজন তার কথায় প্রকাশ করে দিয়েছে।

“অবশ্য এখন আমাদের ছোট ছোট ছোট জিনিষ নিয়ে সন্তুষ্ট থাকতে হবে” -ফার্ডিনাণ্ড আবার আরম্ভ করে—“অবশ্য সামান্য একটা রাস্তা, বৈদ্যুতিক লাইন পাতা, ডিচ্ খনন—এই রকম ছোটখাট কাজ আমাদের বিশেষভাবে নাড়া দিতে পারে না। কিন্তু কেউ যদি এই বিশাল পৃথিবীর কক্ষক্ষেত্রে প্রবেশ করে ত দেখতে পারে - এমন অনেক ব্যাপার আছে যা’ সত্যিই অদৃশ্যের সুপ্ত শক্তিকে নাড়া দেয়। যে সমস্ত সৈন্যরা পৃথিবীর শেষ সীমানায় যায়, বহুলোকের সঙ্গে যুদ্ধ করে - সাম্রাজ্য স্থাপন করে - সেখানে যায় দরকর সভ্যতার ফসল ছড়িয়ে যায়—তাদের আমি হিংসা করি। এখানকার যুগে ইচ্ছা করলে ইঞ্জিনিয়াররা বড় বড় কাজে হাত দিতে পারে : “যেমন—ভূটো সমুদ্রকে যুক্ত করতে পারে—নাহ’ক নদীর জল রেগুলেট করতে পারে—এমনি সব কাজ। আমার ইচ্ছা আছে, ভবিষ্যতে এইরকম একটা কিছু করবার। এখানকার পড়া শেষ হলে, চলে যাব। কয়েক শত বৎসরের মধ্যে এই ইঞ্জিনিয়াররাই নক্ষত্রে নক্ষত্রে সেতু বাঁধবে ...স্বোক করতে বোধ হয় আপত্তি নেই—”

“না-না, কোন আপত্তি নেই—কিন্তু আমি ও সব”—

“কিন্তু আমি রীতিমত ধনুবাদ”—ফার্ডিনাণ্ড সীগারকেস হতে একটা সীগার বের করে ধরল।

—“চল-না কেন, রেগুলার টোকা থাক”—

পীরার চক্ষুতে উজল—এ সবার অর্থ ?

একজন রেগুলার স্পাটান। বাপের সম্পত্তি ভাগ হয়ে গেছে—সুতরাং আমার ফাণ্ড এখন একেবারে শূন্য নয়। চল হবে

এখন একটু সময়োচিত জলযোগ করা যাক! কাপড় ছাড়তে চাপ্ত বাহিরে অপেক্ষা করছি। তা না হলে যে রকম আছে, ঐ রকম! বেশেই চলে এস—অবশ্য যদি ইচ্ছা কর।”

পীয়ার ক্রমশঃ বিষয়ান্বিত হয়ে উঠছে! এ সবে পেরেছে কি কোন উদ্দেশ্য নেই? না—লোকটি স্বভাবতই এই প্রকৃতির! যাক, এসব চিন্তা দূরে রেখে—কলার বদলে সব চেয়ে ভাল পোষাক পরে পীয়ার বের হয়ে এল।

জীবনে এই প্রথম ফাষ্ট্‌ক্লাশ রেস্টুরাঁয় আহার। ছোট ছোট টেবিল—বরফের মত শাদা টেবিলক্লে চাকা, ফুলদানী—কুটির মত ভাঁজ করা গামছা, কাচের আধার—লাল মদের পাত্র। ফাডিনাও বেশ সহজভাবে—ভদ্রতার সহিত তার সঙ্গে কথা বলে চলল। আহারের সময় পীয়ারের শৈশব—শৈশবের দিনসমূহ নিয়ে আলোচনা করলে।

যখন তারা কফি আর সীগার ধরেছে—তখন কেনই বা আব আপনি বলে কথা বলবে। পীয়ারের টেবিলের ধারে মুখটা এগিয়ে নিয়ে ফাডিনাও বলল—“এবার আপনি ছেড়ে, ‘তুমি’—কি বল?”

“বেশ”—কথাটা পীয়ারের অন্তর স্পর্শ করে।

—“তাছাড়া আমরা দু’জনেই হলম’।”

—“হ্যাঁ”—

—“কে বলতে পারে—আমাদের মধ্যে কোন সম্পর্কের বন্ধন নেই? এরকম মাথা গুঁজে থেক না। আমাকে তোমার বন্ধু বলেই জেন এবং দরকার হলে আমার কাছে আসবে। আমি বলছি না যে, তুমি আমার কাছে টাকা ধার নাও। কিন্তু ক্লস ব্রককে গুঁয়ে মাদে সঙ্গে নেওয়া উচিত—কেমন ঠিক কিনা?”

পীয়ারের ইচ্ছা হচ্ছিল, এই মুহূর্তে ছুটে পালিয়ে—যায়। ও কি

সব জানে? আর যদি জেনে থাকে, কেনই বা তা স্পষ্ট করে বলে না?

বসন্তের উজ্জ্বল সন্ধ্যা—হুঁজনে বাড়ীর পথ নিলে—পরস্পরের হাত ধরে। ফার্ডিনাণ্ড আরম্ভ করে—“তুমি জান বোধ হয়, বাড়ীর সঙ্গে আমার গণ্ডগোল চলছে। কিন্তু তোমাকে যেদিন দেখেছি, সেদিন মনে হয়েছে—তোমার সঙ্গে আমার কোথাও যেন যোগসূত্র আছে। তোমাকে দেখে খালি আমার বাবার কথা মনে হয়। আমার বাবা খুব উদ্রলোক ছিলেন।—”

পীয়ার কোন উত্তর দিল না—কাজেই আলাপও বেশী জমল না।

কিন্তু এর পর কয়েকদিন পীয়ারের খুব উত্তেজনায় কাটল। সে বুঝতে পারলে না, ফার্ডিনাণ্ড তার সম্বন্ধে কতখানি জানে—সে মরে গেলেও নিজের সম্বন্ধে কিছু বলবে না! ফার্ডিনাণ্ডও এ নিয়ে তাকে আর কোন কথা বলেনি, কিন্তু সে তার অকৃত্রিম বন্ধু হয়ে উঠেছে—যেন কতদিনের বন্ধুত্ব তাদের। পীয়ারকে সে আর কোন দিন তার শৈশবের কথা জিজ্ঞাসা করেনি—নিজের পরিবার সম্বন্ধেও সে নির্ঝাক রয়েছে। পীয়ারও সর্বদা সতর্ক থেকেছে, কিন্তু ফার্ডিনাণ্ড এলে খুশী না হয়ে পারে নি।

একদিন ক্লস ব্রক আর তার ফার্ডিনাণ্ড নিমন্ত্রণ করলে তার বাড়ীতে। একটা পাটি হবে। ঘরখানি বেশ সুসজ্জিত—দেওয়ালে দেওয়ালে ছবি—ফটোগ্রাফ—তার পিতামাতার। তার বাবার একখানা যুবা-বয়সেও ছবি আছে—ইউনিফর্ম পরা। আর একখানা তার ঠাকুর্দার—তিনি ম. কোর্টের জজ ছিলেন।

‘আমার পিতামাতার ছবি দেখতে তুমি খুব ভালবাস দেখছি—’

ফার্ডিনাণ্ড হাসতে হাসতে বলল। ক্রস রক মুখ চাওয়াচারি করে —
ব্যাপার কি রকম দাঁড়িয়েছে কে জানে !

গ্রীষ্মের ছুটি এসে গেল—ছাত্ররা যে-যার বাড়ী চলে যাবে। ক্রসও
তার বাড়ীতে যাবে।

একদিন ফার্ডিনাণ্ড পীয়ারের নিকট এসে বললে—“ভাই, তোমার
কাছে আমি একটা অন্তর্গত ভিক্ষা করছি। আমি ছুটিতে সমুদ্রের ধারে
একটা বাড়ী নেব—সেখান থেকে পাহাড়েও যেতে পারি। কিন্তু একা
দু’জায়গায় যাই কি করে, বল। তুমি যদি একটা নিমন্ত্রণ নাও, তাহলে
খুব ভাল হয়। অবশ্য খরচ আমিই দেব।”

“বন্ধুবাদ”—পীয়ার বলে হাসতে হাসতে।

যাবার পূর্বে ক্রস তার কাছে এল—তারপর নিশ্চয় কণ্ঠে বললে—
“আচ্ছা পীয়ার, লুইসের কবরের ওপর একটা মার্বেল পাথর ঢাকা দিলে
হয় না?”

পীয়ারের অন্তরে কথাটা ঘা দিলে—সে ক্রসের হাত চেপে ধরল —
“ক্রস, তোমার মত ভাল লোক দেখা যায় না”—

ছুটির শেষ দিকে পীয়ার একাকী গ্রামে বেড়াতে গিয়েছিল এবং
যখনই সুযোগ পেয়েছে—কোন গোলাবাড়ীর কর্তার কাছে গিয়ে
বলেছে “তোমার জমির একটা ম্যাপ দরকার আছে কি? বেশী
খরচ হবে না। মাত্র ১০ ক্রাউন—আরও ষতদিন কাজ করব ততদিন
থাকবার ব্যবস্থা।” এই ভাবে ছুটিটা কেটেছে খুব আনন্দে এবং যখন
বাড়ী ফিরেছে তার পকেট বেশ ভারী।

কলেজের সেকেণ্ড ইয়ার, ঠিক পূর্বের মতই কেটেছে—বেচিন্ত
বিহীন। সে একভাবে কাজ করে গেছে। সময় সময় দুই বন্ধু এসে
তাকে টেনে নিয়ে যায়—সেদিন সন্ধ্যাটা মন্দ কাটে না। নিদ্রিত

নগরীতে হাসি ঠাট্টা, গুলজার—সময় কাটান'র পর তার পক্ষে আর এক নতুন জীবনের আরম্ভ হয়—যখন সে একাকী স্তিমিত অন্ধকারে বিছানায় শুয়ে থাকে—সে তার নতুন জীবনের মুখোমুখী এসে দাঁড়ায় আর অঙ্কনবতার সান্নিধ্য উপলব্ধি করে। কি করছ পায়ার? কি তোমার উদ্দেশ্য? সে উত্তর দিতে চেষ্টা করে সশ্রদ্ধভাবে—ঠিক সাক্ষ্য বন্দনাব সময়ের মত। কোথায়? কেন—আমি একজন বড় ইঞ্জিনিয়ার হব। তারপর? তারপর প্রেমথিয়াসের পুত্রের মত স্বর্গের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করব। তারপর? তারপর—সকলকে সেই মই বেয়ে উঠতে সাহায্য করব। তারা যাত্রা করবে—আলোকের সন্ধানে, অপরিমের সত্তার অনুভূতির পথে—প্রকৃতির রাজ্য বিজয়ে। তারপর? বিয়ে করা—সুখে ঘরকন্না করা—পুত্রকন্যাবেষ্টিত সুন্দর নীড় রচনা করা। তারপর? তারপর আসবে বার্কিকা—মানুষ মরণের হিমকোলে আশ্রয় নেবে। তারপর? তারপর কি?—সব শেষ!

এই সব সময় লুইস যেখানে বাস করে—সে রাজ্যের ছায়াঘন শান্তিতে আশ্রয় নিয়ে সে আনন্দ পায়। সেখানে লুইস থাকে—সে ভায়োলিন বাজায়—আর সেই সঙ্গীতের তরঙ্গে নিজেকে দোল দিতে থাকে ধীরে ধীরে কিন্তু সে রাজ্যে বাস করেও সে সমস্ত ইন্দ্রিয় দিয়ে অনুভব করে এক আশ্চর্য্য পিপাসা—এক অসহ ক্ষুধা—আরও কিছু চাই?

ফার্ডিনাণ্ডের 'ফোর্থ ইয়ার কোর্স' শেষ হলে, সে এই বিরাট বিশ্বে অদৃশ্য হয়ে গেল—রুসও তার সঙ্গে গেছে। কাজেই থার্ড ইয়ারে পায়ারকে প্রায়ই একাকী দেখা যেত—হাতে বই, দৃষ্টি সম্মুখে প্রসারিত।

ঠিক ক্যানাল পরীক্ষা দেওয়ার আগে ফার্ডিনাণ্ডের নিকট হতে চিঠি একখানা;—লিখেছে ইজিপ্ট থেকে—“এখানে চলে এস। একটা বড় ব্রিটিশ কোম্পানী—ব্রাউন ব্রাদার্সের সঙ্গে কাজ পাওয়া গেছে—

কানাডায় এরা রেলপথ খুলবে—ইণ্ডিয়াতে ব্রীজ তৈরী করবে—
আরজেন্টিনাতে বন্দর তৈরী হবে, ইজিপ্টে খাল করবে। তোমাকে
এখানে ড্রাপ্টস্ম্যানের কাজ জোগাড় করে দেব। আমার জন্ম টাকাও
পাঠাচ্ছি। শীগগির চলে এস।”

কিন্তু পীয়ার তখনই গেল না। এক বছর কলেজে ‘সহকারী লেক-
চারার’ হিসাবে কাজ করলে—অবসর সময়ে ব্রীজ, রেলওয়ে কোর্স
পড়তে লাগল—ঠিক যেমন করে তার সংভাই কলেজ-জীবনে দাঁড়ি টেনে
দিয়েছে। এই সব তুচ্ছ কাজেও পিছনে পড়ে থাকা ঠিক নয়—অন্তরের
গোপন শক্তি তাকে সব বিষয়ে যোগাত্তর করে তুলছে।

দিন যতই কাটে, বন্ধুদের কাছ থেকে চিঠির উপর চিঠি আসতে
থাকে—“চলে এস”। রুস লিখেছে—“ইঞ্জিনিয়ারাই মিশনারী—
জীবোতা নয়—ইউরোপের সভ্যতা ও শক্তির প্রতিমূর্তি তারা। তোমার
সভি আসা উচিত। একজন জেনারেলের লোভনীয় কাজ তোমার
জন্ম অপেক্ষা করছে।”

তারপর একদিন শরতে—যখন গাছের পাতা পীতভ হয়ে এসেছে,
পীয়ার একটা প্রকাণ্ড নীল রংএর ট্র্যাভেলিং ট্রাঙ্ক গাড়ীর পিঠে চাপাল।

যাত্রার পূর্বে সে এক গোছা ফুল নিয়ে সমাধি ক্ষেত্রে গিয়ে দাঁড়াল।
কে জানে, আর কোনদিন সে ফিরে আসতে পারবে কি না? হয়ত
এই শেষ-দেখা।

ষ্টেশনে এসে বহু পরিচিত নগরীর দিকে সে একবার ফিরে তাকাল—
সেই গীর্জা, পুরান দুর্গ—একজন পাহারাওলা সেখানে পায়চারী করছে।
এই কি তার যৌবনের শেষ? লুইস—আস্তাবলের ওপরের ষড়খান,
ভাসপাতাল, কলেজ—অদূরে ঐ fjord আরও দূরে—সমুদ্রের ধারে
একখানি জেলেদের ঘুসর কুঁড়ে ঘর—সেখানে বাস করে একটি বৃদ্ধ আর

বৃদ্ধা—এতক্ষণে হয়ত তারা কফি আর টোবাকে পিয়েছে—তার বিদায়
উপহার। এই শেষ—বিদায়—বিদায়!

পায়ারের গাড়া নগরের দিকে চলল—তারপর কাঁপিয়ে পড়ল বিরাট
পৃথিবীতে।

দ্বিতীয় খণ্ড

(১)

কয়েক বছর কেটে গেছে—বেশ কয়েক বছর—আবার গ্রীষ্ম এসেছে—জুন মাস। এ্যাটওয়ার্প হ'তে ক্রিশ্চিয়ানিয়াগামা একখানা যাত্রীবাহী জাহাজ ঘনায়মান সঙ্কায় সমুদ্রের জল কেটে ছুটে চলেছে। সমুদ্র আজ এত শান্ত, নিষ্কম্প যে, দেখে মনে হয়, প্রকাণ্ড একখানা আয়না—ধূসর আকাশ আর আবীরের রঙ ছোঁয়া মেঘের ছায়া বুকে করে আছে। ডেকে অনেক যাত্রী—কিন্তু কারুরই শোবার ইচ্ছে নেই—ডেকের ওপর এত আরাম, আর চারপাশে সুন্দরের রাজ্য! প্যারিস অথবা মিউনিক প্রত্যাগত হ'একজন আটিষ্ট সময় কাটাবার জন্য আনন্দ সাগরে ডুবে আছে; কেউ মদের অর্ডার দিয়েছে—কেউ বাকনসার্ট পাটি জুড়ে দিয়েছে—শীঘ্রই তাদের অজ্ঞাতসারে পূর্ণবেগে নাচেরও অবতারণা হয়ে গেল। “না না, লক্ষ্মী”—হ'একজনের অতি সাদর্থনী মা তাদের মেয়েদের বলছেন—“না' মা, তোমরা... কিন্তু দেখতে না দেখতে কয়েক মুহূর্তের মধ্যে সেই মেয়েরাই নাচ শুরু করে দিল! একজন চোখে চশমা আঁটা ডাক্তার পিপের ওপর উঠে এক বক্তৃতা দিলেন—আর হ'জন আটিষ্ট শাদাদাডিওয়াল এক

ক্যাপ্টেনকে সভাপতিত্বে বরণ করল। আজ রাত এত পরিষ্কার—
স্বাক্ষে এত রক্তাভ শ্রী—বাতাস ধীর শান্ত—আর উন্মুক্ত সাগর-
বক্ষে যাত্রীদের হৃদয় আজ হুল্লা ও আনন্দোৎফুল্ল।

“ঐ কাঠের মত শুষ্ক মুখে, ব্যাটা কে বল ত? ঐ উঁচু জায়গায়
দাড়িয়ে আছে—সাধারণ কোতুকছলেও কেউ ঐ ভীষণ জায়গায় দাড়ায়
না—” আর্টিষ্ট ঠোয়েকার তার বন্ধু ভাস্কর প্রাসকে জিজ্ঞাসা করল।

“ও সেই লোকটা? ডীনারের সময় আমরা যখন ইজিপ্সিয়ান
স্কুলদানী নিয়ে আলোচনা করছিলাম, তখন ওই লোকটাই খুব বড়
বড় কথা বলছিল—তখন মনে হল, লোকটা বোধ হয় খুব জানে শোনে” —

“ঠিক তাই। বোধ হয় কোন স্কুলমাষ্টার হবে। আমরা যখন
এথেন্স আর গ্রীক স্থাপত্য নিয়ে আলোচনা করছিলাম, তখনও সে
আমাদের ভুলত্রুটি শুধরে দিচ্ছিল”—

আজ সকালে আমি ওকে ডাক্তারের সঙ্গে এ্যাসিরিয়োলজির সম্বন্ধে
কথা বলতে শুনেছিলাম। আচ্ছা ও নাচে যোগ দেয় না ত, আশ্চর্য্য” —

যে যাত্রীকে নিয়ে পূর্বোক্ত সমালোচনা চলছিল, তার বয়স বাহ্যত
ত্রিশ আর চল্লিশের মধ্যে হবে, মাথায় মাঝারি বকমের উঁচু—কিছু
দূরে ডেক-চেয়ারে সে শায়িত। সর্বাঙ্গ ধূসর পরিচ্ছদে আবৃত। মুখটা
একটু চ্যাপ্টা—আর মুখের দাড়িতে একটু পাক ধরেছে। কিন্তু যখন
সে নাচিয়েদের দেখছিল, তখন তার চোখ আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে
উঠেছিল। এই আমাদের পীয়ার হলম।

বসে বসে যখন সে তাদের নাচ দেখছিল—তখন তাদের সঙ্গে
যোগ দিতে পারছে না বলে তার নিজের ওপর খুব রাগ হচ্ছিল।
দেশের লোকের সঙ্গে মেলামেশা বহুদিন সে করেনি—নিজের সাহসের
উপর আস্থা সে হারিয়ে ফেলেছে—তাদের মধ্যে সে সম্পূর্ণ অপরিচিত

বোধ হতে লাগল। তাছাড়া কয়েক ঘণ্টার মধ্যে নরওয়ের তাঁবু দেখা যাবে। এই চিন্তা তার মনের মধ্যে এক অভূতপূর্ব উত্তেজনাব সৃষ্টি করেছে—এই বিরাট পৃথিবীতে ঝাঁপ দেবার পর এই মুহূর্তটির স্বপ্ন সে দেখেছে বহুবার।

কিছুক্ষণ পরে তার চারিদিক নিরুন্ম হয়ে এল—সেও নিচে নেমে গিয়ে তার কেবিনে পোনাক না খুলেই শুয়ে পড়ল। যখন সে প্রথম দরিদ্র ও সম্পূর্ণ অসহায়ের মত সাগরে নৌকা ভাসিয়েছিল—দেশের তটভূমি মিলিয়ে যেতে লাগল দূর দিগন্তে—সে দিনের সেই মুহূর্তের ছবি মনের পটে ভেসে উঠছে। তারপর অনেক কিছু ঘটেছে জীবনে—পরিশেষে আজ দেশে—সে দেশের মাটিতে পা দেবে। কিন্তু কে জানে ভাগ্য সেখানে তার অভ্যর্থনার জন্তু কি নিয়ে অপেক্ষা করছে!

ছটার কিছু পরে সকালে সে আবার ডেকে এল—জাহাজ এখন তুর্ভেণ্ড কুয়াসার পর্দা ছিন্ন করে এগিয়ে চলেছে—বিশ্বয়-বিমুক্ত হয়ে সে ডেকের ওপর দাঁড়িয়ে রইল। ডেকের ওপর অস্থিরভাবে সে পায়চারী করতে লাগল। প্রতীক্ষা শেষের এই শুভ মুহূর্তটি কি তার নষ্ট হয়ে যাবে? হঠাৎ সে রেলিং ধরে দাঁড়াল—তারপর গভীর ভাবে চেয়ে রইল আকাশের দূর প্রাচ্যদেশে।

ওটা কি? ভারী কুয়াসার গর্ভ হতে একটা উজ্জ্বল স্থান দেখা যাচ্ছে। চারিদিকের ধূসরভায় যেন প্রাণ সঞ্চার হচ্ছে—নড়তে আরম্ভ করেছে ঐ পর্দা—লাল হয়ে উঠেছে, ক্রমশ হালকা হয়ে যাচ্ছে—যেন আগুনের আভায় সব ঝলসে যাচ্ছে। হাঁ, এখন সে চিনতে পারছে ঐ ত সূর্য্য সমুদ্রগর্ভ হ'তে জন্মলাভ করছে, ডেকে রাত্রির শিশির কণা যা যেখানে ছিল সোনার ঝলমল করে উঠল। প্রতি মুহূর্তে উজ্জ্বলতর হয়ে উঠছে—দৃষ্টি চলে সুদূর ভেদ করে। কি ঘটছে বোঝবার

পূর্বেই ধূসর অঙ্ককার তালগোল পার্কিয়ে পাহাড়ের সমান উঁচু হয়ে
ভয় আভায় ভাসতে ভাসতে অদৃশ্য হয়ে গেল। নব প্রভাত—স্বচ্ছ
সুন্দর প্রভাতের মূর্তি প্রতিফলিত হয়ে উঠল—নীলসায়রের ওপর রবি-
করোদ্ভাসিত আকাশ।

এখন চোখে চশমা আটবার সময়। বলক্ষণ সে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে
বইল—উন্মুখ দৃষ্টি মেলে। ঐখানে! এক স্বপ্ন! না, ঐ ত দূরে সমুদ্র
আর আকাশের মধ্যে একটা কালো রেখা দেখা যাচ্ছে। ঐ ত তটরেখা!
নরওয়ে—শেষে তার প্রতীকার নরওয়ে!

শ্বাস-প্রশ্বাস নিতে হঠাৎ পীয়ারের কষ্ট হ'ল।

সে আর স্থির হয়ে দাঁড়াতে পারছে না। সে যেতে যেতে বার
বার থামতে লাগল—দেখতে লাগল দূরের ঐ মসী রেখা। ঐ ত লক্ষ্য
গলাওয়ানা লঘুপক্ষ পাখী দেখা যাচ্ছে। প্রবাসী বীর—সুস্বাগতম!

ষ্টীমার যখন fjord কেটে চলেছে—আশে পাশে ছোট ছোট পাহাড়
মাথা জাগিয়ে উঠছে। প্রথমে জেলেদের লাল রংএর কুটীর। তারপর
ক্রিষ্টিয়ান ল্যাণ্ডের প্রবেশ পথ—পথের একধারে দ্বীপ আর একধারে
বনানী-সমাকীর্ণ পাহাড় শ্রেণী। দ্বীপে শাদা শাদা কুড়েঘরগুলো রোদে
ঝক্ ঝক্ করছে—প্রত্যেক কুটীরের সামনে একখণ্ড তৃণভূমি আর তার
সামনে এক একটি পতাকা।

পীয়ার লক্ষ্য করতে লাগল—বলকারক ওষুধের মত পান করতে
লাগল। কি মধুর? বহুদিন লাগবে সব নিঃশেষে পান করতে।

এইবার তটভূমির ধার ঘেঁসে ষ্টীমার চলতে আরম্ভ করেছে—উজ্জ্বল
সূর্য্য-কিরণোদ্ভাসিত দিবস আর স্বপ্নময়ী রাত্রি ধরে। শাদা 'সীগাল'
মাথার ওপর উড়ে বেড়াচ্ছে। তটভূমির তীরে শহর—রংকরা কাঠের
বাড়ী—জানলায় জানলায় ফুলের উৎসব।

এস্থান দিয়ে পূর্ব আর সে কখনও যায় নি—কিন্তু তার মধ্যে কে যেন বলছে—“চিনি আমি—এসব আমার চেনা।” ক্রিশ্চিয়ানিয়ার fjord পর্যন্ত সারা পথে পাতার আর মাঠের গন্ধ। বড় বড় ফার্ম—সূর্যালোকে রোদ পোহাচ্ছে। বড় বড় ফার্ম এই রকমই দেখতে হয়। সে মাথা নাড়ে। যদিও সে জানে এখানে টুরিষ্টদের চেয়ে তার সম্মান বা দাবী বেশী নেই, তথাপি এ জন্মভূমি চিরপ্রিয়—মায়ের কোলের মত মধুর এর উদ্ভাপ, অনন্ত সৌন্দর্যশালিনী সে তারই মা। তাকে অভ্যর্থনা করে নিয়ে যাবার কেউ নেই। অনাগত ভবিষ্যে হয়ত এরকম থাকবে না।

জাহাজ ক্রিশ্চিয়ানিয়ার বন্দরের মধ্যে প্রবেশ করলে যাত্রীরা সারি বেঁধে ডেকের ওপর এসে দাঁড়াল—বন্ধুবান্ধব আত্মীয়স্বজনের। তাদের অভ্যর্থনা করতে—হাসি, আনন্দ, চুম্বন, কোলাকুলি ও চোখের জলের ফোয়ারা ছুটল। পীয়ার টুপি খুলে ভিড় ঠেলে বেরিয়ে এল, কিন্তু তাকে কেউ লক্ষ্য করলে না। একজন হোটেল পোর্টারের নিকট লাগেজ জিন্মা করে দিয়ে সে নগরের পথে হেঁটে চলল—যেন সম্পূর্ণ অপরিচিত।

রাত্রির আলোক তার ঘুমের ব্যাঘাত জন্মায়—সে ভুলেই গিয়েছিল যে, সারা রাত ধরে এখানে আলো জ্বলে। এ রাজধানী, কিন্তু তার কাছে বড় ছোট মনে হয়—তবু সে অস্তুরের। যেখানেই যাই না কেন—কয়েক পা গেলেই যেন পথের শেষ হবে। এরাই তার স্বদেশবাসী, কিন্তু কাউকে সে চেনে না। তাকে অভ্যর্থনা করবার কেউ নেই কিন্তু তবুও সে ভাবে—একদিন কালের গতি ভিন্নমুখে চলবে।

অবশেষে একদিন যখন সে একটা বই এর দোকানের জানালায় উঁকি দাঁড়িয়েছিল, তখন হঠাৎ পশ্চাতে পরিচিত কণ্ঠস্বর শোনা গেল—“কি

গ্রেট হাজার

পীয়ার মাকি ?” এ তার একজন সহতীর্থ --টেকনিক্যাল কলেজে একসঙ্গে পড়েছে।

রোগা ছিপছিপে --বরাবরই এই ধরণের। কলেজ তাকে দেখতে বেশ সুন্দর ছিল, কিন্তু এখন কি রকম নিস্তেজ হয়ে গেছে—জীর্ণশীর্ণ।

—“তোকে ত চেনাই যায় না”—পীয়ার তার হাত ধরে।

—“তুই নাকি এখন ক্রোরপতি—বাইরে এই রকম গুজব—খুব নাম কিনেছিস—?”

—“খুব বেশী মিথ্যে নয়—কিন্তু তোর খবর কি ?”

—“আমি—ওঃ, আমার কথা বল’ না”—রাস্তায় যেতে যেতে ল্যাংবার্গ তার সমস্ত ইতিহাস খুলে বললে। তার দিন কি রকম খারাপ চলেছে—বাড়ীর অবস্থাও কি রকম ভয়াবহ হয়ে উঠেছে। দশ বার বছর আগে সরকারী রেলওয়েতে ড্রাফটস্ম্যান হিসেব চুকেছিল এবং সেই কাজেই সে আছে। পরিবারের সংখ্যা বাড়ছে, কিন্তু আয়ের অঙ্ক একরকম সমান আছে বললেই চলে। ‘যে মাইনে কি আর বলব ?’ চোখ ঘুরিয়ে সে বন্ধুর হাত চেপে ধরল আশাহতের মত।

“দেখ”—পীয়ার তাকে বাধা দিয়ে বলল—“বলতে পারিস ক্রিশ্চিয়ানিয়াতে বিকেল কাটাবার মত সবচেয়ে ভাল জায়গা কোথায় আছে ?”

—“কেন, স্থানস্ হিল-এ। সেখানে গানবাজনা হয়”—

—“বেশ, আজ রাতে সেখানে আমার সঙ্গে তোমার ভোজের নিমন্ত্রণ করাইল—ধর এই আটটায়।”

—“ধন্যবাদ, আসতে চেষ্টা করব”।

পীয়ার ঠিক সময়েই এসে উপস্থিত হল—বারান্দায় একটা চেয়ার পেতে নিলে। কিছু পরে ল্যাংবার্গ এল—রবিবারের উপযুক্ত সবচেয়ে

গ্রেট হাঙ্গার

ভাল সাজে সজ্জিত হয়ে। রং উঠে যাওয়া ফ্রক কোট—হাক্কা-ট্রাউজার
-সোলের টুপিতে কালের অত্যাচারের চিহ্ন সুপরিষ্কৃত।

“কাকুর সঙ্গে আমার গল্প করতে বেশ ভাল লাগে”—পীয়ার আরম্ভ
করে—“গত কয়েক বছর ধরে কেবল একাকী নিজে নিজেই পথ কেটে
চলেছি”--

“কি, যেদিন হতে ইজিপ্ট ত্যাগ করেছ সেদিন থেকে—”

—“হঁা, তার চেয়েও আগে। তারপর থেকে আমি এ্যাবিসিনিয়ার
ছিলাম।”

—“হঁা, এবার ঠিক মনে পড়েছে কাগজে সেই রকম দেখেছিলাম
বটে। রাজা ম্যানেলিকের জন্য একটা রেলপথ তৈরী করছিলে—
নয় কি?”

“হঁা—কিন্তু গত আঠার মাস যাবৎ শুধু নিশ্চিন্ত ঔদ্যোগে দিন
কাটাচ্ছি—কেবল থিয়েটার মিউজিয়াম করে বেড়াচ্ছি! প্রথমে এথেন্সে
যাই, তারপর লণ্ডনে। একদিন পারথেনোন স্তম্ভভূমিতে বসেছিলাম
মনে পড়ে—সে সময় মনে হয়েছিল—মূর্ত্তগুলো যেন আসছে আমার
কাছে কত অর্থে মুখর হয়ে।

—“আর রেখে দাও ওসব—নাটল প্রপাতের মত জিনিষের সঙ্গে
ওসব ছোট জিনিষের তুলনাই চলে না। এটা তৈরী করতে অনেক
বছর লেগেছিল, না? বল ভাই, এ সম্বন্ধে কিছু বল, শুনি। বড় প্রপাতের
একটু উপরেই না? সেই জায়গায় প্রকাণ্ড একটা খনির মত ছিল, না?
দেখ, বাড়ীতে থেকে সব খবরই রাখি। কত আশ্চর্য্য জিনিষই না তোরা
চোখে পড়েছে? ‘বেঁচে থাকা’—ওকেই বলে। আচ্ছা; কোন্ শহরে
থাক্তিস্ তুই?”

“এ্যাসুরান্”—অন্যমনস্ব ভাবে পীয়ার উত্তর দিল। বাগানের

গ্রেট হাঙ্গার

র দৃষ্টি নিবন্ধ—সেখানে ক্রমশ অপরিচিতের সংখ্যা বাড়ছে।

“সবাই বলে—জলপ্রপাতটা পিরামিডের মত আব এক আশ্চর্য্য জিনিস হয়েছে। জল বেরোবার কতগুলো গোট যেন আছে—একশ’ কত?”

“হ’শ যোল”—পীয়ার উত্তর দেয়। “আচ্ছা, ঐ মেয়েদের চিনিস”—সে কথার মোড় ঘুরিয়ে দিলে—“নিকটেই টেবিলের ধারে হাক্সা পোষাকে সজ্জিত হয়ে একদল মেয়ে বসে আছে।

ল্যাংবার্গ মাথা নাড়ল। সে এখন বৃহৎ জগতের খবরের জন্য ক্ষুব্ধ!

“আমার ভারী অদ্ভুত ঠেকে”—সে বলে চলে—“একাজে তুই কি করে সবাইকে পেছনে ফেললি—রেলপথ, জলপ্রপাত এই সব জিনিসে—কিন্তু তোর নিজের লাইনত মেকানিক্যাল ইঞ্জিনীরিং ছিল। অবশ্য বছর খানেক তুই রাস্তারেলপথ নিয়েও ব্যস্ত ছিলি। কিন্তু—”

শুলের মেয়েদের দল—এক একটি যেন বিচ্যৎ জ্যোতি :

—“কিহে, শ্যাম্পেন খাবে”? পীয়ার জিজ্ঞাসা করে—“কি পছন্দ কর, মিষ্টি—না, একেবারে র’?”—

“কেন, কিছু পার্থক্য আছে নাকি? আমি কিন্তু জানি না। তা’ লোকে যখন ক্রোরপতি হয় তখন - ”

“আমি ক্রোরপতি নই”—পীয়ার হেসে উত্তর দেয়—একজন ওয়েটারকে সে ইঙ্গিত করে।

“আমি জানি, তুমি তাই। তুমিই ত একপ্রকার মোটর পাম্প আবিষ্কার করেছিলে, যার জন্ম বাজারের অগাণ্ণ মোটরপাম্পদের পাততাড়ি গুটাতে হয়েছে। তা ছাড়া ঐ এ্যাবিসিনিয়ান রেলপথ—” সে দীর্ঘশ্বাস

ফেল্ল—“তাছাড়া কেউ ভাগ্যবান জানলে, কত আনন্দ হয়। আমাদের অবশ্য অভিযোগ করা উচিত নয়। তারপর ক্লস ব্রক আর ফাডিনাও হলমের খবর কি? তারা কি করছে?”

—“ক্লস এডফিনার খেদিভদের ষ্টেটের তত্ত্বাবধান করে। ষ্টীম পাওয়ারে কৃষিকার্য চালায় তার উদ্দেশ্য—নিজের উদ্ভাবিত উপায়ে রেলপথ নিষ্কাশন—এই বরকম কাজ নিয়ে ব্যস্ত। ইয়া ক্লস একটা নতুন শহর গড়ে তুলছে। তার সৃষ্টি ডেনমার্কের রাজ্যের চেয়েও বড়।”

—“তাই নাকি”—ল্যাংবার্গ চেয়ার থেকে পড়তে পড়তে বেঁচে গেছে।
“আর ফাডিনাও হলম—তার খবর কি?”

—“ও, সেও অনেক বড় বড় কাজ করেছে। লিবিয়ান মরুভূমিতে গিয়েছিল—ও আবিষ্কার করেছে যে মাটির কয়েকহাত নীচেই দেহের শিরা ও উপশিরার মত জলের বহু ধারা মরুভূমি পরিব্যাপ্ত করে আছে। আর কি চাই এখন! সেখানে ভাল বরকম চাষের ব্যবস্থা করলে শস্যসম্ভারে সে দেশ হবে ‘নন্দন কানন’।”

“উঃ, কি ভীষণ আবিষ্কার!”—ল্যাংবার্গের এবার দম বন্ধ হবার উপক্রম।

পীয়ার fjord দিকে চেয়ে বলতে লাগল—“গত বছর খেদিভদের সাহচর্যে কয়েক লক্ষ মূলধন নিয়ে সে একটি যৌথ কারবার খুলেছে। সেই এই কোম্পানীর চীফ ইঞ্জিনীয়ার।”

“তার মাইনে কত? নিশ্চয়ই পঞ্চাশ হাজার ক্রাউনের কম হবে না”—

—“তার মাইনে বছরে দু’শ হাজার ফ্রাঙ্ক”—পীয়ার একটু না ভেবেই বলে ফেলল। কারণ বন্ধু হয়ত টাকার অঙ্ক শুনে জ্ঞান হারিয়ে ফেলতে পারে—। “ইয়া, ফাডিনাও—মতাবান পুরুষ!”

ল্যাংবার্গ'এর প্রকৃতস্থ হ'তে কয়েক মিনিট কেটে যায়। শেষে অ ড়োচোখে চেয়ে বলে—“আর তুমি আর ক্লস ব্রক—সেই কোম্পানীতে নশয়ই তোমাদের লক্ষ লক্ষ টাকার শেয়ার আছে?”

পীয়ার বাগানের দিকে চেয়ে হাসতে লাগল। চশমা খুলে শুধু বলল—“তোমার মঙ্গল হোক”।

—“তুমি নাকি আমেরিকা গিয়েছিলে”.. সে থামো না বলে “বাব হয় যাওনি?”

“আমেরিকা? হ্যাঁ, কয়েক বছর আগে যখন ব্রাউন ব্রস'দের সঙ্গে কাজ করতাম—তারা আমার গাছ কিনতে আমেরিকায় পাঠিয়েছিল। এতে আশ্চর্য্য হবার কি আছে?”

—“না কিছুই নেই। আমি খালি ভাবছিলাম, তুমি সেখানে গিয়েছ—সেখানকার সব আশ্চর্য্য জিনিস দেখে ফেলেছ—বিজ্ঞানের রাজ্য সে.....”

—“দেখ, সত্যি কথা বলতে--এসব বৈজ্ঞানিক আশ্চর্য্য আমার একটুও ভাল লাগে না। আমি চাই—এমন একটা ওয়াটার মিল' তৈরী করতে—যা' চব্বিশ ঘণ্টায় এক খলে শস্য গুড়িয়ে ফেলতে পারবে।”

“কি? কি বলছ?” ল্যাংবার্গ চেয়ার ছেড়ে লাফিয়ে উঠল—“হা-হা-হা—তুই দেখছি ঠিক আগের মতই আছিস্—”

—“না-না, আমি ঠাট্টা করছি না।”—একটা গ্লাস ল্যাংবার্গ এর দিকে এগিয়ে দিলে—“এস, আবার পুরানো দিনে ফিরে আস! যাক্—কি বলিস্?”

—“ওঃ ধন্যবাদ—অজস্র ধন্যবাদ—পুরানো সব হারিয়ে যাওয়া দিন। আঃ কি চমৎকার! তাহলে বল, তুমি সেই অসভ্যদের দেশটাকে ভালবেসে ফেলেছ, নয় কি?—হা হা-হা—”



গ্রেট হাঙ্গার

—“ইজিপ্টকে তুমি অসভ্যদের দেশ বল ?”

—“তারা কি এখন জোয়ালে গরুর বদলে স্ত্রীদের জোতে না ?”

“এখানে একজন সারা রাত তারা-তারা আকাশের দিকে চেয়ে মস্ত বাত কাটিয়ে দেয়। তারপর স্বপ্নে বিভোর হয়ে থাকে। আর ভিয়েনায় একজন বাবসারী থিয়েটারে যেতে যেতে মোটরে দরকারী চিঠি পত্র পেখে—ষ্টলে বসে টেলিগ্রাম করে। একদিন হয়ত দেখতে পাবে, ষ্টলে বসে আছে—এককানে টেলিফোন আঁটা আর অণুকান দিয়ে থিয়েটারেও অভিনয় শুনছে—বিজ্ঞানের দৈবামায়া ত এই।—বিশ্বয় সৃষ্টিকারী তাই নয় ?”

—“তুমি এই রকম কথা বলছ ? তুমি না নাইল নদীর বাধ বেঁধেছ—মরুভূমির মধ্য দিয়ে রেলপথ নিয়ে গেছ ?”

পীয়ার কাধটাকে একটু কুচকে নিয়ে বন্ধুকে একটা সিগার খেতে দিলে। কফি হাতে একজন ওয়েটার এসে উপস্থিত।

“মানবতার দ্রুত উন্নতি করতে সাহায্য করা—একি তুমি ‘তুচ্ছ’ বলতে চাও ?”

“হায় ভগবান ! আমাকে বলতে পার, মানুষ যে এত তাড়াহুড়া করছে—কোথায় যাবে তবে তারা—লক্ষ্য তাদের কতদূর ?”

“ঐ নাইল নদীর বাধ ইজিপ্টের শস্যের পরিমাণ দ্বিগুণতর করে তুলেছে। লক্ষ লক্ষ লোকের জীবনের সংস্থান করেছে—এ কি কিছু নয় ?”

—“এ পৃথিবীতে বোকামির সংখ্যা কি অজস্র নয় ? পৃথিবীতে দুঃখ দৈন্য - জাতিগত বৈষম্যের শেষ নেই। তুমি কি এটাকে আরও বাড়িয়ে তুলতে চাও ?”

“কিন্তু ইউরোপীয় শিক্ষা সম্বন্ধে তোমার কি মত ? যেখানে তুমি যাও : সেখানে তোমার কি মনে হয় না—তুমি সভ্যতার পুরোহিত—”

প্রাচ্য ইউরোপীয় সভ্যতা প্রসারের অর্থ এই যে, লণ্ডন অথবা প্যারিসের দু'একজন বড় বড় কোটিপতি এশিয়া বা আফ্রিকায় বেড়াতে যাবে—সেখানে তারা একটা বোতাম টিপবে আর অমনি মন্ত্রী, জেনারেল, সম্রাজক, ইঞ্জিনীয়ার “হুজুর” বলে এসে সেলাম ঠুকবে—“হ্যাঁ হুজুর”—

সংস্কৃতি ! একটা টাকা—আরও দশটা টাকার জন্ম দেয় । দশটা—আবার আরও একশটা ! আরও আশা—আরও প্রতিযোগিতা—কিন্তু এসব কিসের জন্ম ! সংস্কৃতি ? ভুল—বন্ধু ভুল ! টাকার জন্ম । মিশনারী ! যতদিন না পশ্চিম ইউরোপ তার সমস্ত আধুনিক বিজ্ঞানের অদ্ভুত ক্ষমতা, ক্রিস্টিয়ানিটি, রাজনৈতিক সংস্কার নিয়ে—আমাদের হীনচেতাদের চেয়ে ভাল করে আরও উচ্চতর মানবতার আদর্শে গড়ে তুলছে—ততদিন ঘরের ছেলে মুখবুজে ঘরে থাকাই বাঞ্ছনীয় । এই হচ্ছে সত্যিকথা—পীয়ার তার পানীয় নিঃশেষে পান করলে ।

হতভাগ্য ল্যাংবার্গ এর কাছে এ দুঃখের কথা । তার প্রতিদিনের মাধ্যমিক জীবনে সে এই ভেবে সম্বৃষ্টি লাভ করত যে, এই পৃথিবীতে সে আপনাকে যথাসাধ্য সভ্যতার উন্নতিতে প্রয়োগ করেছে ।

অবশেষে সে আরাম-কেদারায় গা এলিয়ে দিয়ে সিগারের ধোঁয়া লক্ষ্য করতে লাগল—মুখে হাসির রেখা ।

—“কলেজের একটা ছেলের কথা মনে পড়ছে”—ল্যাংবার্গ আরম্ভ করে—“সে প্রমেথিয়াস সম্বন্ধে খুব বলত—মানবতার মুক্তি—অলিম্পাস হ’তে নিত্যনূতন বহিঃ চুরী করে মানবতার মুক্তির কথা—

“আমিই সেই”—পীয়ার হাসতে হাসতে উত্তর দিল—“আমি তখন শুধু ফার্ডিনাণ্ডের কথার প্রতিধ্বনি করেছি ।”

—“সে সব কথা এখন তুমি আর বিশ্বাস কর না ?”

—“আমার ধারণা অগুন আর ইস্পাত মানুষকে পত্তনে পরিণত করেছে—যদি আমাদের দেবোপম সত্তাকে গলা টিপে হত্যা করেছে”—

—“কি সাংঘাতিক—কিন্তু ধর্মের পথে মানুষ যতদিন না”—

“যত গভীর ক্রিষ্টিয়ান মনোবৃত্তি তোমার থাক-না, তোমার কি মনে হয় না—এমন একদিন আসবে—যখন ক্রশের সন্ন্যাসীর চেয়ে বড় আরও কিছুর আমরা আরাধনা করব।”

—“না—না—তা হয় না। কিন্তু আমি বুঝতে পারছি না কেন—

—“আমিও জানি না। কিন্তু একথা ঠিক যে, ধর্মভাব বলে পৃথিবীতে আর কিছু নেই। যখন অসীমের প্রতি আকাজ্জকে বিনাশ করেছে। বড় বড় দেশের সাধুলোকদের জিজ্ঞাসা কর। তারা বড়দিনের সন্ধ্যায় গ্রামোফনে—“The Dollar Princess” বাজিয়ে কাটায়।”

ল্যাংবার্গ পীয়ারকে নিবিষ্টভাবে লক্ষ্য করতে লাগল। পীয়ার ধীরে ধীরে ধূমপান করছে। তার মুখ মনখাওয়ার জন্য লাল হয়ে উঠেছে—মাঝে মাঝে চোখ বুজে আসছে—চিন্তা এ জগতে ছেড়ে ভিন্ন জগতে পাখা উড়িয়ে ছুটে চলেছে—

“এখন তুমি কি করবে?”—তার বন্ধু অবশেষে জিজ্ঞাসা করে। পীয়ার চোখ খুলল।

“কি করব? জানি না—আগে চারিদিক দেখতে হবে। তারপর একটা সুবিধামত স্থান সংগ্রহ করে নীড় রচনা করব, কোন পল্লীসুন্দরীকে বিয়ে করে। সেই ত জীবন—”

বাগানটি এখন লোকে লোকারণ্য হয়ে এসেছে—সকলেই হান্কা গ্রীষ্ম সূট পরেছে—এই আলোক খচিত সন্ধ্যার মন্থরতা ভেদ করে ঘন ঘন হাসির রোল আর আনন্দ কলহাস্তের তরঙ্গ ভেসে আসছে। পীয়ার তাদের গভীরভাবে লক্ষ্য করতে লাগল—সকলেই তার অপরিচিত। ল্যাংবার্গকে

সে তাদের নাম জিজ্ঞাসা করতে লাগল। লাংবার্গ দু'জন বড়লোকের পরিচয়লিপি দিল—একজন ক্যাবিনেট মিনিষ্টার আর একজন বিখ্যাত দেশ-আবিষ্কারক। “কিন্তু মৌখিক আলাপ করার সঙ্গেই নেই—ওসব সমাজে মেশা আমাদের সামর্থ্যে কুলায় না—বুঝতেই ত পার।”

—“জায়গাটা কি সুন্দর।”—পীরার বলে—fjord ওপর হলে আলোর রেখার দিকে আর একবার সে তাকাল—“অনুভূমিতে আবার কিরে আসা কি আনন্দের কথা।”

ট্রেনে চড়ে গ্রামে যেতে যেতে জানালা দিয়ে সে দেখতে লাগল—
 গোলাবাড়ী—ক্ষেতের পর ক্ষেত—গাছের সারি দেওয়া শানবাঁধান পথ .
 কোথায় সে যাচ্ছে? নিজেই জানে না—কিন্তু তাই বলে উদ্দেশ্য
 বিহীনভাবে বেড়াতে কি দোর—সখন খুশী নেমে পড়লেই হয়। আজ
 পয়সার চিন্তা না করে, নিজের দেশ ভ্রমণ করবার ক্ষমতা তার হয়েছে .
 নিরুদ্ধেগে, নিশ্চিন্ততার দিন কাটাতে সে পারে—পথে যেতে যেতে
 যে সৌন্দর্য্য উপছে ওঠে—তা ভোগ করবার যথেষ্ট সময় তার
 আছে।

ঐ ত মোসেন,—বনানী সমাকীর্ণ পাহাড়-বেরা বড় হুদটা ; হুদের
 চারিপাশে শস্যপূর্ণ গোলাবাড়ী। এখানে সে পূর্বে আর কখনও
 আসেনি, কিন্তু তার মনের মধ্যে কে বলছে,—“চিনি, তোমার আমি
 চিনি।” আর একবার সে শস্যশালিনী উর্বর। ধরণীর সৌন্দর্য্য পান
 করতে লাগল। পাহাড়, বন, মাঠ, প্রান্তর—মনের মুক্তপটে ভেসে
 উঠছে। কিন্তু দিনের শেষে মাঠ-প্রান্তর আরও সঙ্কীর্ণ হয়ে আসতে
 লাগল। তারা গুডব্রাণ্ডসড্যালেনএ এসে পৌঁছাল—নদী আর পাহাড়ের
 মধ্যে যে শ্যামলতার উৎসব তার ওপর রোদে-পোড়া গোলাবাড়ীগুলো
 কে যেন বসিয়ে দিয়েছে। পীয়ারের মনে দূরের ছবি ভেসে আসছে—
 ধূ ধূ মরু প্রান্তর—গুচ্ছ তালবীথিক।—ভেনিসের খালের চিত্র—পুরাতন
 সব দিন।

কিন্তু এখানে—এখানে সব তার সুপরিচিত। যদিও পূর্বে কখনও

স এখানে আসেনি, কিন্তু এরা যেন মায়ের স্নেহে তাকে আহ্বান করছে। মনে হয়, সুদীর্ঘ নিক্কাসনে এরাই যেন এতদিন নিরন্তর তাকে আহ্বান করে এসেছে।

ইথাৎ সে তলপী-তলপা বেঁধে সেইখানেই নেমে পড়ল—কোনু স্টেশন, তার নামও জানে না। হোটেলে আহার, পিঠে ছোট একটি বডিং আর চাই কি! ঐ ত সামনে প্রসারিত রাজপথ সুন্দর সুন্দর পাহাড়ের দিকে অগ্রসর হয়ে গেছে।

একাকী? কি এসে যায় তাতে—যখন চারিদিকে সহস্র জিনিস তাকে হাত বাড়িয়ে সাদরে আহ্বান করছে—“এস বন্ধু এস,”—খাড়া রাস্তা লম্বা বাতাস—দূরের কুঁড়েঘরগুলি ক্রমশঃ ছোট হয়ে আসে। এক সময় কুঁড়েগুলি ছোট হ’তে হ’তে দেশালাইয়ের বাসে পর্য্যবসিত হয়—উপত্যকায় দাঁড়িয়ে দেখলে মনে হতে থাকে—লোকগুলি মেঘরাজ্য বাস করছে। কিন্তু অনেক অনেক সুবক এমনি ভাবে ধূসর সন্ধ্যায় এই রাস্তা দিয়ে তার ‘মেরী’ অথবা ‘কেরীকে’ সম্বন্ধনা করতে গেছে—এই পথ বেয়ে যুগ যুগ ধরে ঐ একই উদ্দেশ্য নিয়ে। পীয়ারের মনে হতে লাগল...ঐ সব নবকেরাই তার বন্ধু, সাথী—নিজের মধ্যে সে আজ যৌবনের উচ্ছ্বলতা অনুভব করছে—যা অবশেষে এতদিনে বন্ধনমুক্ত হ’তে পেরেছে।

ওঃ, এখন জামা টুপি খুলে ব্যাপশ্যাকে বেঁধে ফেলতে হবে। পেছনে উপত্যকার দৃশ্য যতই মিলিয়ে যায়, সন্মুখের মালভূমির দৃশ্য ততই স্পষ্টতর হয়ে ওঠে। নীল বাদামী রংকরা পাহাড়—তার ধূসর খাঁড়ি হয়ত শ্যাওলা-পিছল—এই অন্তমান সূর্য্যের কিরণে দাঁড়িয়ে আছে—যেন সমুদ্রের তরঙ্গতঙ্গ একের পর এক দূরাতিদূর অবধি অচঞ্চল গতিতে এগিয়ে গিয়েছে সুন্দর আকাশে যেখানে আলোর বলমলানি—

মেঘের নিঃসঙ্গতা। একান্ত অপরিচিত সব, কিন্তু তারা তাকে হাতছানি দেয়—পরিচয় করে—উত্তরের উষ্ণতা অনুভব করা যায়।

আঃ এখন সে চিন্তে পারছে—ঐ ত লফোটন সমুদ্র-শাদা মুকুট-পর। বড় বড় শকায়মান তরঙ্গ নিয়ে গর্জনকারী সমুদ্র পাহাড়ের দিকে তেড়ে আসছে। পীয়ার গাঠির ওপর ভর দিয়ে ক্ষণকালের জন্য দাঁড়াল—দৃষ্টি অন্ধনির্মীলিত। তার মধ্যে সমুদ্রের মত উত্থান পতন চলেছে। যুগযুগ ধরে এমনি তরঙ্গ উঠছে পড়েছে মানবহৃদয়ে, অসীমতার আস্থানে তাকে ব্যাকুল করে তুলেছে। প্রতিদিনের জীবনে এই তরঙ্গ সুপরিচিত নৃত্যের ভঙ্গিতে আমাদের চালিত করে—হাজারে একজনের মাথায়ও এ প্রশ্ন উঠে না—“কেন? কোথায়?” এমনি একটা তরঙ্গের কবলে সে পড়েছে—তাকে নিয়ে যাবে কোথায়? কেন? বেশ, অনাগত ভবিষ্যে এ প্রশ্নের সমাধান হবে—এখন সন্মুখে সীমাহীন আকাশের তলে পাষাণের সমুদ্র নিঃসীম পরিচিতি বিস্তৃত করে রয়েছে। সে কপালের ঘাম মুছে সামনের দিকে এগিয়ে চলল।

কিন্তু দূরে—ঐ উত্তর-পূর্ব কোণে ও কি দেখা যায়? শাদা শাল জড়ান তিনটি মোর আকাশের দিকে চেয়ে আছে—ও নিশ্চয় ‘রনডেন’! সাক্ষ্যসূর্য্য দূরে পাহাড়ের চূড়ায় রক্ত ছড়াচ্ছে। আর একটা পাহাড় এই ত—তার চূড়া। তারপর সন্মুখে সেই বড় মালভূমি জলা, উঁচু টিবি, আর পাহাড়ের বুকে ছোট ছোট ‘হ্রদ’। আঃ কি পরিভূষণ!

একি—প্রতি মুহূর্তে তার পদক্ষেপ ক্রম ও লঘু হয়ে উঠছে কেন? তার অজ্ঞাতসারেই সে প্রাণ খুলে গান ধরেছে। যদি যৌবনে ফিরে আসার আর কোন পথ খোলা না থাকত, তা হলে না জানি কি হত—হে ঈশ্বর!

Saeter! একখণ্ড সবুজের ওপর ছোট্ট একটি কুঁড়েঘর। চারিদিকে

বাশের বেড়া—একটা লম্বা গোয়াল ঘর—পালিশ-বিহীন কাঠের তৈরী।
নিশ্চয়ই কোন Saeber ; চুপ্ শোন—কে একজন মেয়ে গাইছে না!
পীয়ার চুপি চুপি গোটের মধ্যে ঢুকে বেড়ার দেওয়ালে কান পেতে
রইল : “শ্রাপ, শ্রাপ শ্রাপ”—পাত্রের মধ্যে দুধ পড়ার শব্দ শোনা
যাচ্ছে—নিশ্চয়ই পরীলোকের কোন তরুণী বসে দুধ দোতন করছে।
এমন সময় গানের সুর ভেসে এল—

“সঙ্কারাণী, রবিবারের সঙ্কারাণী
চিরদিনের—প্রিয়তমা সঙ্কারাণী।”

শ্রাপ. শ্রাপ, শ্রাপ—আবার পাত্রে দুধ দোতনের শব্দ! হঠাৎ
পীয়ারও গান ধরলে—

“দীপ্ত মধুর, নম্র ধূসর, সঙ্কারাণী
হৃগ্ অলকার প্রিয়তমা, সঙ্কারাণী।”

দুধ দোতন বন্ধ হয়ে গেল, জিজ্ঞাসু নেত্রে মুখ ফেরাবার সঙ্গে সঙ্গে
গরুর গলায় ঘণ্টা বেজে উঠল—চঃ চঃ :—একটি মেয়ের কোমল রেশমী
চুলভরা মাথা দরজার মধ্যে দেখা গেল—তারপর মেয়েটি স্বয়ং—
একটি তরী, হাসিমুখী, অষ্টাদশী কুমারী।

“গুড ইভনীং”—পীয়ার করমর্দনের জন্য হাত বাড়িয়ে দিলে।

বালিকাটি মুহূর্তকাল তার দিকে চেয়ে রইল—তারপর নিজের
বেশের দিকে তাকাল—কোন পুরুষ অনুরাগের চোখ দিয়ে চাইলে
যেমন করে বয়স্ক মহিলারা তাদের পোষাকের দিকে তাকায়,—ঠিক
তেমনি করে।

“কে আপনি?”—মেয়েটি জিজ্ঞাসা করে।

“আমাকে একটু ‘ক্রীম পরীজ’ রেখে দিতে পার?”

—“তাহলে আগে দুধ দোয়া শেষ করে নি’।”

এবার পীয়ার তাকে সাহায্য করবার সুযোগ পেলো। গ্যাপশাকটা বের করে হাত ধুল'—সুমিষ্টে বাতাসে টুলের ওপর বসে ব্যস্ততার সহিত চুধ দোহন করতে লাগল। তারপর কুঠার এনে আগুন জ্বালাবার জন্ত কাঠ কাটল। বালিকাটি সর্বক্ষণ তারদিকে চেয়ে আছে, হরত ভাবছে—কে এই মাথা পাগল লোকটি! পরীজ তৈরী হলে, পীয়ার তাকেও তার পাশে বসে খেতে অনুরোধ করলে। তারা অল্প খায় আর শাসে, কথা বলে, আবার খায়—আবার শাসে। তারপর পীয়ার দামেব কথা জিজ্ঞাসা করে।

“তোমার যা ইচ্ছে”—

পীয়ার তাকে ড'ক্রাউন দিল—তারপর মুখ ফিরিয়ে তার ঠোঁটে চুম্বন একে দিলে।

“একি”—পীয়ার যেতে যেতে শুনতে পেল—মেয়েটি বলছে। খানিক-দূর যেয়ে সে পিছন ফিরে তাকাল, দেখল—মেয়েটি দোর-গোড়ায় দাড়িয়ে আছে—চোখের ওপর হাত রেখে—তাকে লক্ষ্য করছে নিনিমেষ নরনে।

“তারপর এখন কোথায়?” রাত্রের পূর্বে নিশ্চয়ই সে আবার লোকালয়ে পৌছাতে পারবে। এত তার বাসভূমি নয়। না—এখানে নয়।

যখন ভূবার-গুদ্র পাহাড়ের নীচে বড় একটি হ্রদের ধারে উপস্থিত হল তখন রাত্রি প্রায় দ্বিপ্রহর। এখানে হ্রদের ধারে কয়েকটা 'Sater' আছে। বনভূমিত ছাঁপ—একট! ছোট গোলাবাড়ী—মনে হচ্ছে কোন শহরবাসীর গ্রীষ্ম-যাপনের কুটীর।

হ্রদের জলে এখনও সায়াহ্নের রক্তিম আভা—যাই যাই করেও এখনও যেতে পারে নি। দ্বীপের দিকে একটা নৌকা আসছে।

হৃদের জলে এখনও সায়াহ্নের রক্তিম আভা—যাই যাই করেও এখনও যেতে পারে নি। দ্বীপের দিকে একটা নৌকা আসছে—দাঁড়ে ছুটি মেয়ে—বাহিতে বাহিতে তারা গান গেয়ে আসছে! তার মনে এক অদ্ভুত ভাবের উদয় হল।—এই খানেই সে থাকবে।

Naotog-কুঁড়ে-ঘরে একজন অস্বাভাবিক মোটা মেয়েমানুষ—এখনি শোবার উপক্রম করছে। তাকে কি সে রাত্রির বাসস্থান দেবে? সে যে বাসস্থানের জন্ম এসেছে—তা সে ভেবেছিল। গড়াতে গড়াতে সে এক ঘরে ঢুকল।

একটি ছোট কক্ষে পীয়ার গুয়ে আছে লেপের তলায়—পাহাড়ী মাদুর। সজ্জা-বোধিত প্রাঙ্গন হতে জুনীফার লতার তাজা গন্ধ আসছে—চারিধারে দেওয়ালে মাখনের কোটা সারি সারি সাজান রয়েছে। আঃ, সে অনেক জায়গায় রাত কাটিয়েছে অনেক ভাবে—সমুদ্রে, লফোটনে, নৌকায়, চলমান উটের পিঠে, জ্যোৎস্নালোকিত প্রান্তরে তাঁবুর মধ্যে আর আরব বজনার প্রাসাদে—যেখানে বামন বারেরা তালপাতার পাখা দ্বারা তাকে গজন করেছে ক্লেণ অপনয়নের জন্ম—তারা তাকে সম্মান করেছে। আর আজ সে এমন জায়গায় স্থান পেয়েছে—যেখানে স্থান পাওয়া সৌভাগ্যের কথা। সে চোখ বুজে নদীর মৃৎ কুলু কুলু গীতি শুন্তে লাগল—ঝাপসা আঁধারে গ্রীষ্মের মৃৎসলিলা স্রোতস্বতা আজ যেন মুখর। শীঘ্রই যুম তাকে অধিকার করল।

পরদিন বিকেলে সে জাগরিত হয়ে দেখল—সেই মোটা মেয়েমানুষটি কফি হাতে ঘরে ঢুকছে। তারপর সব্জ নাল মেশান হৃদের জলে ঝাঁপিয়ে পড়ে স্নান, সাঁতার কাটা—ট্রাউট খুঁজে বের করা—আর লাঞ্চ-এর জন্ম সন্ধ্যা সেকা রুটি, পুরু ক্রাম খাওয়া!

মেয়েমানুষটি বলেছে, সে যে রকম রান্না করে—সেই রান্না যদি তার পছন্দ হয়, তা হলে এখানে সে কয়েকদিন থাকতে পারে। শয্যায় এখনও কোন লোক নেই।

এইভাবে পীয়ার সেখানে থেকে যায়—আর মাছ ধরে। মাছ সে ধরে খুব কমই। কিন্তু দিনগুলি কাটছে বেশ নিশ্চিন্ত আলস্তে। নীলাভ সবুজের আমেজে রঙিন পাহাড় শ্রেণী গ্রীষ্মের উত্তপ্ত মন্থরতায় ঘনায়মান। শীঘ্রই সে জানতে পারলে রীংবী হ'তে আগত ইউথো নামক একজন বণিক তার স্ত্রী ও কন্যাসহ এই দ্বীপে বাস করছে। কিন্তু তাতে তার কি এসে যায় ?

প্রায়ই সে নৌকায় শুয়ে পাইপ টানে—কল্পনার জাল বোনে—মধুর স্বপ্ন আসে যায়। সন্ধ্যার লাল ভলে একখানি নৌকা ভাসছে—নৌকায় একটি তরুণী। দ্বীপের নির্জনতায় নিভৃত মিলন—কেউ জানতে পারবে না। তার ভাগ্যে এরকম কখনও কি ঘটবে ? না কখনও না।

সূর্য অস্ত যায়—'Santor'র যতই নিকটবর্তী হয়, গরুর গলার ঘণ্টার শব্দ ততই স্পষ্টতর হয়ে ওঠে—Santor বাসিকাদের সঙ্গীতময় আহ্বান, গৃহপালিত জন্তুর চীৎকার বাতাসে ভেসে আসে। দূরে পাহাড় শ্রেণী মুক হয়ে দাঁড়িয়ে আছে—তাদের তুষার চূষিত শীর্ষে রক্তের ছোয়াচ লাগে। জ্যোৎস্নালোকিত রাত ধরে ঝরণা ধারা কুলুকুলু গান গেয়ে বয়ে চলে একটানা।

তারপর একদিন সকল দিনের সেরা দিনটি আসে।

সেদিন সে পাহাড়ে ইতস্তত ঘুরে বেড়াচ্ছিল—কম্পাসের সাহায্যে পথ করে এবং ফিরে আসার জন্য পথচিহ্ন ঠিক করতে করতে এগিয়ে চলেছে। সামনেই একটা জলাভূমি—তার চারধারে কালো জামের গাছ। জামের স্বাদ শৈশবের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। সে আরও খানিকটা

এগিয়ে গেল—লাল 'হেথার' বেষ্টিত পাংশুল শৈলমালা—তারপর ওটা কি? ধোঁয়া? সে তাড়াতাড়ি সেইদিকে ছুটে চলল। হ্যাঁ, সত্যিই তাই ধোঁয়া। একটা পাখা পাখা ঝাপটা মেরে সশব্দে উড়ে গেল—সঙ্গে সঙ্গে তার একপাল ছেলেমেয়ে। হায় ভগবান, মাড়িয়ে ফেলবে নাকি? পদদলিত করবার ভয়ে সে পাশ কাটিয়ে রওনা হল। ধোঁয়া নিকটে কোন মানবের অস্তিত্বের কথা জানিয়ে দেয়—হয়ত কোন ল্যাপদলের নিকটবর্তী হয়েছে সে! তার চেয়ে যেয়ে দেখা যাক না কেন? শেষ চূড়াটা অতিক্রম করলে—নাচাই একটা আগুনের চুল্লী। দু'টি মেয়ে উঠে দাঁড়াল। আগুনের ওপর একটা চক্চকে কেটলা—ক'ফি তৈরী হচ্ছে। পাশে তুণ সমাকীর্ণ ভূমিতে কাগজের টেবিলক্লে শ্রানডুইচ, মাখন, চর্কি প্রভৃতি ছড়ান রয়েছে। বিস্ময়ে পীয়ার থমকে দাঁড়ল; মেয়ে দুটি তাকে চেয়ে দেখতে লাগল—সেও। সকলের মুখেই শঙ্কিত হাসি।

অবশেষে পীয়ারই টুপি খুলে রাস্টাড Saeterএ যাবার পথ জিজ্ঞাসা করে। বুঝিয়ে বলতে তাদের খানিকটা সময় কেটে যায়—ক'টা বেজেছে? তারা জিজ্ঞাসা করে। সে খুব ঠিকঠিক বলে, এমন কি মিনিট পর্য্যন্ত—তারপর তাদের ঘড়িটা তুলে ধরে দেখিয়ে দেয়—তারা নিজেরাই পড়ে নিতে পারে। এতে আরও বেশী সময় লাগে। ইতিমধ্যে প্রত্যেকেই পরস্পরকে দেখবার পালা সাজ করে ফেলেছে—কাজেই চলে যাবার আর অত তাড়া নেই। একটি মেয়ে বেশ লম্বা ছিপছিপে, গোলগাল মুখ, আপেলের রং ছোঁয়া—মাথায় বাদামী চুলের গুচ্ছ। ভুরুযুগল খুব কালো, টানাটানা, নাকের ওপর এসে মিলেছে—দেখতে বেশ মনোরম। তার গায়ে নীল সার্জের জামা, স্বার্ট একটু ওপরের দিকে ওঠান—কাজেই পায়ে গোড়ালী স্পষ্ট দেখা যায়। অপর মেয়েটি একটু বেটে ধরণের—হাসলেও তার মুখে সর্বদা কেমন একটা

সকরণ ভাব ভাসতে থাকে। “আচ্ছা”—হঠাৎ সে জিজ্ঞাসা করে—
“আপনার কাছে কি কোন ছুরী আছে?”

“আছে”—পীয়ার তখনই চলে যাবার উপক্রম করছিল কিন্তু এবার থাকবার সুবর্ণসুযোগ পাওয়া গেছে।

“আমাদের একটিন সারডিনস্ আছে, কিন্তু টিন খুলতে পারছি না”—
সুন্দরী মেয়েটি বলে।

“আচ্ছা, আমাকে একবার দেখতে দিন”—পীয়ার বলে। সোঁভাগোর বিষয় টিন খুলতে গিয়ে পীয়ার হাতের খানিকটা কেটে ফেললে—তখন মেয়ে দুটি মিলে জড়াজড়ি করতে করতে কাটা স্থান বেঁধে দিল। শেষে পীয়ারকেও তাদের কফি পার্টিতে আহ্বান করে।

—“আমার নাম মাল্‌ ইউথো”—সুন্দরী মেয়েটি বিনয়ের সুরে বলে।

—“তাহলে লেকের ধারের বাড়ীটা আপনাদেরই?”

“আমার নাম মর্ক—থেয়া মর্ক—আমার বাবা একজন উকীল। লেক থেকে একটু দূরে আমাদের ছোট্ট কুটীর”—করণ চোখে অপর মেয়েটি বললে।

পীয়ার নিজের পরিচয় দিতে যাচ্ছিল এমন সময় তাকে বাধা দিয়ে :
পূর্কের মেয়েটি বললে—“ও, আমরা আপনাকে চিনি—আপনাকে প্রায়ই লেকের জলে নৌকা বাইতে দেখেছি। কাজেই খোঁজ করতে হয়েছে কে আপনি। আমাদের একজোড়া ভাল চশমা আছে।”

“মাল্”—তার বন্ধু তাকে সতর্ক করে দেয়।……“কাল আমাদের একজন মেডকে আপনার গতিবিধি লক্ষ্য করতে পাঠিয়েছিলাম”—

“মাল্, কি সব বাজে বকুছিস?”—

“বেশ আনন্দোজ্জন উৎসব। মেয়ে দুটির বয়স কত অল্প, তারুণ্যপূর্ণ,

একটুতেই হেসে লুটিয়ে পড়ে। তারা তিনজনে অনেকটা রুটি, মাখন কফি খেয়ে ফেলল।

মাল্‌ মাল্‌ মাঝে মাঝে পীয়ারের দিকে আড়চোখে চায় - আর খেয়াল, মাল্‌ যে সব অবাস্তুর কথা বলেছে, তার জন্তু তাকে খুব ভৎসনা করল - সে পীয়ারের দিকে উদ্ভিন্ন চক্ষু মেলে তাকাতে লাগল।

দূরে বহুদূরে পশ্চিমে সূর্য্য একটা পাহাড়ের কাঁধের ওপর ঢলে পড়েছে। সন্ধ্যার সূচনা হচ্ছে। তারা সব জিনিষপত্র জড় করতে লাগল - পীয়ার কাঁধে এক থলে কালো জাম আর এক হাতে একটা পাত্র নিল। “একে আরও কিছু দাও” - মাল্‌ বলে - “তাতে ওর স্বাস্থ্য উন্নতির সুযোগ পাবে। কি বল?”

—“মাল্‌ তুই ভারি পার্জা” - -

—“এই ঠিক হয়েছে” - পীয়ারের আর এক হাতে একটা বাস্তু ঝুলিয়ে দেওয়া হয়।

তারপর তারা পাহাড় থেকে অবতরণ করতে আরম্ভ করে। যেতে যেতে মাল্‌ গান ধরে, শীষ দেয়, লঘু নৃত্যের ছন্দে পা ফেলে। পীয়ারও গান গায় - শেষে তিন জনেই একযোগে সুর ধরে। যখন তারা কোন জলপূর্ণ ছোট ডোবার নিকটবর্তী হয়, তারা কখনই সেটা ঘুরে যেতে চেষ্টা করে না - লাফিয়ে পার হয় - তারপর আবার লাফায় আনন্দের আতিশয্যে। তারা Sactar ছাড়িয়ে জলের ধার পর্য্যন্ত যায়। পীয়ার তাদের নৌকা করে বাড়ী পৌঁছে দেবার প্রস্তাব করে। তারা নৌকায় চড়ে, যতক্ষণ নৌকায় ছিল, ততক্ষণ তারা হেসে গল্প করে কাটিয়েছে - যেন তারা কত যুগের পুরান বন্ধু।

ঠিক কুটিরটির নীচেই নৌকা এসে তীরে লাগে। প্রশস্ত বন্ধু দাড়ি ওয়াল - মাথায় সোলার হ্যাট - এক ভদ্রলোক তাদের সম্বন্ধনা করতে

নেমে আসে;—“ও, বাবা তুমি ফিরে এসেছ”—মার্লে বলে—তারপর একলাফে তীরে উঠে তার গলা জড়িয়ে ধরে।...৬’জনের মধ্যে ফিস ফিস করে কি কথা হয়, তিনি পীয়ারের দিকে তাকালেন, তারপর টুপি খুলে তার দিকে এগিয়ে এসে সসম্মুখে জিজ্ঞাসা করলেন—“আপনি মেয়েদের পার হ’তে সাহায্য করেছেন, ধন্যবাদ।”

—“এঁর নাম পীয়ার হলম, একজন বড় ইঞ্জিনীর ইজিপ্টবাসী”—মার্লে পরিচয় করিয়ে দেয়—“আর ইনিই আমার পিতা।”

—“তা হলে আমরা নিকট প্রতিবেশী”—মিঃ ইউথো বললেন—“এখন চা খাওয়ার সময় হয়েছে, আপনার কাজের যদি ব্যাঘাত না হয়, তাহলে আমাদের সঙ্গে যোগ দিতে পারেন।”

কুটিরের বাহিরে গুহ্রকেশা, পাংশুল মুখ, একজন মহিলা দাঁড়িয়ে আছেন—চোখে চশমা আঁটা। কাঁধের ওপর পুরু উলের শাল, কিন্তু তবুও মনে হয়—শীতে যেন বেশ কাঁবু। “আম্বন”—তিনিও অভ্যর্থনা জানান। কিন্তু পীয়ারের নিকট মনে হল, তাঁর গলাটা একটু যেন কেঁপে গেল।

৬টি ছোট ছোট ঘর, একটি ঘরে আগুনের চুল্লী—চুল্লীর ধারে একটা টেবিল। ঘরে প্রবেশ করেই মার্লে তার অপ্রতিহত রাজ্যভার গ্রহণ করল—ইচ্ছামত ঘরে ঢুকতে আর বের হ’তে লাগল। রান্নাঘর থেকে মাছভাজার শব্দ শোনা যাচ্ছে। কয়েক মিনিট পরে সে এক প্লেট লেটুস হাতে নিয়ে ফিরল।

“দেখুন আপনাকে আকবিয়ান স্যালাড তৈরী করে খাওয়াতে হবে কিন্তু”—মার্লে বলে।

পীয়ার খুব উৎফুল্ল হয়ে ওঠে, বলে—“পারব বলে ত আশা হয়।”

“টেবিলের ওপর নুন, গোলমরিচ, ভিনিগার আছে। মশলা বলতে

আমাদের ঐ সব। যাক্ তাহলে আজকে সত্যসত্যই আরবিয়ান শালাড খাওয়া যাবে”—এই বলে সে বের হয়ে যায়—পীয়ার শালাড তৈরী করতে লেগে যায়।

“আপনি নিশ্চয়ই আমার মেয়েকে ধরা করবেন”—কইউথো তার দিকে ফ্যাকাশে মুখ ফিরিয়ে চশমার ভেতর দিয়ে চাইতে চাইতে বললেন—
“ওকে যতটা চঞ্চল দেখছেন ততটা চঞ্চল ও নয়।

ইউথো পীয়ারের সঙ্গে গল্প করতে করতে ঘরের মধ্যে পায়েচারা করতে লাগলেন—ইজিপ্টের সম্বন্ধে বহু কথা জিজ্ঞাসা করলেন। তিনি মাধি, জেনারেল গর্ডন, খারটুম, খেদিভ আর সুলতানের মধ্যে জটিল অবস্থার কথা কিছু জানেন। কারণ খবরের কাগজের তিনি একজন ধৈর্যশীল পাঠক। পীয়ার শীঘ্রই আবিষ্কার করলে যে তিনি র্যাডিকেল পার্টির লোক এবং দলের একজন নামকরা পাণ্ডা। তাঁর দুই রক্ত চক্ষু হতে যেন আগুনের হলকা বেরিয়ে আসছে—তাঁর চাহনিতে এই ভাবটি সুপরিষ্কৃত; অত্যাচারীর আর রক্ষা নেই—পীয়ারের তাই মনে হয়।

তারপর সাক্ষ্যভোজন। পীয়ার লক্ষ্য করে দেখল, মালের যতই তার সঙ্গে হাসিঠাট্টা গল্পগুজব করছে ততই তার মায়ের মুখের উদ্বেগ ও হতাশার মেঘ কেটে যাচ্ছে। সেই বিশীর্ণ গণ্ডদেশে যেন একটু রক্তিম আভা দেখা দিল। চশমার পেছনের চোখ দুটি মেয়ের নিকট হাতে ধার করা আনন্দালোকে ঝক ঝক করছে। কিন্তু তার পিতা এসব কোন কিছুই লক্ষ্য করলেন না—তিনি সর্কক্ষণ সুলতান আর খেদিভের সম্বন্ধে একটানা বকতে লাগলেন।

বহু বৎসর পরে এই আবার প্রথম নরওয়ের কোন বাড়ীতে সে আহার করছে। কি সুন্দর! তারও কি এমনি একটি সংসার হয়

না? ভোজনের পর ম্যাগুলিন। আগুনের চুল্লীর ধারে সবাই গোল হয়ে বসল। তারপরে গান আর বাজনায দার্ব সময় কেটে যায়। শেষে মাল্‌ উঠে তার মাকে স্বরণ করিয়ে দেয়—“মা, তোমার শোবার সময় হয়েছে যে।”

—“হ্যাঁ বাছা”—সম্মতিসূচক নিরীহ উত্তর আসে। ফু, ইউথো “শুভরাত্রি”—জানায়। মাল্‌ হাত ধরে তাঁকে নিয়ে যায়, হঠাৎ বলে—“থেয়াকে নিশ্চয় নৌকা করে বাড়া পৌঁছে দিচ্ছেন।”

“নিশ্চয়ই” - উত্তর আসে চটপট।

কিন্তু যখন তারা দু'জনে নৌকার উপর উঠেছে, তখনই নৌকা ছাড়বে—ঠিক সেই সময় মাল্‌ও দৌড়াতে দৌড়াতে সেখানে এসে উপস্থিত, বলে—সেও তাদের সঙ্গে যাবে। আধঘণ্টা পরে থেয়াকে তাব বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে মাল্‌ আর পায়ার ফিরে এল। নির্জন নিশীথে হৃদের জল বয়ে চলে, আলো আর অন্ধকার মিলে হৃদের বুকে কেমন একটা মায়ার সৃষ্টি করেছে। মাল্‌ গলুইএ হেলান দিয়ে দাঁড়াল—একটা গাছের ডাল হাতে জল ছুঁয়ে আছে—নির্ঝাক। পায়ার দাঁড় বরল, তারপর নৌকা ছেড়ে দেয়।

“কি সুন্দর!”—পায়ার আরম্ভ করে।

কিশোরী মাল্‌ মাথা উঠিয়ে চারিদিকে কি দেখে নিলে, তারপর ধীরে ধীরে বলল—“হ্যাঁ”। তার গলার স্বরে কেমন যেন একটা নূতন সুরের আমেজ লেগেছে—পায়ার লক্ষ্য করে। অন্ধপ্রহর অনেকক্ষণ কেটে গেছে। গাছপালা কুটির আবছায়া লাল আলোকে নিঃসাড় হয়ে পড়েছে। হৃদের জলে ট্রাউটের খেলার অনেকক্ষণ ছেদ পড়ে গেছে। তাদের গলা আর দেখা যায় না—শুধু মাঝে মাঝে বগ্নুকুটের ককণ কণ দূর বনানী হতে ভেসে আসে।

—“আপনি কি মনে করে এখানে ছুটি কাটাতে এসেছেন, আমার ভারী আশ্চর্য্য ঠেকছে।”

—“আমি ভাগ্যবাদী; ফ্রোকেন ইউথো। ভাগ্যই আমাকে এখানে চালিত করে এনেছে। দেশের যেখানেই যাওয়া যায় কি শান্তি! নরওয়েতে ফিরে আমার কত আনন্দ—”

—“কিন্তু বাড়ী ফিরে এসে আপনি হয়ত এখনও সকলের সঙ্গে—ধরুন মা বাবার সঙ্গে দেখাই করেন নি’—”

“আমি—আপনার কি মনে হয় আমার মা-বাবা আছেন?”

“কিন্তু অণু নিকট সম্পর্কীয় আর কেউ—ধরুন এই ভাই বোন?”

“হায় যদি থাকতো! আর না থাকলেও চলতে পারে।”

মাল্ পীয়ারের দিকে সন্ধানী দৃষ্টিতে চায়—তার কথার আন্তরিকতা বুঝতে চেষ্টা করে যেন। তারপর বলে—“জানেন আপনার আসার আগে মা আপনাকে স্বপ্নে দেখেছিলেন।”

—“আমাকে?”—পীয়ারের চক্ষু বিস্ফারিত হয়ে ওঠে—“তিনি আমার স্বপ্ন দেখেছিলেন?”

বালিকার মুখে হঠাৎ রক্তের ছোঁয়াচ লাগে—সে মাথা নাড়তে থাকে—“আপনাকে এখানে বসে এসব কথা বলা নিছক পাগলামি। আপনার বিষয় জানবার জন্ম এই কারণেই এত ব্যগ্র হয়ে উঠেছিলাম এবং আজ আমার মনে হচ্ছে যে আপনার সঙ্গে আমার পরিচয় বহু কালের—”

—“আপনার ভিতর দেখছি সব সময় একটা আনন্দধারা প্রবাহিত”—

—“আপনার এরকম ভাববার কারণ? বুঝেছি। দেখুন প্রয়োজনের তাগিদে মানুষ সব কিছুই করতে পারে।”

—“এমন কি, এই রকম আনন্দেরও সৃষ্টি করতে পারে?”

সে ঘাড় ফিরিয়ে তীরের দিকে তাকাল। রাত্রির নিশ্চলতা তাদের ক্রমশ চুপকৈর মত একদিকে টানছে; তাদের মুখের কথা কেড়ে নিলে। তারা কেবল মাঝে মাঝে পরস্পরের দিকে চেয়ে হাসে।

“এক আশ্চর্য্য প্রাণীর সঙ্গে দেখা হয়েছে”—পীয়ার ভাবে। মালের বয়স কুড়ি একুশ হবে। মাথা নত করে সে বসে আছে, রক্তিম অধরে কেমন একটা আবেশের ভাব—অদ্ভুত স্বপ্নের আনন্দে বিভোর। হঠাৎ তার দৃষ্টি পীয়ারের ওপর পড়ে স্থির হয়ে রইল।

পীয়ার লক্ষ্য করে তার মুখটি বেশ বড়, ঠোঁট দুটিতে ঘেন আবির্ভাব হোঁয়।

—“আপনার মত সারা পৃথিবী ভ্রমণ করতে আমার ভারী ইচ্ছে হয়”—হঠাৎ সে বলে!

—“আপনি কি কোন দিন নরওয়ের বাইরে যান নি”?—পীয়ার জিজ্ঞাসা করে।

“আমি মাত্র একবার বার্লিনে শীত কাটিয়েছিলাম—আর দক্ষিণ জার্মানীতে কয়েকদিন। দেখলেন ত বেহালা একটু বাজাতে পারি—আমার ইচ্ছে খুব ভাল বাজাতে শিখি। তারপর বাহিরে গিয়ে নামটাম—”

—“নিশ্চয়ই, কেন করবেন না”—

কয়েক মিনিট সে কোন কথা বললে না, তারপর আবার আরম্ভ করলে—“আমি বলে রাখছি একদিন আমার নাম শুনতে পাবেন। মা’র এখন একটু মাথার গণ্ডগোল।”

—“প্রিয় ফ্রোকেন হে—”

—“যখন তিনি বাড়ীতে থাকেন, আমার কাজ—হাসিমুখে থেকে ভাকে একটু আনন্দের ভাগ বণ্টন করা।”

ঠাং পীয়ারের ইচ্ছা হল উঠে গিয়ে বালিকার হাত দু'টি নিজের হাতের মধ্যে চেপে ধরে। কিন্তু সে করুণ হাসি হেসে তার দিকে তাকাল—দীর্ঘক্ষণ দু'জনে দু'জনের দিকে চেয়ে রইল—মালেক দৃষ্টি ফিরিয়ে নিতে ভুলে গেল।

—“না এবার আমাকে নামতে হবে”—অবশেষে সে বলে।

—“এত তাড়াতাড়ি। এখনও ত ধরতে গেলে কোন কথাই বলা হয়নি।”

—“না, না, আমাকে—আমাকে যেতে হবে”—সে পুনরুক্তি করল।

তার গলার স্বর স্নেহ কোমল হলেও আদৌ আশাপ্রদ নয়।

পীয়ার একাকী Saeterএর দিকে ফিরে চলেছে। যেতে যেতে সে মালেককে লক্ষ্য করতে লাগল। মালেক বাড়ীতে পৌঁছে প্রথম পেছন ফিরে তাকাল, হাত নেড়ে তাকে বিদায় জানাল।

অনেকক্ষণ সে তার দিকে চেয়ে দরজার কাছে দাঁড়িয়ে রইল। তারপর দরজা খুলে ভিতরে অদৃশ্য হয়ে গেল। পীয়ার দরজার দিকে আরও কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইল, যদি আবার সে ফিরে আসে। কিন্তু সজীবতার কোন পরিচয় আর পাওয়া গেল না।

দূর পাহাড় শ্রেণীর মাথায় সূর্যের রক্ত-রেখা দেখা যাচ্ছে—উত্তর পূর্বের শুভ্র শৈল শিখর প্রভাতের আলোর পরশে জ্বলজ্বল করছে। পীয়ার হাল ছেড়ে দিয়ে হাতের ওপর মাথা এবং কনুই পায়ের ওপর রেখে বিশ্রাম করতে লাগল। আজ তার কি হয়েছে?

দূরের পাহাড়শ্রেণী তাকে একাকী স্কন্ধ রেখে কেন এত উদাসীন, নিরপেক্ষ হয়ে রয়েছে! একি তার কানে এ কিসের শব্দ ধ্বনিত হচ্ছে—এ নূতন স্বপ্নদনের অর্থ? সে হাত দু'টি পাঞ্জা বন্ধ করে মাথার তলায় দিয়ে সটান গুরে পড়ল নৌকার ওপর—নৌকা ভেসে চলে আপনার ইচ্ছাক্রমে।

উদীয়মান রবিরশ্মির হ'এক বলক তার মুখের ওপর এসে পড়লেও সে উঠলে না—শুধু মাথাটাকে একটু সরিয়ে নিলে।

আলোর বন্যা অজস্র ধারায় ঝরে পড়ুক তার চোখে মুখে। আর মাল্‌ও ত এখন ঘুমের কোলে শায়িত। প্রভাতের আলো জানলা গলে ঘরে ঢুকেছে—ঘুমের মধ্যে কাকে সে স্বপ্ন দেখছে!

এরকম ভুরু কি কেউ কখন দেখেছে? ঐ কপোলে চুষনের আলপনা এঁকে দেওয়া—তার মস্তকটিকে আলিঙ্গনে বেঁধে ফেলতে..... তোমার মাকে রক্ষা করবার জন্য নিজের স্বপ্ন তুমি বিসর্জন দিয়েছ। তার নিশ্চিন্ততাকে জ্যোতির আলোকে উষ্ম করবার জন্যই বৃষ্টি তোমার মাঝে এত আনন্দের উৎস? এই কি তোমার স্বরূপ?

মাল্‌—এমন নামটি কেউ কখনও শুনেছ? তোমার নাম কি মাল্‌?

দিন—আকাশে বাতাসে ব্যাপ্ত ছোট বড় নৈশমেষগুলিকে সোনার সোনার বিমণ্ডিত করে দিচ্ছে। এখনও সে শুয়ে আছে, দোলা দিচ্ছে, তাকে দোলা দিচ্ছে—এবার আর নেকের জল নয় এবার শদায়মান আবর্তসকুল সমুদ্রের তরঙ্গের পর তরঙ্গ।

এতদিন তুমি যন্ত্র ইম্পাত আর আগুন নিয়ে ব্যস্ত ছিলে। আরও জ্ঞান চাই—জ্ঞান চাই—সব কিছু জানতে—সব কিছু অধিকার করতে তুমি চেয়েছিলে। ইতিমধ্যে বন্দনার সুর হারিয়ে গেছে—অসীমের প্রতি আকাঙ্ক্ষা নিরন্তর দুর্নিবার হয়ে উঠছে। তুমি ভেদেছিলে, নরওয়ে তোমাকে এমনি ভাবে আকর্ষণ করেছিল—এখন ত নরওয়েতে এসেছ। খেমেছে কি সে আকর্ষণ?

মাল্‌—তোমার নাম মাল্‌?

প্রেমের প্রথম দিনের সঙ্গে তুলনা করবার মত কিছুই পৃথিবীতে নেই।

তোমার সকল জ্ঞান, ভ্রমণ, তোমার সকল কাজ, সকল স্বপ্ন—এতদিন যে শুধু জ্বালানী কাঠ সংগৃহীত স্তম্ভীকৃত করেছে—তার মতই সব নিরর্থক। এখন একটা অগ্নিস্থলিঙ্গ কোণা থেকে এসে উড়ে পড়েছে—এবার সব পুড়ে ছাই হয়ে উঠবে। তোমার ঠাণ্ডা হাত সেই আগুনে গরম করে নাও—নূতন আনন্দের শিহরণে কেঁপে ওঠ—নূতন আশীর্বাণী ঝরে পড়ছে এই পৃথিবীর ওপর।

এতদিন যা তুমি শিখতে পারনি—ওপরের ঐ শক্তি ও সীমাহীন অসীমতার সঙ্গে আত্মার অনন্ত শিখার কি মধুর সম্বন্ধ—হঠাৎ তার অর্থ তোমার সম্মখে প্রকটিত হয়ে উঠেছে, তাই তোমার অন্তরে এত চঞ্চলতা।

তাকে হাত ধরে নিয়ে জীবনদেবতার সম্মখে দাঁড়াতে হবে, বলতে হবে,—“এই যে এসেছি আমরা হুঁজনে—এই সে আর আমি—আমরা হুঁজনা”...তারপর গানের একটা সুর বাতাসে ভাসিয়ে দেবে, তার সঙ্গে লুসির বেহালার একটা বাক্সার—সে সুর সঙ্গীত কোন গীর্জায় নয়, অনন্ত শূন্য পরিব্যাপ্ত করে থাকবে। এবার তোমায় বুঝেছি স্বর্গের দেবতা—তোমার শক্তি কি? সে শক্তি আমি কি করে বুঝব, যে ঐ দূর আকাশে বসে শুধু পাপ আর দয়া নিয়ে খেলা করে—এবার তোমায় আমি চিনেছি—তুমি আর সে রক্তপিপাসু ‘জিয়োভা’ নও তুমিই জাতির উৎস—তোমায় দেখছি আমি যুবকের মূর্তিতে, তোমার মাথার সোনালী চুলের গুচ্ছ।

আমরা হুঁজনে তোমায় বন্দনা করব—কোন বন্দনা গানের সাহায্যে নয়—সঙ্গীতের সুরে—যে সঙ্গীত বিশ্বসংসার প্লাবিত করে দিতে পারে। আমাদের সব শক্তি, সব রক্ত, সব ধ্যান-ধারণা সেখানে বাস করবে। এবং প্রত্যেকেরই থাকবে একটা নিজস্ব স্বাতন্ত্র্য—সেই বিশ্ব সঙ্গীতে—তার নিজের বিশিষ্ট সুর। ঐ যে প্রভাত সোনার আলোয় বলমল

করছে—সেও আমাদের। আর ঐ যে উত্তরের পাহাড়ে একটা ছাগল চরে বেড়াচ্ছে পূর্বের দিকে মুখ ফেরায় আর তীব্র কিরণচ্ছটায় ঝলসে যায়—সেও আমাদের। আমাদের সব, ঐ যে সত্ত্ব জাগরিত পাখীর দল—একটা বাণ্ড তার বাসা থেকে হামাগুড়ি দিয়ে বেরিয়ে এসে প্রভাতের সৌন্দর্য্যে বিশ্বয় বিমূঢ় হয়ে থমকে দাঁড়িয়েছে—সেও আমাদের। সোনার গলাবন্ধওয়াল ঐ পোকাটি, ঘাসের ডগা আর যে শিশিরকণা সেখানে মুক্তার মত ঝলমল করছে, আকাশকে যতখানি পেরেছে নিজের মধ্যে ধরতে চেষ্টা করেছে—সেও আমাদের। প্রেমের আলোক ছোঁয়া প্রথম দিনটিতে আমরা এসে পৌঁচেছি—আজ আর সংশয়, দ্বিধা, সঙ্কোচের কারণ নেই এখানে। আমাদের অঙ্গুরের সোনার সমুদ্র হ'তে সঙ্গীতের ধারা করে পড়ুক আকাশে বাতাসে।

'Saoterএর' মধ্যে প্রাণের সাড়া জেগেছে—সঙ্গীতমুখরিত প্রতিধ্বনি ভেসে আসে, 'Saoter'-বালিকা তাদের গৃহপালিত জন্তুদের ভৎসনা করতে থাকে—তারা মগ্ন গতিতে উত্তরের পাহাড়ের দিকে চলেছে হাঙ্গা রবে—গলার ঘণ্টা বাজছে একটানা সুরে। লেকের জলে পীয়ারের নৌকা ডেয়ারী মেডের দৃষ্টি আকর্ষণ করল—নিশ্চয়ই কোন বিপদ ঘটেছে।

“মাল্‌—নিশ্চলভাবে শুয়ে শুয়ে পীয়ার ভাবে—“তোমার নাম মাল্‌ ?”

ডেয়ারী মেড তখন জলের ধারে নেমে এসে নৌকার দিকে চীৎকার করে ডাকতে শুরু করে দিল। এইবার নৌকার লোকটি উঠে বসে চোখ রগড়াচ্ছে।

“ধন্যবাদ—দয়াল ঠাকুর তোমার ধন্যবাদ”—সে বলে—“তুমি এখানে সারারাত পড়ে আছ, বাড়ী যাওনি ?”

পা ভাঙ্গা একটা ছাগল বাড়ীর প্রাঙ্গনের চারিধারে নিজের ইচ্ছামত চরে বেড়াচ্ছে। পীয়ার তাকে কোলে নিয়ে খানিকক্ষণ ঘুরে বেড়াল—সে কিন্তু নিৰ্ঝিবাদে তার দাড়ি চিবুতে লাগল। তারপর প্রাতরাশের টেবিলে বসে মাখন, ছানা রুটি কফিতে এমন কিছু লক্ষ্য করলে যা খেতে একজনের হৃদয়টাকে পাষণ করতে হবে। প্রোড়া স্ত্রীলোকটি যখন তাকে বললে, পীয়ারের উচিত তার নিজের জন্ম খাবার সংগ্রহ করা—পীয়ার লাফিয়ে উঠে তাকে দীর্ঘ আলিঙ্গনাবদ্ধ করলে। মহিলাটি নিজেকে মুক্ত করতে চেষ্টা করে।

তারপর পীয়ার তার কপোলে সশব্দে চুষনের একটি ছাপ এঁকে দিলে—স্ত্রীলোকটি তাকে মারলে একটা ধাক্কা। “গত রাতে এ লোকটির কি মাথা খারাপ হয়ে গেছে নাকি?”

রীংবী একটা বড় লেকের ধারে অবস্থিত—ব্যবসার বড় কেন্দ্রস্থল । পঞ্চাশ বছর আগে এখানে ছিল মাত্র কয়েকটা খাতার কল আর জল-প্রপাতের সাহায্যে চালিত একটা ময়দার কল—কিন্তু এই পঞ্চাশ বছরের মধ্যে নগরটি গড়ে উঠেছে । আর আজ আধুনিক রানের বহু ফ্যাক্টরী নদীর ধার পর্য্যন্ত বিস্তৃত । এই নগরে চার সহস্র লোকের বসতি । নগরের নিজস্ব একটা গীর্জাও বিরাট স্কুল আছে—এছাড়া মজুরদের হলে রংয়ের বরগুলি শহরের সর্বত্র ইতস্তত ছড়ান । তাছাড়া রাংবী সাধারণ ছোটখাট সংসারের মতই । দুজম নামজাদা ব্যবহারজীবী এই শহরে বাস করে—আইন সংক্রান্ত ব্যাপার নিয়ে তাদের মধ্যে প্রতিযোগিতার শেষ নাই । আর দুটা মাসিক পত্রিকা আছে, তাদের সম্পাদকদেরও ঝগড়া রোজই “কনসিলিয়েশান বোর্ড”কে মিটমাট করতে হয় । এছাড়া একটা টেমপারেন্স লজ, শ্রমিক সঙ্ঘ, ছবির মিউজিয়াম আছে । প্রতি রবিবার সন্ধ্যায় রীংবীর লোকেরা তাদের স্ত্রীর হাত ধরে এই নদীর ধারে হাওয়া খেতে বের হয় । এই সময় তারা প্রায়ই ফ্রককোট পরে—মাথায় দেয় ফেন্ট হ্যাট, কিন্তু ট্যানার এনেব্যাক কঁজো বলে সিন্ধের হ্যাট পরে—অস্তিত তাতে তাকে একটু লম্বা দেখায় ।

শনিবারের সন্ধ্যায় যখন আঁধার জমাট বেঁধে আসতে থাকে, তখন শহরের যুবকেরা গুদামঘরের চারিপাশে সমবেত হয় সাপ্তাহিক ঘটনার সমালোচনা করতে ।

“শুনেছ নূতন খবর”— ব্যাঙ্ক ক্যাশিয়ার তার বন্ধু টেলিগ্রাফিক্টকে জিজ্ঞাসা করল ।

“খবর ? এই অভিশপ্ত নরকে আবার খবর কি ?

“মাল্ ইউথো পাহাড় থেকে ফিরে এসেছে—তার বিবাহের সম্বন্ধ পাকা হয়ে গেছে জান ?”

—“সত্যি নাকি, বৃদ্ধ কি বলে ?”

—“কাঠের মিলগুলি নিজ আয়ত্তের মধ্যে আনবার জন্য বৃদ্ধ একজন ইঞ্জিনীরর চায়—”

—“তা লোকটি কি ইঞ্জিনীরর ?”

—“ইজিপ্টের । মুসলমান বোধ হয় । কালোজামের মত গায়ের রং, ব্যাটা টাকার কুমীর ।”

—“ফ্রোকেন বল, তুমি শুনেছ এ খবর ! দাঁড়াও একটু—খুব ভাল খবর আছে !”

যে মেয়েটিকে উদ্দেশ্য করে পূর্বোক্ত কথাগুলি বলা হয়েছিল, সে মুখ ফিরিয়ে খেমে তাদের আলোচনায় যোগ দিল ।

“সেই পুরানো খবর বুঝি—যা নিয়ে সারা শহরে সাড়া পড়ে গেছে । কিন্তু যাই বল ছেলোট খুব সুন্দর ।”

“সী”—টেলিগ্রাফিষ্টের মুখ দিয়ে একটা অস্ফুট ধ্বনি বেরিয়ে এল । পীয়ার ঠিক তখনই গ্র্যাণ্ড হোটেল থেকে ফিরে আসছিল—পরনে ধূসর স্ফুট—হাতে কালো একটি কোট । সমবেত সমালোচকদের জনতার পাশ দিয়ে যাচ্ছিল যেন হাওয়ার ভর দিয়ে, তখন তার মুখে একটা সন্তু-ধরান সাঁগার । কিছুদূর যেতেই মাল্‌র সঙ্গে তার দেখা হয়ে গেল । সে তার হাত ধরল । তারপর দু’জনে চলে গেল । যুবকেরা তাদের লক্ষ্য করতে লাগল ।

“কবে বিয়ে হবে ?”—টেলিগ্রাফিষ্ট জিজ্ঞাসা করে ।

“যত শীঘ্র হয় ততই ভাল, হবু বরের নিশ্চয়ই এই মত”...ফ্রোকেন

বল বলে—“কিন্তু মতফন না এন্‌গেজমেন্টের খবর আসছে. ততদিন অন্যদের মত তাদেরও অপেক্ষা করতে হবে।”

লরেঞ্জ ডি ইউথোর লম্বা হলদে রঙের কাঠের দাড়ী ঠিক বাজারের সামনেই অবস্থিত। নীচের তলার লৌহব্যবসায়ীদের আফিস, আর উপরের তলার তার। সকালে দান করে লোকেরা প্রায়ই বলার করে—“ঐ তার বাড়ী”—প্রশ্ন বক্ষ. শাদা দাড়িওয়ালা ভদ্রলোকটা মখন রাস্তা দিয়ে যায়, তখন লোকেরা তাকে দেখিয়ে বলে “ঐ সে যার।” তাহলে কি সে এত বড়লোক! যদিও তার বাতীর কল, মেশিনের দোকান, ময়দার কল, শহরের বাইরে ও গ্রামে একখানা বাড়ী আছে—তবুও তাকে পন্থী বলা যার না। কিন্তু তাকে দেখলে মনে হয়, ক্যাপ্টেন বা প্রফেসর। স্ত্রীপুত্রদের সে ঘৃণা করে। গভীর দার্শনিক তত্পূর্ণ বই সে পড়ে—রবিবারের সকালে গীর্জায় যাওয়া নিষিদ্ধ—বয়সনের সঙ্গে তার একবার দেখাও হয়েছিল। তাকে নিজের দলে পাওয়া খুব ভাল—কিন্তু বিপক্ষের দলে থাকলে বিনাশ অবশ্যস্বার্থী—এমন কি শহর ছেড়েও তোমাকে পালাতে হতে পারে। প্রত্যেক ব্যাপারেই তার হাত আছে—যেন নগরটাই তার।

একবার রাস্তায় একটি যুবকের সঙ্গে দেখা হয়—কন্ঠিনকালেও সে যুবকটিকে চেনে না—তবুও সে তাকে বলেন—“দেখ বাবা তুমি ঐ মেয়েটিকে বিয়ে কর, বুঝেছ!” কিন্তু যাই বল, এত থাকতেও লরেঞ্জের কোন কিছুতেই শাস্তি নেই। সত্য বটে রীংপীতে বলতে গেলে সেই সবার দলপতি। কিন্তু তার ইচ্ছা হচ্ছে, এর চেয়ে শতগুণ বড় স্থানের সে দলপতি হবে।

এখন সে একজন উপযুক্ত জামাই পেয়েছে—তাই সে বিরাট বিশ্ব ছেড়ে এই অপরিচিত যুবকের চারিপাশে ঘুরছে নিঃশব্দে—তার শক্তি

পরীক্ষা করছে—মনে মনে জিজ্ঞাসা করে—কে তুমি? কি দেখছ? কি
তুমি পেয়েছ? তুমি চলিছ না স্থিতিস্থাপক? আমি এখানে যা করেছি,
তার প্রতি কি তোমার শ্রদ্ধা আছে—না, এসব দেখে তুমি হাসছ—
প্রবছ আমি এই পুঁটিমাছের দলে একটি তিমির মত।

প্রতিদিন সকালে হোটেলে ঘুম ভাঙতেই পীয়ার চোখ রগড়াতে
আরম্ভ করে। পাশেই টেবিলের ওপর একটি মেয়ের ফটোগ্রাফ। এই
কি তুমি—তুমিই শেষে তোমার পাশে দাঁড়াবার জন্য সঙ্গী খুঁজে বের
করেছ। পৃথিবীতে তাহলে তোমার জন্য ভাববার লোকও আছে।
তোমার একটু সদি হলে, অনেকেই এখন তোমার শারীরিক অবস্থা,
কুশল প্রশ্ন করবে? শেষে তোমার ভাগ্যেও এই ঘটেছে।

প্রতিদিন দ্বৈপ্রহরিক আহারটা ইউথোদের বাড়ীতেই সমাধা হয়,
তার খাবারের প্লেটের পাশে এখন ফুল সাজান থাকে। মাঝে মাঝে
একটু বৈচিত্র্যও দেখা যায়—একটা রুপার চামচে, ফর্ক অথবা তোয়ালের
কাণ্ডে তার নামের প্রথম অক্ষর লেখা থাকে। এ যেন নীড় রচনা
রচনা করার প্রথম খড়কুটা, আর সেই পাণ্ডুর বৃদ্ধা তার চশমার
মধ্য দিয়ে এমন করুণভাবে তাকায়, যেন বলতে চায়—“ওকে তুমি
আমার কাছ থেকে নিয়ে যাচ্ছ সত্য, কিন্তু তোমায় আমি ক্ষমা করলাম।”

একদিন সে হোটেলে বসে পড়ছিল, এমন সময় মালে এসে
উপস্থিত।

—“চল একটু বেড়িয়ে আসি”—মালে জিজ্ঞাসা করে।

—“বা চমৎকার আইডিয়া! কোথায় যাবে আজ?”

—“আমরা কিন্তু আজও রুসেথে আন্ট ম্যারিটের সঙ্গে দেখা
করিনি। আমাদের সেখানে যাওয়া উচিত। তোমায় আজ সেখানে
নিয়ে যাব।”

পীরারের নিকট এ রকমভাবে নবীন আত্মীয়ের বাড়ীতে জমকাল ভাবে বেড়াতে যেতে বেশ আমোদ লাগে—এমনভাবে খুড়োখুড়ীর সন্ধান করে বেড়ান! আজ ওত একজন নবীন আত্মীয়। বেশ, কেন যাবে না?

—“কিন্তু মালো, তুমি এতক্ষণ নিশ্চয় কাঁদছিলে?”—হঠাৎ পীরার প্রশ্ন করে—তার হাত দুটি নিজের হাতের মধ্যে টেনে নেয়।

“না না, এ কিছু না। এম যাওয়া যাক”—পীরার চুমো দিতে এগিয়ে আস্তে সে তাকে সরিয়ে দেয়। কিন্তু পরমুহূর্তে সে একখানি চেয়ারে বসে পড়ে—অর্কনিমীলিত নেত্রে চিন্তিত ভাবে তার দিকে চেয়ে থাকে, অশ্রু অশ্রু মাথা অন্দোলিত হয়—যেন নিজেকে সে নিজেই জিজ্ঞাসা করছে—‘কে এই ব্যক্তি, কাকে আমি আমার সঙ্গী করে নিচ্ছি? একপক্ষ আগে সে আমার কাছে সম্পূর্ণ অপরিচিত ছিল।’

সে হাতখানি কপালের ওপর রাখলে—“মার জগুই” বলল।

—“কেন আজকে গুরুতর কিছু ঘটেছে নাকি?”

—“তুমি আমাকে একমুহূর্তের নোটিশে বিরাট বিশ্বে টেনে নিয়ে যাচ্ছ বলে মা ভয়ানক ভয় পেয়ে গেছে।”

—“কিন্তু আমি ত তাঁকে বলেছি, বর্তমানে আমরা এই খানেই থাকব।”

বালিকার মুখের এক কোণে হাসি ফুটে উঠল—চোখের পাত ভখনও বন্ধ।

—“তারপর আমার কি হবে! কয়েক বছর এখানে থেকে অসীম পৃথিবীতে কাঁপিয়ে পড়তে হবে।”

—“আর আমি বুঝি বাড়ীতে থাকতে ভালবাসি না!”

পীয়ার হাসতে হাসতে বলে,—“নিজের একটি বাড়ী—পরিবার থাকা কত মধুর, কি শান্তি ও সুন্দর !”

—“কিন্তু আমার কি হবে ?”—

—“তুমিও সেখানে থাকবে—তোমাকে থাকতে দেব আমার সাথে”—

—“নাঃ তোমার বুদ্ধিসুদ্ধি সব গুলিয়ে গেছে। যৌবনের সব চেয়ে শ্রেষ্ঠ দিনগুলি এই গহ্বরের মত স্থানে কাটান যে কি—তা তুমি যদি জানতে। তাছাড়া সঙ্গীতে আমি হয়ত কিছু করতে পারতুম।”—

“তা হলে সর্বপ্রকারে বিদেশে যাওয়াই বুদ্ধিসঙ্গত”—পীয়ার ভুরু কুঁচকে বলে যেন হাসতে চায়।

“কি বলছ তুমি আজ ! জান এখন মাকে ছেড়ে কোথায়ও যাওয়া অসম্ভব। তুমি কিন্তু খুব প্রয়োজনীয় মুহূর্তে এসেছ। কারণ, তখন আমি আন্তরিক ইচ্ছা করছিলাম, কেউ যদি এসে আমাকে নিয়ে যায় দূর দূরান্তরে।”—

“ওঃ তাহলে আমি বুঝি তোমার বিদেশযাত্রার টিকেট মাত্র”—সে এগিয়ে এসে তার নাকের ওপর একটা চিমটি কেটে দিল।

“দেখ ভবিষ্যতে সাবধান হবে বলে দিচ্ছি—জান এখনও আমি বিয়েতে মত দিই নি।”

—“দাওনি ! একরকম ত তুমিই আমাকে বলেছ ।”

মাল্লে দুহাত একত্রিত করে—“কি নির্লজ্জ বেহায়াপনা। আমি দিনের পর দিন—”না না বলেছি—কখনও না—বলেছি—শতবার প্রায় অস্বীকার করেছি, আর তুমি বলেছ—তাতে কিছু এসে যায় না। তোমাকে মত দিতেই হবে।”

ঠিক পরমুহূর্তেই সে তার কোলে ঝাঁপিয়ে পড়ে। কিন্তু পীয়ার চুমো দিতে চেষ্টা করতেই তাকে ঠেলে সরিয়ে দিলে।

“—না—না কখন না! ভেব না ওর জন্য আমি গলা জড়িয়ে ধরেছিলাম।”

তারপর তারা হাত ধরাধরি করে ক্রমেতে তাদের জ্যাঠাইমার বাড়ীর পথ ধরল। সেপ্টেম্বর মাস—বনভূমিতে হালদের আমেজ নেগেছে—শশ্রক্ষত্র সোনালী আভায় দেদীপ্যমান—জামগুলা রক্তের মত লাল হয়ে উঠেছে। কিন্তু বাতাসে এখনও গ্রীষ্মের আভাস পাওয়া যায়।

—“না, তুমি বড় তাড়াতাড়ি হাঁট”—মালের খেমে পড়ে শান্তভানে।

গেটের কাছে পৌঁছে তারা রাস্তার ধারে ঘাসের উপর বসে পড়ল। নীচেই শহর—ছাদের পর ছাদ, কলের লম্বা লম্বা পাইপ—লকের স্বচ্ছজলে তাদের প্রতিবিম্ব...

“জান কি ভাবে ঘটেছিল—মা’র এমন?”—হ্যাং মালের জিজ্ঞাসা করে।

—“না, আমি জানতে চাইনে।”

সে একটা ঘাসের ডগা তুলে নিয়ে দাঁতে চেপে ধরল।

“মা’র বাবা একজন পুরোহিত ছিলেন। কিন্তু বাবা মাকে চার্চে যেতে নিষেধ করেছেন। এর পর থেকে মা’র আর ঘুম হয় না, খালি মনে হয়—তিনি যেন নিজের সন্তাকে বিক্রী করে দিয়েছেন।”

“তোমার বাবা কি বলেন?”

—“বাবার মতে এ হিষ্টিয়া। হিষ্টিয়া হোক না হোক মা’র রাতে ঘুম হয় না।”

—“অবশেষে মা’কে দূরে একটা বাড়ীতে নিয়ে যাওয়া হয়”—

—“হতভাগিনী”—পীয়ার মালের হাত ধরে।

“সেখান থেকে ফিরে আসার পর মা’র এমন পরিবর্তন হয়ে গেল, চেনাই যায় না। বাবাও একটু নমিত হয়ে পড়লেন, শেষে বললেন—

“বেশ তুমি যদি চার্চে যেতে চাও ত যেতে পার, কিন্তু আমি তোমার সঙ্গে যাব না।” তারপর মা আমার হাত ধরে চার্চে গেলেন। কিন্তু দরজার কাছে পৌঁছতেই যখন অর্গানের সুর ভেসে এল, মা মুখ ফিরিয়ে বললেন—“না দেবী হয়ে গেছে। মালেক ফিরে চল।” তারপর থেকে তিনি আর কখনও গীর্জায় যান নি।

“সই থেকেই বুঝি তাঁর স্বভাব এই রকম অদ্ভুত হয়ে উঠেছে?”

মালেক দীর্ঘশ্বাস ফেলল—“সব চেয়ে খারাপ হয়েছে মা এমন সব কাণ্ডের চিত্র দেখেন! তিনি বলেন, এ সব হেসে উড়িয়ে দিতে হবে, কিন্তু তিনি নিজেই হাসতে ভুলে গেছেন। কাজেই আমাকে হাসতে হয়। কিন্তু আমি যখন তাঁর কাছ থেকে চলে আসব -ওঃ ভাবতেই পারছি না।”

সে তার বুকের মধ্যে মুখ লুকাল—পায়ার আশু আশু তার চুলের মধ্যে আঙ্গুল বুলিয়ে দিতে লাগল।

“আচ্ছা পায়ার বলত”—সে একটু হেসে জিজ্ঞাসা করে—“কে ঠিক মা না বাবা?”

—“তুমি কি এই জটিল ধাঁধার উত্তর খুঁজে বেড়াচ্ছ?”

—“হ্যাঁ, কিন্তু এত জটিল যে, কোন সম্ভব উত্তর পাওয়া অসম্ভব। তোমার কি মনে হয়? তোমার কি মত?”

তারা দু'জনে সেখানে বসে রইল। শরৎকাল—পায়ারের বুকে মালেক মাথা রেখে শুয়ে আছে। কেন সে বয়োজ্যেষ্ঠদের মত বাজে কথা বলবে তার প্রশ্ন এড়িয়ে যাবে?

“তোমার চেয়ে অবশ্য আমি খুব ভাল জানিনে। এক সময় ছিল, যখন আমিও ভগবানের রূপ দেখতাম—এক হাতে লৌহ দণ্ড আর এক হাতে তাঁর অমৃত—ঠিক শান্তি আর পুরস্কারের প্রতীক। তারপর

তাকে সরিয়ে দিলাম নিজের জীবন থেকে—কারণ তিনি ণায় বিচারক নন। একদিন সে আমার জীবন থেকে একেবারে মুছে গেল। মিলিয়ে গেল ওপরের ঐ সীমাহীন শূন্যতার—নীচের ঐ পৃথিবীর সহস্র জীবন লীলায়। এর কাছে আমার জীবনের স্বপ্ন সুখ দুঃখের কি মূল্য? কোথায় আমি চলেছি? সদাসর্বদা কে যেন আমার মধ্যে বলছে—‘সে আছে—আছে!’”

“কিন্তু কোথায় সে? তোমার জানার জিনিষের বাহিরে—ঐ ত ঐখানে সে থাকে। সেইজন্য আমি পড়তে আরম্ভ করলাম—অনেক পড়লামও, কিন্তু কি আমি জেনেছি? ষ্ট্রাম আমার একদিন আমার মাথার খুলি চুরমার করে দেবে—বিজ্ঞান, শিক্ষা, সংস্কৃতি কি শক্তি দিয়েছে আমার দেহে? একটা পিপীলিকা বা একটা মৌমাছির জীবন যেমন একটা আকস্মিক দুর্ঘটনা ব্যতীত আর কিছুই নয়, আমার জীবন—সেও কি ঠিক তাই? আমার মধ্যে কি কোন মহত্ত্বের সম্ভাবনা নেই? আমি বিলীন হয়ে গিয়ে শুধু সামান্য একটু পদচিহ্ন রেখে যাব? কি উত্তর দেবে এর, মালের তোমার কি মনে হয়?”

মালের নিশ্চল হয়ে নিমোলিত নয়নে লঘু নিশ্বাস ফেলতে থাকে। তার পর আবার সে হাসতে শুরু করে—তার অধরের লালিমা ফিরে আসে।

ক্রমে একটা প্রকাণ্ড গোলাবাড়ী—শহরের চেয়ে একটু উঁচু স্থানে অবস্থিত। বাগান, এভিনিউ—শাদা বাড়ীর চারিদিকে লম্বা বারান্দা। আর দূরের ঐ লোক আর গ্রামের দৃশ্য কি সৌন্দর্য্যে মহীয়ান হয়ে ওঠে। ড'জনে গেটের কাছে এসে পেছন ফিরে দাঁড়িয়ে রইল।

মালের জ্যেষ্ঠাই-মা—তার বাবার বোন—একজন স্বামীহীনা নারী; খুব ধনী, নামজাদা ম্যানেজার—একদিন দয়ার অবতার আর একদিন নিশ্চয় পাষণ। তার জীবনের সবচেয়ে বড় দুঃখ তার নিজের কোন

ছেলেমেয়ে নেই। কিন্তু এখনও কে সম্পত্তির অধিকারী হবে ঠিক হয়নি।

যে ঘরে তারা দু'জনে অপেক্ষা করছিল, হাসতে হাসতে তিনি সেখানে এসে উপস্থিত হলেন। পীয়ার দেখে—একজন গুলকেশা, তামাটে রঙের পূর্ণগঠিতা, দীর্ঘাঙ্গী মহিলা তার দিকে এগিয়ে আসছে। এই তোমার জ্যেষ্ঠাঠাইমা, প্রতিহিংসাপরায়ণা—পীয়ার মনে মনে ভাবে। তিনি গায়ে জড়ান নীল এ্যাপরনটা খুলে ফেললেন—এবার কাল উলেন গাউন বেরিয়ে এল—গলায় সোনার চেন, কানের ইয়ারীংও সোনার।

“যাক অবশেষে তোমরা আবার এসেছ”,—তিনি আরম্ভ করেন—“আমার অস্তিত্বের কথা একদম ভুলে গিয়েছিলে, না মাল্?” তিনি পীয়ারের দিকে ফিরে তাকে নিরীক্ষণ করতে লাগলেন—“তা হলে তুমিই পীয়ার! তুমিই মাল্কে পাকড়াও করেছ। দেখছ, প্রথম সাক্ষাতেই তোমাকে আমি পীয়ার বলে সম্বোধন করছি—যদিও তুমি আরাবিয়া থেকে এসেছ। বস, বস।”

মদ এল। ক্রসেথের জ্যেষ্ঠাঠাইমা তাদের অভিনন্দন করে এক গেলাস ভুলে নিয়ে আরম্ভ করলেন—“তোমরা ঝগড়া করবে, কিন্তু দেখ যেন মাত্রাধিক্য না বটে। আর দেখ, পীয়ার হলম, তুমি যদি মাল্‌র সঙ্গে ভাল ব্যবহার না কর, একদিন সকাটবে। আমি গিয়ে তোমার কান দুটি আচ্ছা করে মলে দেব।—সুখে থাক সব।”

দু'জন পরস্পরের হাত ধরে বাড়ির পথে ফিরে চলল—সারা পথ তারা খালি গান গেয়েছে। তখনও তারা শহর থেকে কিছু দূরে—হঠাৎ মাল্‌ থেমে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিলে—“ঐ দেখ—মা!”

একজন নির্জনতা বিলাসী মহিলা ঘনায়মান সায়াহের অন্ধকারে চারিদিকে দেখতে দেখতে ঝড়ের মধ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। মনে হয় তিনি

যেন বহু সমস্যার সমাধান করার উপায় খুঁজে বেড়াচ্ছেন। এক সময় তিনি ওপরের আকাশের দিকে তাকান, আর একবার শহরের দিকে, চলমান নরনারীর দিকে। তারপর তাঁর মাথা আন্দোলিত হ'তে থাকে—কোন স্তূরে তিনি যেন অবস্থান করছেন—মাঃষের ক্রিয়াকলাপের নিকট তিনি যেন সম্পূর্ণ অপরিচিত। এখন তিনি ওকি দেখছেন—কি তাঁর চিন্তা ?

“চল যাওয়া বাক্” মালের পীয়ারকে আকর্ষণ করলে। তারপর হঠাৎ সে গান ধরে যেন তার মধ্যে আনন্দের বান ডেকেছে। পীয়ার বুঝতে পারলে, এ তার মার জন্য। হঠাত সেই নারী এখন অন্ধকারে তাদের দিকে চেয়ে হাসছে মৃদু মৃদু।

একদিন রবিবারের প্রভাতে মালের বাদামা রংয়ের বড় বোড়ায় টানা হাক্কা গাড়ীতে চড়ে হোটেল এসে উপস্থিত। পীয়ারও এসে গাড়ীতে উঠে বসল; লাগাম মালের হাতে। আঃ তারা ফোর্টের ধারে তার বাবার জমিদারী পরিদর্শন করতে যাবে—এক সময় সেখানে কাউন্ট, গবর্নর, সরকারী দপ্তরখানা কত কি ছিল।

সেপ্টেম্বরের শেষশেষি। দিনগুলি এখনও আতপ্ত, কিন্তু হৃদের জলে পরিপূর্ণ ধূসরতা। মাঠের ধান কাটা শেষ হয়েছে। এখানে ওখানে ছ'একটা আলুর ডগা খননের অপেক্ষায় রয়েছে। দূরে পাহাড়ের পাদ-মূলে ঘোড়া ঘাস খাচ্ছে—মাঝে মাঝে ঘাড় নাড়ে যেন—“আজ যে রবিবার সে কথা সে জানে”—এই বলতে চায়।

একটা আবছা পাংলা কুরাসার পর্দা এখনও এখানে সেখানে মাঠের মধ্যে ভেসে বেড়াচ্ছে।

তারা বনের মধ্যে দিয়ে চলল এবং অপর পাশে এক অভিনিউতে এসে পৌঁছল—রাস্তার ড়'ধারে এ্যাশ গাছের সারি—গাছের সারির

পর একটি বড় বাড়ী—বাড়ীর ছড়ায় একখানি নিশান উড়ছে পং পং করে। বড় শাদা বাড়ীটা খুব উঁচু—যেন পৃথিবীর ওপর দৃষ্টি বুলিয়ে নিচ্ছে। লাল গোলাবাড়ীগুলির তিনদিকে উঠান আর এক দিকে বাগান—তারপর মাঠ—মাঠের পর হ্রদ—অনেকটা ষ্টেটের মত দেখতে।

“এ জায়গার নাম কি?”—পীয়ার জিজ্ঞাসা করে।

“লোরেঞ্জ।”

“কার জায়গা?”

“জানি না”—সশব্দে মাল্লে ঘোড়াকে এক চাবুক বসালে। পর মুহূর্তে ঘোড়াটা এভিনিউএব মধ্যে ঢুকে পড়ল—পীয়ার যন্ত্রচালিতের মত লাগাম চেপে ধরে।

“এই ব্রাউনি—কোথায় চলেছ?”

“কেন, একবার উঠে দেখ না কোথায় চলেছি”—মাল্লে প্রত্যুত্তর দেয়।

“কিন্তু আমরা তো তোমার বাবার জমিদারী দেখব বলে বেরিয়ে ছিলাম।”

“তা হলে এটাই সেই”—

পীয়ার বিস্ফারিত নেত্রে মাল্লে'র দিকে চেয়ে লাগাম ছেড়ে দিল।

“কি কি - তোমার বাবা এই জায়গার মালিক?”

কয়েক মিনিট পরে তারা নীচু ছাদওয়ালা ঘরের মধ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছে দেখা গেল। সমস্ত বাড়ীটা এখন খালি—বেলিফ্ চাকরদের আস্তানায় বাস করছে। পীয়ার আরও বেশী উৎসাহী হয়ে উঠল। এইখানে এই বড় হলঘরটায় পুরান গভর্ণরদের সময় কত উৎসব হয়ে গেছে—ইউনিফর্ম পরা সৈনিক—জামায় সোনার ঢুমকী বসান সন্ত্রাস্ত মহিলাদের কর চুহন করছে—পুরান ম্যাহাগনি...হাসি ঠাট্টা—সব একমুহূর্তে পীয়ারের মানস

নেত্রে ভেসে ওঠে। বার বার সে মালেককে দৃঢ় আলিঙ্গনাবদ্ধ করে মনের আবেগের মুক্তি দিতে লাগল। “আর মালেক দেখ—এ ঠিক রূপ কথার গল্পের মত।”

তারা পুরান পরিত্যক্ত বাগানে এসে উপস্থিত হল—পথের ওপর বাস গজিয়ে গেছে—পূর্ণ পরিপূর্ণ মাছের পুকুর, নুয়ে পড়া প্যাভেলিয়ান চারিদিকে ছড়ান—পীয়ার ইতস্তত ছুটাছুটি করতে লাগল। এখানে একদিন মহা উৎসব হয়েছিল—রংবেরংএর ঝাড়াগঠন চতুর্দিক আলোকিত করেছিল—প্রিয়তমারা হৃৎগুণের অন্তরালে প্রণয় নিবেদন করেছে তাদের প্রিয়তমাদের কানে।

“মাঝে তুমি না একদিন বলেছিলে তোমার বাবা এসব বিক্রী করে দেবেন?”

—“হ্যাঁ, আমার ত তাই মনে হয়। এখান থেকে ভাল অর্থাগম হয় না। তাছাড়া নিজে যখন এখানে থাকবেন না, তখন কে এসব তদ্বতলাসী করবে?”

“ষ্টেটের এতে কি কাজ হবে?”

“কাজ - তা হয়ত নিশ্চয়ই কোন বোকাদের গারদ তৈরী হবে।”

পীয়ার আনন্দের উত্তেজনায় লাফাতে লাগল। “মালেক বরং তুমি আর আমি এখানে থাকব!” মালেক ঘাড় ফিরিয়ে তার দিকে তাকায়। “মালেক তোমায় আমি জিজ্ঞাসা করছি, তুমি এখানে থাকবে কিনা। বল?”

“এখন এখানে দাঁড়িয়ে উত্তর দিতে হবে নাকি?”

“হ্যাঁ নিশ্চয়ই—কারণ এক্ষণি এখানে দাঁড়িয়ে এটাকে আমি কিন্ত চাই।”

“বল, তুমি না—”

“মাল্‌ একবার চেয়ে দেখ ঐ ব্যালকনির দিকে—ডোরিক কলাম—
এর মধ্যে কোন খাদ নাই—সব আসল জিনিষ, রাজপ্রাসাদ—এসব
আমি ভাল করে চিনি।”

কিন্তু এ কিনতে অনেক টাকা লাগবে পীয়ার”- তার গলার স্বরে
অনেকটা নিষ্ঠুর অনিচ্চার ভাব প্রকটিত হয়ে উঠল। সে কি তার
বেহালার কথা ভাবছে! এখানে শিকড় গাড়তে সে কি অনিচ্ছুক?

“অনেক টাকা? তোমার বাবা কতায় কিনেছিলেন?”

“জায়গাটা নিলামে বিক্রী হয়েছিল—তাই তিনি সস্তায় পেয়েছিলেন।
তদুপে আমার মনে হয়, হাজার ক্রাউন লেগেছিল।”

পীয়ার আবার বাড়ীর দিকে গেল। “না—জায়গাটা কিনতেই হবে।
নাড় রচনা করবার এই ত সুযোগ্য স্থান! ঘোড়া, গরু, ছাগল, কুটীর—
কি চমৎকার!”

মাল্‌ ধীরে ধীরে তাকে অমুসরণ করল। “কিন্তু পীয়ার, মনে রেখ
তুমি এই মাত্র শহরে কলকজার দোকানের ভার নিয়েছ।”

“পুঃ”—পীয়ার উপহাসের ভঙ্গিতে বলে—“তুমি কি মনে কর আমি
সে দোকান চালিয়ে এখানে বাস করতে পারব না। চল মাল্‌ চল”—
সে তার হাতে ধরে আবার ঘরের মধ্যে ঢুকল।

একে বাধা দেওয়া বৃথা। সে তাকে কক্ষ হতে কক্ষান্তরে ঠেলে নিয়ে
যেতে লাগল।

“এইটে হবে খাবার ঘর—ওইটে অভ্যাগতদের জন্মে—ওটা হবে
পড়ার ঘর আর এইটে ব্যবহৃত হবে প্রসাধনের জন্মে—চল, কালই
ক্রিষ্টিয়ানিয়াতে গিয়ে আসবাবপত্র সব কিনে আনা যাক।”

মাল্‌র হাঁপ ধরে এসেছে। পীয়ার ভাবছে—আসবাবপত্র সব
সাজান, কেনা হয়ে গেছে। একজন গৃহশিক্ষয়িত্রী পাওয়া গেছে—

একটা উৎসব চলেছে। বল নাচ হচ্ছে। সে একখানি হাত মালের কোমরে দিয়ে নাচতে শুরু করে দিয়েছে—মালের ও যেন তার উত্তেজনায় অভিভূত হয়ে পড়েছে। একদিন বিরাট বিশ্বে ঝাঁপিয়ে পড়ে যে জয়ের স্বপ্ন সে দেখেছিল, মালের সেই স্বপ্ন যেন এই নির্জন কক্ষে চরম সফলতার রূপান্তরিত হচ্ছে। এই তার নাড়! তার নতুন জীবনের উদ্বোধন! সে নিশ্বাস নিতে খানিকক্ষণ স্থির হয়ে রইল।

সেদিন সন্ধ্যায় পীয়ার হোটেলে বসে নোট বুকে খরচের খসড়া প্রস্তুত করল। লোরঞ্জ সে কিনে ফেলেছে। তার শপ্তর খুব ভাল লোক, তিনি যে টাকায় কিনেছিলেন—পীয়ারও সেই দরেই পেয়েছে। এ সম্পত্তিটা তিরিশ হাজার ক্রাউনে মটগেজ আছে—তাতে কি! সব মানিয়ে নেওয়া যাবে—পীয়ারের বেশী টাকা কার্ডিন্যাও ইলম কোম্পানীতে খাটছে।

কয়েকদিন পরে পীয়ার মালেকে শহরে নিয়ে এল—লোরঞ্জকে সাজাতে ছুতার আর পেন্টার লেগে গেছে।

একদিন ক্রিশ্চিয়ানিয়ার হোটেলে সে একাকী বসে আছে—মালের বাজার করতে বের হয়েছে। এমন সময় দরজার প্রচণ্ড দাক।

‘আসুন’—পীয়ার আহ্বান করল।

একজন মধ্যবয়সী লোক ঘরে ঢুকল—বয়স তিরিশ বা তার কিছু বেশী। একটা কালো ফ্রক কোট—হলটলে ভেঁটে পরা। কালো চুলগুলি বেশ ভাল করে আঁচড়ান, লাল হাসি-খুশী মুখ—চোখের তারা অসম্ভব রকম নীল—লোকটার মুখে হাসি যেন লেগেই আছে।

“আমি জুর্নায়র ইউথো—মালের ভাই”—নমস্কার করে সহাস্রবদনে সে বলল।

“ও তাই নাকি!”

“ম্যানচেষ্টার থেকে এইমাত্র আসছি—কি বিশী সমুদ্রভ্রমণ। থাক্ থাক্, আমি বসছি” —সে একটা চেয়ারে বসে পা টেবিলের ওপর তুলে দিল।

পীয়ার মদ আনতে পাঠাল—এক ঘণ্টার মধ্যেই তাদের বন্ধুত্ব জমে গঠে। জুঃ ইউথার জীবনী ও আদালত বলা হয়ে গেল, সে বাড়ী থেকে পালিয়ে গিয়েছিল—কারণ সে থিয়েটার করতে চায়, কিন্তু বাবা দেবেন না। তখন এদেশে বেশী থিয়েটার ছিল না—সেজগৎ সে নিজেই একটা দল গড়ে তোলে। বর্তমানে ইংলিশ টুইডস বিক্রী করার জন্য এজেন্সি নিয়েছে। স্বাধীনতা তার জীবনের মূলমন্ত্র—স্বাধীনতা সর্বত্র—যেখানে সেখানে সে ঘুরবে। পিতামাতা—কারুর অধীনতা স্বীকার করতে হবে না।

এক সপ্তাহ পরে রাংবীতে, লরেঞ্জ ডি ইউথের বাড়ীর সামনের রাস্তায় লোকের লোকারণ্য—দেখা গেল। সকলেরই দৃষ্টি লাল আলোর সারির দিকে নিবিষ্ট। আজ এই বাড়ীতে উৎসব আছে। মাঝরাত্রে একখানি গাড়ী এসে উপস্থিত হল। “ঐ বর আসছে”—কে একজন বলে উঠল—“ঐ ঘোড়াটা ডেনমার্ক থেকে এসেছে।”

গেট খুলে গেল, সুসজ্জিত একটা গুল্মমূর্তি বেরিয়ে এল—“ঐ কনে” ভীড়ের মধ্যে শোনা গেল। তারপর গায়ে কালো কোট মাথায় সিল্কের টুপি একজন ছিপছিপে লোক এল—“ঐ বর,” তারা দু’জনে একত্রে চলে গেল। “হিপ-হিপ-হিপ”—সেই ইংলিশ টুইডের এজেন্ট চীৎকার করে উঠল—আর সঙ্গে সঙ্গে “হুররা” বলে সমবেত জনতা তাদের অভিনন্দন জানাল।

গাড়ী চলেছে—পীয়ার বসে আছে—তার পাশে নব পরিণীতা বধু। নদীর ধার ঘেঁসে ঘোড়া ছুটেছে ঢলকি চালে তার গৃহের দিকে রাজ-প্রাসাদে নৃতন অনাধাদিত ভবিষ্যতের পানে।

লোরেঞ্জো একটি উকোথুফ্কা শাদা দাড়িওয়ালা লোক উদ্দেশে দাঁড়িয়ে করাত দিয়ে কাঠ কাটছে। বহুদিন যাবৎ সে এই কাজ করছে এক এক জনের পর একজন প্রভু এসেছে—চলে গেছে কিন্তু এই বেঁটে লোকটির তাতে কি “এসে যার? সন্ধ্যায় সে চাকরদের আস্তানার একটি গহ্বরে ঢুকে পড়ে আহারের সময় সে সর্বশেষ শূন্য স্থানে পাত পেড়ে বসে—যেন তার জন্ম চারিটি খাবার সর্বদাই অবশিষ্ট থাকে। তার অধুনাভন প্রভু হচ্ছে হনম, একজন ইঞ্জিনিয়ার—বেঁটে লোকটি চোখ পিট পিট করে তাকে দেখে নিয়ে আবার কাজ করতে লেগে যায়। যদি কেউ এসে বলে—“তোমার আর দরকার নেই তুমি এবার চলে যাও”—সে অমনি কালার ভান করে যেন কিছুই শুনতে পায়নি। খাড খাড—শেডে তার কাঠ-কাটা চলছে অবিরাম। প্রত্যেকেই এই শব্দ শুনতে এত অভ্যস্ত হয়ে গেছে যে, দেওয়ালের ঘড়িতে টিক টিক শব্দের মত কেহই আর এতে কর্ণপাত করে না।

রান্নাঘরে জানালার ধারে ছুটি মেয়ে দাঁড়িয়ে বাগানের মধ্যে উঁকি দিচ্ছে আর হাসছে। “আবার সে এসেছে”—লরা বলল—“সী আর অত জোরে হেস না—ঐ যে আবার সে থেমেছে।”

—“একটা পাখীর মত শিস দিচ্ছে”—ডলিয়ানা উত্তর দেয়—“বোধ হয় ও নিজের সঙ্গে কথা বলছে। ওর মাথায় বোধ হয় একটু ছিট আছে।”

—“চুপ—গিন্নিমা শুনতে পাবে।”

ইনিই সেই লোরেঞ্জোর প্রভু যার আচার ব্যবহার এদের হাস্যরসের

খোরাক জুগিয়েছে। পারার—পারার এই পরিত্যক্ত বাগানের মধ্যে ইতস্তত ঘুরে বেড়াচ্ছে—এই হাত নীকার-বোকারের পকেটে তোকান ; টপিটা পিছনে ফোমান—এই খাম:স, এই হাঁটছে—যখন যেরকম মর্জ্জি গাই করছে। এক সময় সে একটা গানের সুর ভাঁজতে থাকে—তারপরই আবার শিস দিতে আরম্ভ করে। কখনও বা একটা গাছের ডাল ভেঙ্গে নিবিষ্ট মনে তা পরীক্ষা করতে থাকে, আবার হয়ত একটা পাখী, হয়ত বা কোন বৃদ্ধ পরিত্যক্ত আপেল বৃক্ষ তার দৃষ্টি আকর্ষণ করে, সে খেমে পড়ে। কিন্তু আসল কথা হচ্ছে সে তার নিজস্ব—এই বাড়ী, বনভূমি—অক্টোবরের ধূমায়িত আলোকে যা বোধ পোহাচ্ছে—এ সবেই মালিক আজ সে। এ কি নন ? ঐ যে দূরের পাহাড়—তারই পাদমূলে গভীর লেকের স্বচ্ছ জল—আর তাঁর ঐ পাহাড় শ্রেণী অপূর্ণ রংএ বঞ্জিত হয়ে গেছে—হলুদ বরণ আর সবুজ পত্র—ফিকে লাল, গাঢ় লাল, সোনালী লাল, রক্তের মত ঘন লাল আর তার মধ্যে পাইন বৃক্ষের গাঢ় সবুজ। এই সমস্ত সে দেখছে ? সত্যই কি এখানে সে বাস করে ? তার চারিদিকে এ কি পূর্ণতার সমারোহ ? কি উদার আকাশ—এত লাল যেন মনে হয়, বেজে উঠবে এখন। আলুর ডাঁটাগুলো উৎপাটিত অবস্থায় মাঠময় ছড়ান রয়েছে। শস্যপুঞ্জ নিরাপদে গৃহে নিয়ে আসা হয়েছে। সেইখানে সে দাঁড়িয়ে রইল। সে যেন যা দেখছে তার প্রত্যেকটি হতে শক্তি সংগ্রহ করছে—পান করছে তৃষ্ণার্তের মত। মনের শূন্যতা ভরাট হয়ে উঠেছে—মাঠের কমনীয় সৌন্দর্য্য তার মনের উপর প্রভাব বিস্তার করে তাকে অর্পণ করছে—নিজস্ব পূর্ণতা, অচঞ্চল প্রশান্তি।

তারপর ?

তারপর—সে মনে মনে পুনরুল্লেখ করল। বাগানের পথে

পায়চারী করতে করতে তাকে উঠতে লাগল। তারপর—তারপর আর কি? এখন কি সে একটু বিশ্রাম করতে পাবে না? প্রত্যেক মানুষেরই একটা শেষ পরিণতি থাকে—সেই নির্দিষ্ট স্থানে পৌঁছানর জন্তই সে চেষ্টা করে। তার উদ্দেশ্য কি? সে किसের জন্ত শ্রম করছে? সেই আশ্রয়নে থাকার কঠিন দিনগুলি হতে আজ পর্যন্ত সে किसের আশায় ঘুরে বেড়াচ্ছে? মাকে মাকে মনে হয়, আপনা হতেই সব জিনিষ ঘটে চলেছে নির্বিঘ্নরূপে। যেন একদিন সে বিশ্বসঙ্গীতের সুরের সঙ্গে সমতা রাখতে পারবে! কিন্তু সে কি তার স্বাদ পায়নি? আরও বেশী সে কি চায়? নিশ্চয়ই প্রার্থিত বস্তু সে লাভ করেছে

কিন্তু তাহলে এই কি সব? এর পরে আর কি কিছু আছে? চুপ! আর প্রশ্ন নয়? হোমার চারিদিকে সৌন্দর্যের যে ছড়াছড়ি তার দিকে চেয়ে দেখ। এখানে শান্তি—শান্তি—পূর্ণ বিরাম। তাড়া-তাড়ি সে ঘরের দিকে ছুটে চলে—দ্রুত নুকের মতো পোলে হয়ত এত প্রশ্নের সমাধান হতে পারে! তাকেও সঙ্গে করে বেড়ালে মন্দ হয় না।

মালেক তখন ভাঁড়ার ঘরে—গারে একটা বড় এ্যাপরন—সেলুফে আচারের শিশি সাজাতে বাস্তু। “এই যে—তুমি এখানে?” পায়ার বাহুবন্ধনে তাকে বেঁধে ফেলে—“চল একটু বেড়িয়ে আনি।”

—“এখন? গৃহিণীর কি বেড়ান ছাড়া আর কোন কাজ নেই? আঃ লাগে! চুলগুলো কি ছিঁড়বে নাকি!”

পায়ার তার হাত ধরে জানানার ধারে নিয়ে গেল—ওদের দিকে দেখিয়ে বলল—“চল এখানে যাই, কি সুন্দর?”

—“এখানে আসার পর থেকে তুমি আমাকে ওখানে যেতে অস্বস্তি কুড়িবার বলেছ।”

—“তা ঠিক, কিন্তু তুমি ও একবারও তার উত্তর দাও নি। এক

বারও বাহুডোরে আমার দোরে বলনি- তুমি কত সুখী। এমন কি, তুমি নিজের ইচ্ছায় আমাকে একবারও তুমু দাও না।”

“তুমি মখন চুরি করে এত জিনিস নাও. তখন তোমাকে কিছু দেওয়া আমি উচিত মনে করি না।” এটি বলে সে তাকে ঠেলে তার বাহুবেষ্টন হতে নিজেকে মুক্ত করে ঘরের বাইরে চলে এল—
“আজকে একবার মা’কে দেখতে যেতে হবে।”

—“নিশ্চয়ই”—সে ঘরে পায়েচারি করতে লাগল—প্রতি পদক্ষেপে মনের অস্থিরতা প্রকটিত হয়ে উঠেছে। “মার কাছে—মার কাছে। কেবল চিরদিন মার কাছে যাব—আর কোথাও নয়।” সে শিব দিতে লাগল।

মালের দবজায় মাথা রেখে জিজ্ঞাসা করলে—“আচ্ছা তোমার কি এত অবসর সময় আছে?”

—“হ্যাঁ—না, আমাকে এখন সব আনাচ-কানাচ দেখতে হচ্ছে। কিন্তু যাই খুঁজি, পাচ্ছি না। একটা আমি কি যে খুঁজছি তার স্বরূপও ঠিক ধরতে পাচ্ছি না। হ্যাঁ, ঠিক বলেছি আমার পূর্ণ অবসর।”

—“কিন্তু কার্মের কি ব্যবস্থা হ’ল?”

—“কেন, গোয়াল ঘরে ডেরারা মেট রয়েছে—আস্তাবলে সহিস—মজুর, টেনান্টদের কাছ থেকে টাকা আদায় করবার জন্য বেগিফ নিযুক্ত রয়েছে। আমার দেখবার আন কি আছে? চারিদিকে কেবল ‘পোক’ করে বেড়াতে হবে।”

—“আর কলকারখানার দোকানটা?”

—“সেখানে দিনে দুবার যাচ্ছি—সাইকেলে চড়ে কি রকম কাজকর্ম চলছে দেখছি। কিন্তু সেই মানেজার খুব কন্ঠ গায়নিষ্ঠ ইঞ্জিনিয়ার ভদ্রলোক।”

—“তুমি ত তাকে সাহায্য করতে পার !”

—“তাকে রেল লাইনের কাজ করতে হয়—বুঝেছ ? বছরে চার পাঁচ হাজার টাকা আয়।”

—“তুমি বিজনেসটাকে আরও বাড়াতে পার ত !”

পীয়ারের নেত্র বিক্ষারিত হয়ে ওঠে—তৎসঙ্গে ওষ্ঠদ্বয়।

—“বাড়ান—বাড়ানর কথা বুঝেছ ? একটা পুতুলের ঘর বাড়াতে হবে !”

—“তোমার হাসা উচিত নয় পীয়ার—বাব এর জন্য বথেষ্ট খেটেছেন।”

—“তোমারও তা হলে আর আমাকে “কাজ কর, কাজ কর” বলে খোঁচান উচিত হয় না। একদিন হয়ত আমি আবিষ্কার করে ফেলব—লাঙলটানা এবং অন্য অস্তিত্বের কথা ভুলে যাওয়াই হচ্ছে সুখী হবার একমাত্র পন্থা। একদিন এ রকম করতেও পারে—কিন্তু তার আগে আমাকে একটু নিশ্বাস প্রশ্বাস নেবার অবকাশ দাও—আমাকে একটু ভালবাস। আচ্ছা এখন আসি।”

মালের ভাড়ারে কাজ করতে করতে দেখলে, স্বামী তার আস্তাবলের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল।

প্রথম প্রথম সে তার সঙ্গ নিত আর পীয়ার হাসিগুখে ঘুরে বেড়াত—তার সমস্ত সম্পত্তির চারিপাশে। হয়ত গোয়ালে সে গাভী গুলোর পিঠে গলায় হাত দিয়ে আদর করে অথবা ছেলেমানুষের ভঙ্গিতে মালেকে বলে—“দেখছ, মালেক, এসব আমার গরু। ‘সল’ আমার। এটার নাম ‘ডাগ্রস্’—এটাও আমার। সবগুদ্র চল্লিশটা আছে—চল্লিশটাই আমার। আর বাছুরগুলো—ওগুলোও আমার। কি চমৎকার দেখতে—ওই রকম আটটা আছে। এই সব আমার—তোমারও নিশ্চয়। কিন্তু তুমি ওদের একটুও দেখ না—কোন দিন

একটাকে একটুও আদর পর্য্যন্ত করনি। ভূমি ভাবতে পার মালের যে—একজন খুব গরীব লোক হঠাৎ একদিন সকালে উঠে যদি দেখে রাজ-ঐশ্বর্য্য পেয়েছে—তাহলে, যাক, এই বুড়াটাকে একটু আদর করবে এস।” কিন্তু এর পরের ঘটনা মালের খুব ভাল করেই জানা। পীয়ার বারে বারে আপনাকে আনন্দে উত্তেজিত করে তোলে। কিন্তু মালের? তার প্রতিবারই মনে হয়—এ নিছক কোতুক। কতবার হয়ত এমন হয়েছে যে, মালের অন্তরে অন্তরে স্বামী-প্রেমে ক্ষুধার্ত হয়ে উঠেছে আর স্বামী তার স্ত্রীর একটু আলিঙ্গনের জন্য লোভাতুর হয়ে রয়েছে,—হঠাৎ স্বামীর মুখ চেয়ে তার মনের সমস্ত কামনার আঙুন তরল হয়ে যায়—তারপর সে তাকে প্রত্যাখ্যান করে কেন এমন হয়? এ আচরণ কেন সে করে? তার ত মনের উদ্দেশ্য ঠিক এই নয়?

হয়ত স্বামীর গভীর ব্যক্তিত্ব ও প্রতিভা স্ত্রীর সমস্ত অন্তরটুকু জয় করে নেবে—এই ভয়ে স্ত্রী থাকে সর্বদা সন্তুষ্ট হয়ে। স্বামীর বাহুবেষ্টনে হয়ত হারিয়ে যাবে স্ত্রীর সত্তা, তার অন্তরের ঐশ্বর্য্য।

হয়ত এই মুহূর্ত্তে তারা বসে আছে মুখোমুখী, স্তিমিত আলোয় তারা কথা বলছে—দেহ-মনে তারা এক হয়ে গেছে, কিন্তু পরক্ষণেই উঠবে পীয়ার তারপর সমস্ত ঘর পায়চারী করতে করতে বক্তৃত্তা শুরু করবে—“দেখ মালের, উদ্ভিদের জীবন কি উদ্ভূত রহস্য-সমাকুল।” তার পরেই বক্তৃত্তার ঝড় আরম্ভ হয়ে যাবে—হয়ত উত্তর দক্ষিণ মেরুর উদ্ভিদজীবন সম্বন্ধে। সে সবার বিরাট দাঁতভাঙ্গা নাম. তাদের জীবনযাত্রার প্রণালী, তাদের আকাঙ্ক্ষা ও বাসনা—প্রাকৃতিক বিপর্য্যয়ে বৃদ্ধি আর মরণের গভীর রহস্যের কথা। তাদের অদ্ভূত বুদ্ধিমত্তা, তাদের জ্ঞানবিজ্ঞান, তাদের ধর্ম্মানুষ্ঠান—এসব কি অদ্ভূত—সুন্দর! তারপর আসবে মৃত্তিকার স্তর, পৃথিবীর গভীর বন্দরের গুপ্ত কাহিনী

আর কৃষ্ণালের আকর্ষণ রূপ বৈচিত্র্য। অবশ্যে সব এক করে পীরাব গড়ে তুলবে এক বিরাট ঐক-প্রণালী ও অপ্রাণীর মধ্যে একই সত্তা প্রকাশের কাহিনী—একই নিয়ম যা বিশ্বচরাচরকে নিয়ত নিয়ন্ত্রিত করছে—গ্রহে গ্রহে ভাবকার ঙ্গাগিয়ে তুলছে আনন্দের হিল্লোল। এসব কি আশ্চর্য্য! একই আত্মা সমস্ত জগৎ পরিব্যাপ্ত করে আছে—একই গতিছন্দে কাপিয়ে তুলছে, কিন্তু তারপরেই সে স্বীর একটি চুম্বনের আকাঙ্ক্ষায় ব্যাকুল হয়ে উঠবে।

কিন্তু স্ত্রী আপনাকে সরিয়ে নেয়—তারপর দ্বারে দ্বারে স্বামীর কাছ থেকে দূরে চলে যায়। তার মনে হয় স্বামী তার সমস্ত জ্ঞান, সমস্ত অভিজ্ঞতাকে একটি মাত্র সোহাগে শেষ করে দিতে চায়। মালের কান্না আসে। স্বামী তার বহুভায় সমস্ত বিধরক্ষাও যুরে এসে স্ত্রীকে বাহুবেষ্টনে বদ্ধ করে—তারপর কম্পিত উত্তেজনার স্ত্রীকে সরিয়ে দেয়—অবশেষে যখন স্বীর কথা চেতনায় ফিরে আসে, তার মনে হয় সে যেন এক অপরিচিত অজানা স্বাপে এসে পৌঁচেছে। মুখে সে হাসে কিন্তু তার অন্তরে অশ্রু উদ্বেল হয়ে ওঠে। একেই কি বলে প্রেম?

প্রিয়তম সারা জীবন কাটিয়েছে জ্ঞানাবেষণে আজ তার সমস্ত অন্তরের কামনা বাহিরে মুক্তির সন্ধানে ব্যাকুল হয়ে উঠেছে। কিন্তু প্রিয়তমার অন্তর সে ইসারার সাড়া দেয় না কেন?

যখন পীরার আস্তাবল থেকে ফেরে, মালের তখন বসবার ঘরে দাঁড়িয়ে আছে—তার গারে কোনো ভেলভেটের সাজ—গলার কাছে লাল ফিতে দেওয়া।

পীরার খমকে দাঁড়ায়—“এ সাজ তোমার কি রকম চমৎকার মানায় মালের!” স্ত্রীর চোখ স্বামীর আশ্রয় পায়—“তারপর”—তার বাহু প্রিয়তমের কণ্ঠ বেষ্টন করে।

--“একটি আস্তাবলে গিয়েছিলে ?”

--“হ্যাঁ, ওই ছেলের সঙ্গে ‘একটু গল্প করছিলাম।’

--“আমাকে ক্ষমা কর পীরার।”

--“তোমাকে ? কেন ?”

--“আমি যদি আজকে মার কাছে যেতে চাই তুমি কি রাগ করবে ?”

--“কেন আমিও আজ তাঁই চাই। ক্যাপ্টেন সাহেবের কাছ থেকে কেনা ঘোড়াটা যে কোন মুহুর্তে এখানে আসবে—সেইটার জন্তই ত আমি অপেক্ষা করছি !”

--“আবার একটি নতুন ঘোড়া ?”

--“হ্যাঁ, একটু ঘোড়ার চড়া আমার দরকার কতদিন আমাকে আরবে ঘোড়ায় চড়তে হয়েছে। কিন্তু এই ঘোড়াটা—”

মালো তখনও স্বামীর বাহুবন্ধনে দাঁড়িয়ে আছে—এইবার সে আপনার অধরের তপ্ততা স্বামীর গুচ্ছে মেলো দিল। এই সব মুহুর্তেই মালো স্বামীর প্রতি এক অদ্ভুত আকর্ষণ অনুভব করে। তার এই অকল্পিত আনন্দে স্বামীর দেহ থরথর করে কাপে। স্ত্রীর দেহের শিরায় শিরায় পুলকের শিহরণ, দেহ মন স্বর্গীয় সুরের আস্বাদে কম্পমান।

“আঃ” অবশেষে পীরার দীর্ঘ নিঃশ্বাসের সঙ্গে বললে—তার মুখ ভাবাবেগে ফাফাসে হয়ে গেছে—“আঃ—আমি এই রকম করে মরতে পারি !”

তার একটু পরেই তারা দাঁড়িয়ে আছে বারান্দায়, এমন সময় শাদা দাড়িবিশিষ্ট লোক একটা ছোট ঘোড়া নাচের বাগানে নিয়ে এল। জন্তুটা প্রাঙ্গণের মাঝে এসে দাঁড়িয়ে হেঁসারব করল, আর সঙ্গে সঙ্গে আস্তাবলের সমস্ত ঘোড়া তার প্রত্নাত্ব দিলে।

—“বাঃ কি সুন্দর”—আনন্দে মালের হাততালি দিয়ে উঠল।

—“ওকে গাড়ীতে জুড়ে দাও।”

লোকটি তার টুপিতে হাত দিনে—“এর আগে কখনও এ গাড়ী টানে নি।”

—“ওকে ত শেখান চাই।” পীরার আদেশ করল।

মালের তার স্বামীর পানে চাইল। কিন্তু যখন ঘোড়াটাকে গাড়ীতে জুড়ে বার করে নিয়ে আসা হল, স্বামী-স্ত্রী তখন সেজে এসে দাঁড়িয়েছে। শাদা খুরছটো সে মাটিতে ঘষছিল—ঘোড়াটা মাথা নাড়ছে অস্থিরভাবে, তার চোখে যেন আগুন ঠিকরে পড়ছে। এর আগে ওর কখনও লাগামের অভিজ্ঞতা হয়নি, প্রতি পাদক্ষেপে চাকার ঘরঘরানি - পীরার একটা চুরুট ধরাল।

—“তুমি কি চুরুট খাচ্ছ—?”

—“হ্যাঁ, ও যেন মনে না করে যে, আমরা ভয় পেয়েছি।”

তারা গাড়ীতে বসতে বসতেই পশুটা হেঁসারব করতে করতে ছুটল—কিন্তু তার পিঠে পড়ল কঠিন চাবুক—পরমুহূর্তেই খুরের আঘাতে পথের ধূলি উড়িয়ে গাড়ীটা ছুটে চলল তাঁর বেগে।

এল শীত—দারুণ শীত। পীরার জানলায় জানলায় ঘুরতে লাগল আর মালেকে ডেকে দেখান প্রকৃতির নিজস্ব রূপ। কতদিনের প্রবাসের পর আবার সে দেখছে, নরওয়ার্ডের আসল শীত। দেখ, দেখ, পৃথিবী শুভ্রতায় বদলে গেছে—যেন শাদা পাথরের ভূমিতল, বন, সমতল ভূমি—সব শাদায় একাকার হয়ে গেছে—এই শুভ্রতায় পড়েছে সূর্যের আলো - এ এক রূপকুমারীর দেশ—রাতে তাঁদের আলোয় মনে হয় যেন অকথিত, অপরিচিত এক স্বপ্ন কাহিনী। হৃদের বরফে চলে শ্লেজ গাড়ী—চলে তুষারাবৃত ঘন বন দিয়ে। ঘোড়ার চুলে জমে বরফ, আর

বুড়োলোকদের দাড়িতে গুলতার ছোঁয়াচ। গভীর রাত্রে লোকে বিছানায় শুয়ে চমকে ওঠে—দূরে বরফের স্তূপ ফাটছে।

“এই সময় গাড়ী চালাতে কি আরাম—চল মানে”—সঙ্গে সঙ্গে তারা বেরিয়ে পড়ে ‘ফার’ গানে দিয়ে—আস্তাবল থেকে গুড ব্রানস ভাল ঘোড়াটাকে বার করা হয়—তারপর এক ঝাকুনি দিয়ে তাদের গাড়ী ছুটে চলে লেকের ধার ঘেঁসে। সেখানে মুক্ত বাতাসে বরফের ওপর তারা ‘স্বী’ করে, মনে যেন নেশা লাগে—মানে এক এক সময় ভয়ে চাঁৎকার করে ওঠে এবং পরক্ষণেই তারা আবার উঠে বসে গাড়ীতে—তারপর আবার ছুটে চলে ঘোড়া। অশ্ববর যেতে চায় না। পীয়ারের হাতে কেঁপে ওঠে চাদক—আবার ছোটে ঘোড়া—খট খট খট। তারপর নামে সন্ধ্যা, তারা ফিরছে লোরেঞ্জ। লোরেঞ্জ তাদের বাড়ী—দূর থেকে তার আলোকিত বাতায়ন দেখা যায়, যেন তাদের ডাক দিচ্ছে—‘এস ফিরে এস।’ কি আনন্দ! অথবা কোন সময় তারা যাবে পাহাড়ের কাছে স্বী করতে, সেখানে কোন কাঠুরিয়া বাড়ীতে বসে পান করে গরম কফি—তারপর বাড়ী ফিরে আসা। শীতের স্তিমিত সন্ধ্যায় বনে বনান্তরে যেন একটা বেগুনী রঙের লীলা—পথের তুষারে শাদা আর নীল ছোঁয়া। ওই অদূরে একটা গোলাবাড়ী—ওর জানালার কাছে পড়েছে সন্ধ্যা সূর্যের লালিমা—গাছের মাথায় সোনার ঝিকিমিকি। এইখানে তারা আসে মাঝে মাঝে—পথের বাঁকে পাইন গাছের বরফ তাদের ধাক্কায় ঝরে পড়ে—তারা ছুটে চলে কাঠুরিয়ার পথ ধরে পাথর আর বিপদ অতিক্রম করে—হাঁপাতে হাঁপাতে এসে উপস্থিত হয়। তারপর আবার বাড়ী। দারুণ পরিশ্রমে তাদের মুখলাল—সারা অঙ্গে বরফ জমে গেছে।

“মানে”—পীরার তার দাঁড়ি থেকে তুষারকণা ঝেড়ে ফেলে, “আজ রাতে বারগ্যাণ্ডি মদ, কি বল” ?

—“বেশ ত কাউকে আসতে বলব ?”

- “বাইরে থেকে নিমন্ত্রণ কেন আমরা তুজনে।”

—“বেশ তাই হবে।”

গরম জলে স্নান—একটু প্রসাধন—আঃ কি চমৎকার। আজকে সন্ধ্যায় পীরার আসবে সন্ধ্যা সাজে—চমৎকার। কিন্তু সন্ধ্যায় পীরার আবার প্রবেশ করে থমকে লাড়ান। মানে সন্ধ্যা সাজে সন্ধ্যামণির মতই এসে দাঁড়িয়েছে—কানো ভেতরভেতর সাজ—কণ্ঠে ছুঁছে লক্কেট আর চুলগুলিকে সে সাজিয়েছে—কি সুন্দর !

টেবিলের ওপর ফুল—ঈশ্বরের মদ কপার পাত্রে ঝলমল করছে। তার সুবাস পাত্র তুলে নেয়, তারপর পরম্পরের স্বাস্থ্য পান করে।

সারাদিনের তুষারপতন তাদের মনে ফেলে ছায়া, কিন্তু সূর্য্য তার কিরণে উত্তপ্ত করে তুলেছে এদের গোপনতম সত্তাকে। সারা সন্ধ্যা তারা কলহাস্যে মুখরিত করে তুলেছে। পরম্পরের হাত ধরে বসে রইল—শান্ত মধুর নির্জনতায়।

-- “চমৎকার দিন। কালই আমি মরে যেতে পারি।”

—“কি বললে ? কাল ”

— “পঞ্চাশ হাজার বছর—তাতে কি—একই কথা”—মানের হাত হাতে তুলে নিয়ে পীরার অর্কনিমিত চোখে বসে রইল।

—“এই স্নানায়মান সন্ধ্যায় বসে আছি পরম্পরের কাছে—আর কি চাই।”

তারপর পীরার তার ইজিপ্টের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করতে লাগল। একবার ম্যাসপেরো, স্বয়ং ম্যাসপেরোর সঙ্গে আমি এক মাসের ছুটি

কাটিয়েছিলাম! তার সঙ্গে আমি লুকসার, কর্ণক এলত্রমার্গল্য, সুরা সব যুরেছি—কত স্মৃতি, প্রাচীন মন্দির, কত সমাধি মন্দিরে এখনও গুরে আছে সম্রাট সাম্রাজ্ঞী, তাদের চোখ খোলা—হয়ত হাজার হাজার বছর পরে তারা উঠে বসবে, তারপর আদেশ করবে—“ওরে প্রসাধনের সব ঠিক করেছিস’? ধান জমির ঠিক মধ্যখানে একটা স্তম্ভ—কিসের জান না? একটা প্রকাণ্ড সাম্রাজ্যের অবশেষ। হাজার বছর আগে সেইখানে কত প্রণয়ী তাদের প্রণয় নিবেদন করেছে দরিতাদের কাছে— তারা বুঝেছিল, প্রেমের চমৎকারিত্ব, কিন্তু আজ তারা কোথায়? কোথায় তারা বলতে পার মানে’?”

“সেই ভ্রমণের শেষে আমি ভাবতে লাগলাম মাল্‌লে, যেন শুধু নাইল নদীর জল সে বন-বনাস্তুর উর্ধ্বর করে তোলেনি, তাকে সাহায্য করেছে লক্ষ লক্ষ লোকের মৃতদেহ। আমি ঘোড়া ছুটিয়ে গিয়েছি তাদের বুকের ওপর দিয়ে—যাদের অধরে একদিন ছিল উত্তপ্ত দানিমা যাদের বুকে বেজেছিল প্রেমের বাঁশী। সেই সব কোটা কোটা নরনারীর এই কি অবশেষ? আমি জানি, কোটা আর্জুকঠে তারা উর্ধ্ব চক্রসূর্য্যনক্ষত্র খচিত আকাশে ভুলেছিল তাদের কাতর প্রার্থনা—তাদের উপাস্য ছিল, মাটির পুতুল, কুমীর, সাপ আর ঐ নদী। কিন্তু বাতাস—সেদিনের সেই উত্তপ্ত অবচেতন বাতাস শুধু একবার কোঁপ উঠেছিল তাদের বন্দনা গানে—তারপর সবশেষ—সব শেষ মাল্‌লে। ভজনার এই ত পরিণতি মূর্খের মূর্খিকে আমরা প্রণাম করি—সেদিনও করেছিল তারা, আজও আমরা করি—এ কি ভ্রান্তি? এস আর একবার।”

কিন্তু মাল্‌লে তার পাত্র স্পর্শ করলে না—স্থির নিশ্চলভাবে সে বসে রইল হলদে আলোর দিকে চেয়ে। সঙ্গীতের সুরে বিশ্ববিজয় করার স্বপ্ন আজও তার মরেনি—তার চোখের সম্মুখে পীয়ার ভুলে ধরেছে

অকল্পিত বিরাটত্বের অসীম রূপ—সেই আলোর তরঙ্গে তারা ভেসে যাচ্ছে—তার পিতামাতা, নিজে, তার স্বামী, তার নিভৃত সংসারের আশা।

—“তুমি আমার স্বাস্থ্য কামনা করতে চাও না? বেশ, আমি তোমার স্বাস্থ্য পান করছি”—

এইবার সে আরম্ভ করল তার ভ্রমণ কাহিনী, মুখে অগাধ হাসি। এতক্ষণে মালেক তার কথা বলতে পেরেছে, সেও হাসিতে ষোগ দিল।

“বিরাট লোকের সমস্ত শূণ্যচর অধিবাসী, কত পাখী, তাদের লম্বা ঠোঁট, কত অপক্লপ বর্ণশ্রী—তাদের চীৎকার, তাদের উদ্বেগহীন পাখার ঝাপটা। তারা যখন একদল আকাশ ছেয়ে উত্তরে উড়ে যেত—দূরে নরওয়ারের দিকে, তখন আমি শুধু চেয়ে চেয়ে দেখতাম। আবার তারা ফিরে আসত শরতের সোনালী প্রভাতে, সেও আমি দেখতাম। বৎসরের পর বৎসর তাদের যাবার সময় আমি ভেবেছি, আগামী বৎসরে আমি যাব ওদের পিছনে পিছনে আমার দেশে, আমার প্রিয়তম জন্মভূমিতে কিন্তু সে শুধু আকাঙ্ক্ষা। আসা আমার সম্ভব হত না। এতদিনে আমি আবার ফিরেছি আমার ঘরে।”

—“স্বাগত প্রবাসী বন্ধু”—মালেক তার পাত্র তুলে ধরে।

পীয়ার সঙ্কেত করলে বয়কে। “আবার কি চাই?”—মালেকের চোখে ফুটে উঠল জিজ্ঞাসা।

—“গ্লাম্পেন”—পীয়ার উত্তরে বললে।

—“তোমার নেশা ধরেছে নাকি?”

পীয়ার ততক্ষণে আবার চেয়ারে হেলান দিয়ে বসেছে—তার মনে তৃপ্তি, মুখে ভালবাসা। একটা সিগারেট ধরিয়ে সে তার সব চেয়ে বড় জয়ের কথা বলতে লাগল। বাঁধের কাজ শেষ করার ঠিক পরেই, আবার

একটা ইংলিশ ফার্মের সঙ্গে সে কাজ ঠিক করেছে। সেই সময় একদিন তাদের চীফ সকলকে ডেকে বলল—“দেখুন, আপনাদের জন্তে একটা বিরাট কাজ প্রতীক্ষা করছে। এই কাজ যে হাতে নেবে আর সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করতে পারবে—বর্তমান জগতে সে-ই হবে সর্বশ্রেষ্ঠ ইঞ্জিনিয়ার। আপনারা কে কে রাজী আছেন? সঙ্গে সঙ্গে প্রায় কুড়িজন অভিজ্ঞ লোক চীৎকার করে উঠল—“আমি, আমি।” বেশ আবিসিনিয়ার সম্রাট একটু নূতন ধরণের রেল লাইন তৈরী করবেন—দুশো মাইল লম্বা একাজ কি সুবিধে হবে?” “নিশ্চয়ই”—“চমৎকার”—আমরা উত্তেজনার কাঁপতে লাগলাম।

—“কিন্তু মনে রাখবেন এই কাজে আমাদের প্রতিযোগিতা করতে হবে জার্মান সুইস আমেরিকানদের সঙ্গে—এবং জয়ী আমাদের হতেই হবে।”

“নিশ্চয়ই”—এইবার সকলে বিকট চীৎকার করে উঠলো।

“বেশ আমি আপনাদের মধ্যে দুজন লোককে বেছে নেব এবং তাদের হাতে সব তুলে দেব। তারা সমস্ত পর্যবেক্ষণ করবে। প্ল্যান করবে খসড়া এবং খরচা ঠিক করবে। মনে রাখতে হবে যে, একজন ভাললোকের করতে লাগবে আন্দাজ আটমাস, কিন্তু আমি চাই এই কাজটা চার মাসের মধ্যে। অবশ্য লোকজন যত্নপাতি সব কিছুই তিনি পাবেন। উপরন্তু এক হাজার পাউণ্ড প্রিমিয়াম এই কাজটার জন্তে তাকে দেওয়া হবে।”

—“পীরার, তোমাকে পাঠান হয়েছিল”? —মার্গে, চেরার থেকে উঠে দাঁড়াল—আনন্দের উত্তেজনায় সমস্ত শরীর তার কাঁপছে।

—“হ্যাঁ, আমি আর একজন”।

—“কে সে?”

—“তার নাম ফার্ডিন্যান্ড হনম।

মালেক তার একদিকে টানা হাসি হাসলে—তারপর দীর্ঘ অঁখিপাতার মধ্য দিয়ে এই সম্মানিত বীরের দিকে তাকান। সে জানে, তার স্বামীর চিরদিনের ইচ্ছা, সন্মুখ সমরে তার এই সৎভাইকে পরাজিত করা। কিন্তু—

—“শেষে কি হল?”

পায়ার তার সীগারেট ছুড়ে ফেলে দিল। প্রথমেই একটা বিরাট য্যাডভেঞ্চার—নাইলে নদীর পাশ দিয়ে—তারপর সাহারা মরুভূমির মধ্য দিয়ে যাত্রা। সঙ্গে উট, অশ্বতর, লোকজন খাবার আর গাদা গাদা কুইনাইন। এরকম ব্যাপারের তোমার হয়ত কোন অভিজ্ঞতা নেই। আমাদের রেল লাইন তৈরি করতে হবে সব রকম জায়গা দিয়ে—হয়ত বনের মধ্য দিয়ে, খানা ডোবা বৃষ্টি ঝড় সব উপেক্ষা করে। সমস্ত কাজের সঙ্গে হয়ত লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ হবে—সবচেয়ে ভাল জিনিষ দিয়ে হয়ত ব্রিজ হল—কিন্তু শেষকালে জার্মানরা এসে বলেছে—তাদের ব্রিজ এর চেয়ে ঢের ভাল। একাজ আট মাসের মধ্যে কিছুতেই শেষ হয় না—কিন্তু আমাকে করতে হয়েছিল চারমাসে। সারাদিনে জানি মাত্র বার ঘণ্টা সময়, কিন্তু রাত্রে বার ঘণ্টা কি বাজে যাবে। জ্বর? হ্যাঁ হ্যাঁ সর্দিগাশ্ম? তাতেও কত লোক আর জন্তু মারা গেল—ম্যাপ হয়ত বৃষ্টির তোড়ে কোথায় ভেসে গেল—আমার সবচেয়ে সেরা সহকারীও মারা গেল সাপের কামড়ে; কিন্তু এসব আমি খেয়াল করিনি—কাজের দেরী চলবে না। একজন লোক নষ্ট হওয়া মানে আমাদের নিজের কাজ বাড়ল। ঠিক দু’ মাস পরে, আমার পেছনে যেন হাতুড়ী পেটা আরম্ভ হল। চোখ বন্ধ করলেই মনে হত যেন হাজার সাপ ফণা বিস্তার করে আমার সমস্ত শরীর মাথায় ঘুরে বেড়াচ্ছে। যখন আয়নায় নিজের

চেহারা দেখতুম—চোখ দুটা যেন আগুনের ব'লে মনে হত। তবু ঠিক চার মাস পরে আমি ফিরে এলাম আমাদের চীফের কাছে।

“আর ফাউন্টাণ্ড হলম, সে?”

—“ঠিক আমার আগের দিন”—

—“তাহলে” মালের স্বর কেঁপে গেল—“তাহলে সে-ই জরী হল?”

“না, আমি”—পীয়ার আর একটা সীগার ধরাল—“না, আমি জিতেছিলাম। তাইতেই আর্বিসনিয়ার সমস্ত রেল তৈরীর ভার আমার ও র ছিল।”

—“এই যে শ্যাম্পেন”—মালের বলে। তারপর যখন পাত্রে সেই তরল সুরা ঝরু ঝরু করে উঠল—মালের অর্ধ-নির্মালিত চোখে স্বামীর দিকে চেয়ে হাসতে লাগল। পীয়ারের সমস্ত দেহে আনন্দের চাঞ্চল্য।

—“আজ একটু ভায়োলিন বাজাব?”—মালের প্রশ্ন করে।

কতদিন অনুরোধ করা সত্ত্বেও মালের ভায়োলিন বাজাতে চায় নি। বিয়ে হবার পর মালের আর তার ভায়োলিন স্পর্শ করতে চাইত না—তার ভয় হয়, হয়ত বা তার এই মনের আকাঙ্ক্ষা নষ্ট করবে মনের শান্তি, জাগিয়ে তুলবে পুরানো দিনের আকাঙ্ক্ষাকে।

পীয়ার সোকাই বসে দেখল—মালের তার আগুনের মত লাল সাজে, বসে বসে ভায়োলিন বাজাচ্ছে—সমস্ত কক্ষ হলদে স্তিমিত জ্যোতি।

পরক্ষণেই তার মাথায় এল তার মায়ের কথা। সঙ্গে সঙ্গে টেলফোন ধরে মালের বলতে লাগল—“হ্যালো, মা, আজ কি চমৎকার দিন—আজ কি আনন্দ!” এই মেয়েটি তার মনের সমস্ত আনন্দ দিয়ে তার মায়ের মনের অশান্তি দূর করে দিতে চায়।

অবশেষে যখন পীয়ার বিছানায় গুয়ে পড়ল তখনও মালের ঘুরে বেড়াচ্ছে তার প্রসাধন সমাপ্ত করতে।

পীয়ার চেয়ে চেয়ে দেখতে লাগল—মাল্‌ তার গুল্ল দীর্ঘ সাজে দাঁড়িয়ে আছে প্রসাধন টেবিলের ধারে—রাত্ৰের মত সে চুল সুবিন্যস্ত করে রাখছে—তার মুখে পড়েছে সবুজ আলো। দুজনেই চুপচাপ। মাল্‌ আয়নার মধ্য দিয়ে স্বামীর দিকে চেয়ে আছে—এক প্রকার রসঘন দৃষ্টি মেলে—আর তার কেশের সুরভি সমস্ত ঘরে যেন ছড়িয়ে দিচ্ছে ঘোবনের হিল্লোল।

মাল্‌ ফিরে স্বামীর দিকে তাকাল। পীয়ার হাসিমুখে হাতছানি দিয়ে তাকে ডাকছে। আজকের সমস্ত দিন মাঠে প্রান্তরে ভ্রমণ, তাদের সাক্ষ্য-ভোজ, গল্প শুরু—সব যেন তাদের অন্তরকে প্রেমের বণ্ডে রঙীন করে তুলেছে—অন্তরের তৃপ্তি প্রকাশ করেছে মুখের দীপ্তিতে। হয়ত তাদের মনে এখনও কাঁপছে সেই সব ব্যথিত আত্মার কাহিনী—লক্ষ যুগের মৃত মানুষের অভিশাপ—অন্ধকারে তাদের অসাধারণ অনুভূতি। কিন্তু এই যে আনন্দের প্রতিটি ক্ষণ—এই যে দয়িতের বাহুপাশ—এ যেন সমস্ত বিশ্বপ্রকৃতিতে মেলে দিয়েছে তার শান্তি, তার চেতনা। পীয়ার গুয়ে গুয়ে প্রার্থনা করলে, এই আনন্দ যেন মরে না যায় দেবতা—পৃথিবীতে বেঁচে থাকার আনন্দ।

সে বুঝতে পারছে, মাল্‌ এই যে অকারণ বিলম্ব করছে এর গোপন অর্থ—হঠাৎ মাল্‌ তার সমস্ত ভালবাসা সমর্পণ করবে তার স্বামীর বুকে—তাই উভয়েরই নিখাস আসন্ন প্রেম-আবেদনে চঞ্চল।

দূরে হ্রদের বরফ ফাটছে—তার উচ্চ শব্দ চমকিত করছে সুপ্ত নরনারীকে—উর্ধ্বে আকাশ যা পৃথিবীকে আচ্ছন্ন করে আছে—তার বুকে কাঁপছে তারকা, হাসছে আলোক।

(৬)

পরের কয়েক বৎসর পীয়ার তার সম্পত্তি আর কারখানা চালাতে লাগল, কিন্তু মন সে কিছুতেই তেমন দিলে না—নির্লিপ্তভাবে সে কাজ করে ; তার বেলিফ আর ম্যানেজার—তারাই সমস্ত দেখে । কারখানার কাজ সহজভাবেই চলে । পীয়ারকে যদি প্রশ্ন করা যায়—সারাদিন সে কি করে—তবে সে হয়ত কোন উত্তর খুঁজে পাবে না । না জানা কোন এক জিনিসের সন্ধানে সে ঘুরে বেড়াচ্ছে । তার জীবনের কোনও অভাব আজ পূর্ণ করে তোলবার সময় এসেছে । জ্ঞানের পিপাসা এখন আর নয়—নিজের দেশে পরিপূর্ণ জীবন, যৌবনের হারিয়ে যাওয়া ঐশ্বর্যের সন্ধান আজ তাকে করতে হবে । যৌবনের উচ্ছলতা তার মনে সুপ্তিমগ্ন ছিল এতদিন—আজ সে বাহির হবার পথ চাইছে ।

লোরেন্সে মাঝে মাঝে ভোজ ও উৎসব হয় । শহর থেকে দীর্ঘ সারি নৈধে শ্লেজ আসে আর শীতের দীর্ঘতর রাত্রিতে তারা ফিরে যায় । বড় বড় টেবিলে আহাৰ্য্য আর ফুলের সমাবেশ—সমস্ত বাড়ী উজ্জল আলোয় ঝলমল করে । কখনও কখনও টাদিনী রাতে শহরবাসিগণ উচ্চ আনন্দ কোলাহলের শব্দে জেগে ওঠে—তারপর জানালার বাইরে চেয়ে দেখে অনেক শ্লেজ আসছে—প্রত্যেকটির মধ্যে আনন্দ আর গান—হয়ত তারা ফিরে আসছে কোন ‘বনভোজন’ করে—নৃত্য ও ভোজের সমারোহ থেকে । একজন সদ্যবিবাহিত তরুণ উকিল—আর একজনের স্ত্রীর কোলে বসে ‘কন্সার্টিনা’ বাজায় আর উচ্চকণ্ঠে গান গায়—অনেকটা বিশেষ সুবিধা প্রাপ্ত ভাঁড়ের মত সকলেই তাকে ভালবাসে । “লোরেন্সের লোক,” সবাই বলাবলি করে,—“জায়গাটার রূপ বদলে যাচ্ছে দিন দিন !” তারপর তারা

গম্ভীর মুখে পরম্পরের দিকে মাথা নাড়ে—পৃথিবী কোন দিকে যাচ্ছে—
যেন তাই ভেবে তাদের ঘুম হয় না।

সময় সময় পীয়ার যায় কোন সদাশয় ভদ্রলোকের বাড়ীতে নিমন্ত্রণ
রক্ষা করতে ; সেখানে সারারাত্রি শ্যাম্পেন আর আনন্দ উৎসবের কোন
ক্রটিও হয় না। গণিত আর ধর্ম আলোচনার ক্ষুধা তার মিটে গেছে—
সে চায় তার স্বাদেশিক জীবনকে পূর্ণ করে তুলতে। নিজের গৃহে আর
সে প্রবাসীর মত বাস করবে না। সে এখানে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করতে
চায় ; সমস্ত পৃথিবীর মধ্যে তার যে নিজের দেশ আছে, সমাজ আছে—
এতদিন সে ভুলে গিয়েছিল।

তারপর জুন মাসের সূর্য্যকরোজ্জ্বল দিনগুলি আসে। মালের
শয্যার পাশে সে এসে দাঁড়ায়—স্মার পাশে একটি সদ্যপ্রসূত শিশু—
মালের মুখে সেই একদিকে টানা হাসি।

—“এর নাম কি রাখা হবে ?”

—“কেন, সে ত অনেক আগেই হয় গেছে—তোমার মার দেওয়া
সেই নাম।”

—“বেশ, তাই হোক—ওকে আমরা লুইস্ বলে ডাকব”—মালের
তার মেয়ের টুকটুকে রাঙা মুখখানি তার বুকের কাছে টেনে
নিলে।

এ এক নূতন বিষয়। হয়ত কতদিন ধরে মালের এই স্বপ্ন দেখে
এসেছে। কিন্তু এই আদর—এ স্বামীর প্রতি হঠাৎ কোন মুহূর্তের
উত্তেজনা নয়—এ যেন তার অন্তরস্থল হতে স্বতঃই উৎসারিত হচ্ছে।

পীয়ার একটু কোঁতুক করতে চেষ্ঠা করে—“এই সংসারে আমার
কোনও শক্তি কোন দিনও ছিল না, আজও নেই। তুমি একে তোমার
মনের মত করেই মানুষ করে তোল”—স্বামী স্ত্রীর কপালে চুম্বন করলে।

স্ট্রী দেখলে স্বামী তার বিচলিত হয়েছে মনে মনে—স্বামীর পানে চেয়ে, মাল্‌ তার সেই সৌন্দর্য্য উজ্জ্বল হাসি হাসতে লাগল।

ধান কাটার প্রথম দিনে পীয়ার তার মাঠের এক কোণে বসে ছিল—সামনের প্রান্তুর সূর্য্যের আলোক স্রোতে স্নান করছে—চাষীরা মাঠে কাজ করে চলে। মোয়িং মেশিনটা লেকের ধারে কাজ করছে—আর ঘোড়া আর মানুষ আনন্দে কঠিন পরিশ্রম করছে। চারিদিকের বাতাস যেন ফলফুলের গন্ধে সুরভিত। মনে তার গভীর শান্তি।

একটি স্ত্রীলোক হাল্কা সাজে, মাথায় খড়ের টুপি দিয়ে মাঠের পথে এগিয়ে আসছে—একটা ছেলেদের গাড়ী ঠেলে। 'মাল্‌ চারিপাশে তাকায়—গুন্ গুন্ করে সে একটা গান গাইছে। এই মেয়েটি হবার পর মাল্‌র মন যেন বদলে গেছে। আজ আর সে সঙ্গীতের সুরে বিশ্ববিজয়িনী হ'তে চায় না—তার জীবনের স্বপ্ন রূপ ধরেছে ওই ছোট মেয়েটির সারা দেহে। তার হাসির উজ্জ্বলতা, তার বর্ণশ্রী এত চমৎকার কোনদিনই দেখায়নি—তার সারা দেহে যেন যৌবনের প্রথম হিল্লোল। অপরিচিত সৌন্দর্য্যের প্রভাবে তার দৃষ্টি—যেন স্বপ্ন আতুর।

কিছুক্ষণ পরে পীয়ার যায় নিজে মোয়িং মেশিন্‌ চালাতে। তার মনে হয়—কাজ তাকে করতে হবে—সংসার চালান চাই—স্ত্রী কণ্ঠ্য জন্ম তাকে পরিশ্রম করে উপার্জন করতে হবে।

কিন্তু হঠাৎ সে নেমে পড়ে তারপর সমস্ত যন্ত্রটা পর্য্যবেক্ষণ করতে থাকে। সমস্ত শরীরে তার তৎপরতা—তার দৃষ্টি তীক্ষ্ণ—বুদ্ধি-প্রতিভায় উজ্জ্বল। সে ব্লেন্ড দুটোর দিকে দেখে, তারপর রাজ্যের ভাবনা তার মাথায় ভিড় করে।

একি অদ্ভুত ভাব? তার মনে আনন্দের সাড়া; অস্পষ্ট তার চিন্তার সূত্র, কিন্তু এখনও সময় আছে?—সে কি চেষ্টা করে দেখবে?

অত্যন্ত লঘু দিন আর চন্দ্রালোকিত রজনী। মাঝে মাঝে সে ঘুমায় না—রাত্রির কালো অন্ধকার ভেদ করে সূর্য্যোদয় দেখতে তার ভাল লাগে।

এমনি এক রাতে সে উঠে পড়ে—সাজগোজ করে। কয়েক মিনিট পরে আস্তাবলের সহিস ঘোড়াটা বের করে আনে সে ঘোড়ার পিঠে চড়ে চাবুক চালায়—তারপর তার শাদা সাজ রাত্রির অন্ধকারে হারিয়ে যায়।

তার লক্ষ্য কোথায়—সে জানে না। এ একপ্রকার আনন্দ-রাত্রির অসময়ে উঠে--জ্বলাই প্রভাতের প্রতীক্ষা করা।

ঘোড়াটা ধীর-পদে এগিয়ে যায়—আর পীয়ার চালকের সমস্ত আনন্দটুকু উপভোগ করে। সব নিস্তব্ধ, শহরের সমস্ত প্রাণীই গভীর স্তম্ভিমগ্ন। রূপালী আকাশে এখানে ওখানে ছড়ান সোনার মেঘ—বাতাসে ভেসে ভেসে আসে গন্ধ—নিঃশ্বাস নিতে আরাম বোধ হয়। অস্তুরে বাহিরে গানের সুর ভেসে বেড়ায়।

পথের বাঁকে বাঁকে সে নামে, তারপর গেট খুলে দেয়।

কুটারের পর কুটার পার হয়ে সে ক্রমশ ওপর দিকে উঠছে—অবশেষে সবচেয়ে উঁচু ঢালুতে সে থামে। ঘোড়াটা মাথায় একটু ঝাঁকুনি দেয়—তারপর হেঁসারব করে। তাদের মুখে গাছের শিশির পড়ছে—অনাগত সূর্য্যের আলোয় চিক্‌চিক্‌ করছে। অনেক নীচে ঐ লেক—ওর-বুকে আকাশ, পাহাড়, তরুশ্রেণী আর কুটারের ছবি। ওর ঐ পূর্বদিকে উঠছে সূর্য্য—আসছে দিন—জ্যোতির সমুদ্রে জাগছে ঢেউ।

ঘোড়াটা যাবার জন্ম উদ্‌গীর্ষ হয়ে আছে, কিন্তু পীয়ার তাকে আটকে রাখে। তার হেলমেটের ধার দিয়ে সে সূর্য্যকে দেখছে—তার মনে এক অদ্ভুত ধরণের চিন্তার জাগরণ। জীবনের পরিপূর্ণ রস ও আনন্দের

সন্ধানে, সে হয়ত ব্যর্থকাম হবে। যৌবনের শক্তি এখনও তার দুর্বল হয়নি। দেহের প্রত্যেকটি অঙ্গ আজও কন্ঠ-নিপুণ। জীবনের কোনও তিক্ত অভিজ্ঞতা তার নেই—কোনও দায়িত্ব তার পক্ষে দুর্বল হয়ে ওঠেনি। তার ভবিষ্যৎ ওই প্রসন্ন দিনের আলোর মতই গৌরব-মণ্ডিত। জ্ঞানের পিপাসা তার মিটে গেছে। তার মনে হয়—এতদিনের সব সঞ্চয়, সব অভিজ্ঞতা, সব আনন্দ তার মনের মধ্যে শরীরী রূপ নিয়েছে।

কিন্তু তারপর—তারপর কি ?

যে বিরাট মানবতার পরিকল্পনা তুমি করেছিলে,—সে স্বপ্ন কি তোমার সার্থক হয়েছে ? মানুষের উন্নতির মূলমন্ত্র তোমার কোনও দিনই অজানা ছিল না। উন্নততর রূপের প্রতি লক্ষ্যের মধ্যে—অনন্ত দেবতার সন্ধানে এর নানামুখী প্রতিভার বিকাশে যে বন্দনা গান মানুষ গায়—তার সুর ত তোমার জানা !

উদ্ভিদের জীবনযাত্রার প্রণালী তুমি ত জান। পাখীর নীড়ের মধ্যে যে রহস্য, তার সামনে উদ্ধত মন আনত হয়ে আসে। বহু হাজার বৎসর আগে যে গেসিয়ার ছুটেছিল পাহাড়ের বৃকে, তার পায়েঁর চিহ্ন সূর্য্যমণ্ডলের বিরাটত্বের আভাস দেয়। কোনও শরতের নির্মোহ আকাশে—তুমি চেয়ে দেখ—অসংখ্য নক্ষত্র ! তাদের আলো—তাদের নির্বাণ—আর ঐ বিরাট ব্যোম—এ সমস্ত তোমার আত্মাকে এক অদ্ভুত সুরে কাঁপিয়ে দিয়ে যায়। এই বিশ্বপ্রকৃতির ছায়া তোমার জীবনে। এই বিশ্বের যতটুকু সম্ভব বোঝবার চেষ্টা কর—সেই তোমার আনন্দ। তোমার চিন্তা ও ইচ্ছায় যেন তার দ্বারাই চালিত হয়।

কিন্তু তারপর ? এই কি পরিণতি ? নিজের মধ্যে নিজেকে গুটিয়ে রেখে তোমার স্বপ্ন কি সফল হবে ?

তুমি কি মানুষের যাত্রাপথে একখানি শিলাও তুলতে পেরেছ—যার

পরে দাঁড়িয়ে মানুষ বলতে পারে বিশ্বরহস্যের আরও একটু আমার জানা হল।

তোমার অন্তরের কি মূল্য আছে—কর্মের মধ্যে যদি না তার বিকাশ হবে ?

মৃত্যুর দ্বারে ভিখারী সেজে অতিমানুষের দল যদি এই পৃথিবীতে বাস করত, তবে গোষ্ঠী হিসেবে তাদের মূল্য কতটুকু বাড়তো ?

তোমার আত্মার চরম বিশ্বাস কিসে ?

এই নির্কাসিতের বেদনা, ধর্মের নিরাশ্রয়তা—কতবার তুমি আর মাল্‌পেরস্পরের হাত ধরে একই চিন্তায় বিভোর হয়ে থাক, তোমাদের মন খুঁজে বেড়ায় আকাশে ও পৃথিবীতে এমন একজনকে যার কাছে তোমাদের প্রার্থনা ব্যর্থ হবে না। সে প্রার্থনা ক্রীতদাসের ক্ষমা ভিক্ষা নয়, এই যে জীবন-প্রদীপের আলোকে উজ্জ্বল মানুষের মন—তার জগৎ ধন্যবাদ জ্ঞাপন।

কিন্তু তিনি কোথায় ?

তিনি নেই। কিন্তু তবু তিনি আছেন।

ঐযে ক্রশের ওপর সন্ন্যাসী—ও আর্ন্ত ও আতুরের দেবতা ! আর আমাদের ? কবে আসবে সেই দিন—যবে এই আধুনিক মানুষ দৃঢ়গঠিত ও যন্ত্রসভ্যতায় শিক্ষিত—খুঁজে পাবে এক ভজনের সুর, এক বিরাট বিশ্ব-দেউল—যেখানে ভেসে আসবে অমর আত্মার আনন্দের স্রোত।

ওই সূর্য্য উঠছে দূরে গিরিশৃঙ্গের চূড়া দিয়ে, চারিদিকে তার সোনালী আভা, পাইন শীর্ষ স্বর্ণমণ্ডিত। পায়ার সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ে—হাত ও শিরজ্ঞাণে রাতের শিশির ঝলমল করছে—সে ঘোড়াটাকে পিঠে হাত দিয়ে আদর করে। রাত চুটো, প্রভাতের আলো মেঘে মেঘে

লুকোচুরি খেলে—পৃথিবীর জলে তার ছায়া। মাঠের শিশিরে রোদ—
প্রজাপতির ডানায় রূপের লীলা।

“এইবার বিজু বাড়ী ফিরে চল”—

তার পর সে ছুটে চলে নীচের চালু পথে—অশ্বের হেয়ারবে নির্জনতা
কৈপে ওঠে।

৭

“শুনেছ মাল্, আমাদের বাড়ীতে অতিথি আসছে—কোন ঘরে বসে
আছ তুমি?”—পায়ার হাতে টেলিগ্রাম নিয়ে দ্রুত ছুটল নাসারীর দিকে
—“তুমি এইখানে বসি”?

“তুমি এত জোরে চেঁচাচ্ছ যে সমস্ত বাড়ীময় শোনা যাচ্ছে। কারা
আসছে?”—

“ফার্ডিনাণ্ড হলম আর ক্রস ব্রক—লোরেন্জের জন্মোৎসবে তারা দু’জনে
আসছে—ওঃ কি বল তুমি?”

মাল্‌র মুখ রক্তহীন, তার কপালের সৌন্দর্য্য আজ লুপ্তপ্রায়। আরও
দুই বৎসর কেটে গেছে—তার একটি ছেলে হয়েছে—অদ্ভুত বড় বড়
চোখ মেলে ছেলোটিকে তাকিয়ে থাকে মার কোলে বসে।

“চমৎকার”—মাল্‌ তার ছেলের জামা খুলতে লাগল। অন্তত সব
আয়োজন ঠিক রাখতে হবে আর বাড়ীটা একটু চক্চকে করে তুলতে
হবে।

তিনদিনের মধ্যে বাড়ীটার রূপ বদলে গেল—গাড়ী গাড়ী বালি আসছে প্রাঙ্গন ও বাগানের জন্তু, আর রূপশিল্পীরা দারুণ পরিশ্রম করছে বাড়ীটা নূতন করে পেণ্ট করতে। মালের জানত আয়োজনের কোন ক্রটি হলে তার স্বামী ভীষণ অসন্তুষ্ট হবে।

অবশেষে অগাধের সেই আতপ্ত দিনগুলি ঘনিয়ে এল—সমস্ত বাতায়নে পতাকা উড়তে লাগল—নবাগতদের অভিনন্দন জানাবার জন্তে। পাহাড়ী জমি থেকে শোনা যাচ্ছে ‘মোয়িং মেশিন’ আর ‘হেরেক’এর শব্দ। বাতাস এত শান্ত যে, চিমনির ধোঁয়া সোজা উঠে যাচ্ছে ওপরে। পীয়ার খুব ভোরে উঠে সমস্ত শেষবারের জন্তে নিরীক্ষণ করছে—মালের নিদাঘ সজ্জা থেকে প্রত্যেক খুঁটিনাটি ব্যাপার। ঘোড়াগুলোর বকলস আবার চক্চকু করছে মাজার ফলে। মালের সবই বুঝতে পারে। স্বামী তার ভদ্র ডাক্তারের ছেলের পাশে জেলের পোষাক পরে শৈশব কাটিয়েছে, আর হলম-এর পরিবারের সঙ্গে কোনদিনই তার সদ্ভাব নেই। ছেলেবেলার মন এখনও তাঁর যায় নি, তাই নিজেকে পরিপূর্ণ গৌরবে দেখাবার লোভ কিছুতেই তিনি সম্বরণ করতে পারছেন না।

কতকগুলি বাজে অলস লোক ষ্টামবোট ঘাটে ভিড় করছিল। এমন সময় নৌকাটা কূলে এসে ভিড়ল। লোরেরঞ্জের ঘোড়া দুটো কেবলই মাথা ও লেজ নাড়ছে—কতকগুলি মাছি তাদের বিরক্ত করছে বিষম। কিছুক্ষণের মধ্যেই তারা আরোহী পেয়ে ছুটেতে লাগল আহ্লাদে—ভিড় ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল, কিন্তু তারা দেখতে পেলে গাড়ীর মধ্যে তিন বন্ধু প্রচুর হাস্য কোঁতুকে মত্ত! কয়েক মিনিটের মধ্যেই পিছনে বিরাট ধূলির জগৎ ফেলে রেখে গাড়ী ছুটে চলল নদীর বাঁক দিয়ে উচ্চ গতিতে।

তার কিছু পশ্চাতে একখানা ঠেলাগাড়ীতে জিনিষপত্র যাচ্ছে—তাতে একটা মস্তবড় পেতলের ট্রাঙ্ক আর কাঠের সিল্কু ভয়ানক ভারী।

মালের তার সাজ শেষ করে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছে। হাক্কী সাজে তাকে বড় চমৎকার দেখাচ্ছিল—বিশেষ করে কাঁধের কাছে আর কোমরে যে লাল পটি দেওয়া রয়েছে—তার এত ভাল লাগছে তা'। বাইরে গাড়ীর শব্দ পাওয়া যাচ্ছে—সে ছুটল নবাগতদের অভ্যর্থনা করতে।

“এই যে তারা”—পীয়ার গাড়ীথেকে লাফিয়ে পড়ল—“এই হচ্ছে ফাডিগাণ্ড পাশা, সাহারার নূতন রাজ্যের গভর্নর; আর এই হচ্ছে মহামান্য খেদিবের ‘চীফ পাইপ ক্লিনার এণ্ড বডিইউনাক।’

দীর্ঘকায়, একটু কুঁজো ব্যক্তি মালের দিকে এগিয়ে এল—কেশে তার পাক ধরেছে—দাড়ি গোক কামান। এই হচ্ছে ফাডিগাণ্ড—“কেমন আছেন?” তারপর একটু ঘুরে পীয়ারকে বললে—“বাঃ, তুমি ত এখানে বেশ আরামে বাস করছ?”

তার বন্ধু একটু পুষ্ট—তার একটু ছাগল দাড়ি আছে। আর তার কালো চোখ অনবরত পিট পিট করে। কিন্তু তার হাসির মধ্যে সত্যিকারের আনন্দ পাওয়া যায়—তার হাতের মুষ্টি ভীষণ দৃঢ়। এক ক্লস ব্রক।

পীয়ার তাদের প্রত্যেকখানি ঘরের মধ্যে দিয়ে নিয়ে যেতে লাগল—মাঝে মাঝে জানলার দিকে বাহিরের প্রকৃতিকে দেখাতে দেখাতে। অবশেষে ক্লস আর হাস্য সম্বরণ করতে পারলে না—ফিরে মালেকে বললে—“ও এখনও তেমনি রয়েছে—কেবলমাত্র একটু মোটাসোটা যা দেখতে হয়েছে। আপনি ওকে বেশ আরামে রেখেছেন—কি বলেন?” নীচু হয়ে সে মালের হাতে চুম্বন করলে।

তাদের জন্মে উৎকৃষ্ট পানীয় তৈরী ছিল—এটা মালের আবিষ্কার। তারপর আগন্তুক দু'জন যখন প্রত্যেক দু'গ্লাস পান করে বলে উঠলো—“চমৎকার”, তখন পীয়ার তার স্ত্রীর হাত ধরে বললে—“চমৎকার, চমৎকার, মালেকি বলে যে তোমায় আদর করব।”

“ই্যা আমাকে একটা টেলিগ্রাম করতে হবে”—ইঠাৎ ফার্ডিন্যান্ড বলে উঠল—“তোমাদের টেলিফোনটা আমাকে একবার”—

“ওই দেখ এতটুকু স্থৈর্য্য ওর নেই”—রুস হাসতে হাসতে বলে—
“সমগ্র ইউরোপে ওর টেলিগ্রামের লোক রয়েছে—যা’হোক, তোমাদের আসবার আগে আমাদের একটু ভেতরে বসবার হুকুম দাও।”

পীয়ার বললে—“এদিকে—এদিকে টেলিফোন”—

ছ’জনে ঘর ছেড়ে চলে গেল—রুস হাসিমুখে মালের দিকে ফিরল—
“বেশ, বেশ,—তাহলে আমি নিতান্তই পীয়ারের স্ত্রীর সামনে বসে রয়েছি—উঃ, তার স্ত্রী। একেবারে রক্ত-মাংসের গড়া—তাকে বুঝি এই রকম দেখতে। ও লোকটার বরাতই অমনি সর্বত্র।” সে মালের হাতে আবার চুন্ধন করল। মালের লজ্জিত হয়ে ওঠে।

“মিঃ ব্রক, আপনি বিয়ে করেন নি?”

“আমি? ও দুইই বলা চলে—ই্যা-ও না-ও। আমি একবার একটি গ্রীক মেয়ে বিয়ে করেছিলাম কিন্তু বরাত মন্দ,— সে কোথায় পালিয়ে গেল।” বলে রুস চোখ পিটপিট করতে লাগল—তারপর মুখের ভঙ্গি এমন করলে যে মালের কলহাস্ত করে উঠল।

—“আর আপনার বন্ধু, ফার্ডিন্যান্ড,— তিনি বিয়ে করেন নি?”—

“ও তার কথা বলছেন—অবশ্য কিছু মনে করবেন না, সেখানে ওর প্রাসাদের ভেতর একটা ছোট অন্তঃপুর যোগ করা আছে।”—

মালের হাসিমুখে জানলার দিকে চেয়ে মাথা নাড়ল।

ঘণ্টাখানেক পরে নবাগত বন্ধুরা স্নান শেষ করে পরিবর্তিত সাজে নীচে নেমে এল; তারপর কিছু আহারের পর পীয়ার তাদের সঙ্গে করে নিরে গেল তার সমস্ত দেখাতে। নূতন জমি কিনে কতকগুলি বাড়ী তৈরী করেছে—তার গোলা-বাড়ীতে এখন ষাটটা গরু, আগে ছিল মাত্র

চল্লিগ। “অবশ্য তোমাদের মত লোকদের লক্ষ্যে এসব হাঙ্গার তা জানি, কারণ তোমাদের যা-কিছু সব যন্ত্র জগতের কল্যাণে। কিন্তু এই আমার সংসার—এতেই আমি সুখী।” পীয়ার হাত দিয়ে দেখিয়ে দিলে, তার বাড়ী—তার গোল।

কিছু পরে তারা গাড়ী করে ছুটলে পীয়ারের কারখানা দেখতে ছোট তার কারখানা দেখাতে পীয়ার বিন্দুমাত্র সঙ্কোচ করলে না। তার নিজের কারখানার সমস্ত বিভাগ সে এমন গভীর ভাবে দেখাতে লাগল যেন এ এক প্রসিদ্ধ ব্যবসার ক্ষেত্র—যদিও তার বন্ধু দু’জন আড়চোখে তার পানে চেয়ে অতি কষ্টে হাসি চাপতে চেষ্টা করছিল।

কর্মচারীরা তাদের টুপি খুলে এদের অভিবাদন করলে—এই আগন্তুকদের তারা বিস্মিত দৃষ্টিতে দেখছিল।

ফার্ডিন্যান্ড অবশেষে বলে ফেললে—“নরওয়ের আদিম ভঙ্গিমায় আবার সব দেখে বড় আনন্দ হচ্ছে”—

—“সত্যই কি চমৎকার নয়?” * পীয়ার আনন্দের সঙ্গে বলতে লাগল - “ঠিক এই রকমই কারখানা হওয়া প্রয়োজন—এর মালিকের জীবনের সুখ ও আত্মার শান্তি তাতে অটুট থাকে।” ফার্ডিন্যান্ড ও ক্লস দৃষ্টিবিনিময় করে। কিন্তু পরক্ষণেই পীয়ার তাদের নিয়ে গেল পাশের ঘরে,— যন্ত্রপাতি সমস্ত সেখানে ছিল—কারখানার সঙ্গে কোন সম্পর্কই এদের নেই।

ক্লস বললে - “এইবার দেখ—এই গুলি পীয়ারের নিজস্ব। নিশ্চয়ই নূতন কিছু একটা তোমার মাথায় ঘুরছে?”

পীয়ার ছোটো তেরপল সরিয়ে ফেললে, তারপর একটা সাধারণ ধরনের ‘মোয়িং মেশিন’ বার করলে, তার পাশেই আর একটা নূতন ধরনের মেশিন, তার নিজের তৈরী।

“এখনও শেষ হয়নি”—কিন্তু আসল সমস্যা শেষ হয়ে গেছে”—পীয়ার বললে। পুরান একখানা ছুরী দেওয়া প্রথা-বড় বিক্রী। কিন্তু দু'খানা রেড, এক জোড়া সীয়ার—এতে কাজ হবে কত সহজ। তারপর নিজের প্রণালী সম্বন্ধে সে ছোট্ট একটু লেকচার দিলে—তার নবনির্মিত মেশিনের কাজের সরলতার বিষয়—আর বিশেষ করে—কত হালকা হবে এ মেশিন। “এই ত আসল পীয়ার”—ক্লস বললে।

“এটার দাম হবে—আমার ষা' মনে হয়—এক কোটি টাকা”—জানলার দিকে চেয়ে ফার্ডিন্যান্ড ধীরে ধীরে স্তব্ধ করল।

—“নিশ্চয়ই, আমার উদ্দেশ্য হচ্ছে চাষীদের কাজ সহজ করে দেওয়া আর খরচ কমান”—পীয়ার ফার্ডিন্যান্ডের দিকে চকিতে আবার চেয়ে নিলে।

সেদিন সন্ধ্যায় আহারের সময় একটু উৎসব হল। যখন পানীয় এল, ক্লস আনন্দে উত্তেজিত হয়ে উঠল। “পুরানো বন্ধু আমরা—আসল লাইসোলমার। তুমি এখনো বেঁচে আছ তা হলে? মনে আছে,—আমাদের সেই ছেলেবেলাকার কথা?” ক্লস তার পাত্র তুলে ধরলে—এই তরলতার মধ্যে আলোর ঝলকানি তার চমৎকার লাগে। তারা তিন বৃদ্ধিতে গান গাইতে গাইতে পান করতে লাগল—সুরার পাত্রে প্রথম চুমুক দিয়ে—আবার ফিরে আলোর দিকে চেয়ে—তাদের যৌবনের সমস্ত হারিয়ে যাওয়া দিবসে তারা যেমন ভাঁজমায় আনন্দ করত, আজও তারা তাই করলে।

তারপর তারা গল্প করতে লাগল—একটা কাহিনী আর একটা স্মরণ করিয়ে দেয়। কিন্তু মালেক লক্ষ্য করে ফার্ডিন্যান্ডের চোখের নিষ্ঠুর চাহনি—হাসলেও তার কঠিনতা লঘু হয় না।

গল্প চলতে লাগল—ইজিপ্টের সমস্ত নূতন কাজের বিষয়। পীয়ার

সবই এসব গুণতে লাগল, মালের মনে হল যেন স্বামীর দৃষ্টির রূপ বদলে যাচ্ছে। তার চোখের দৃষ্টিতে সে রুঢ়তা দেখছে—এতদিনের অপরিচিত এক নূতন ভঙ্গিমা তার মুখে ছায়া ফেলে। তার কি এই মুহূর্তে মনে হচ্ছে যে, স্ত্রী-পুত্র তার পক্ষে মিথ্যা বোঝা? জরাজীর্ণ অশ্ব আজ কি আবার ভুলে যাওয়া যুক্ত হবে জেগে উঠছে?

—“একটা চমৎকার কাজ ওখানে রয়েছে তোমার জন্তে” — ফ্যাডিগাও পীয়ারের দিকে চেয়ে গ্লাস তুলল।

“অশেষ ধন্যবাদ, তোমার অধীনে কাজ ত?”

—“কারও অধীনতা তোমার জন্তে নয়! তুমি সবার ওপরে।”

ফ্যাডিগাও আঙ্গুল উঁচু নীচু করে বুঝিয়ে দিলে। “টাইগ্রিস্ আর ইউফ্রেটিস্-এর ‘বাধ’ করতে হবে। অবশ্য সময় সাপেক্ষে কাজ।”

“অশেষ ধন্যবাদ”—বিস্ফারিত চোখে পীয়ার বললে।

“উপযুক্ত লোকের জন্তে কাজটা প্রতীক্ষা করে আছে। যোগ্যতম লোক না হলে একাজ হবে না। আমি যদি তোমার মত শক্তিশালী হতাম, তাহলে কাজটা হাতে নিতাম।”

সকলের দৃষ্টি পড়ল পীয়ারের ওপর। মালের দেখতে চায় তার স্বামীর অন্তর। কিন্তু পীয়ার হাসতে লাগল—“বহুদিনের পুরাতন ও সম্মানিত একটি নদীকে বেঁধে ফেলে আমার কি আছে আনন্দ করবার?”

“প্রথম, পৃথিবীর শস্যসস্তার অসাধারণ রকম বেড়ে যাবে—সেটা কি সুখের হবে না?”—

“না”—পীয়ার একটু বিদ্রূপাত্মক কণ্ঠে বলল।

“কিংবা ধর এই পৃথিবীর সবচেয়ে উর্বর ভূমির ওপর হাজার হাজার মাইলব্যাপী রেল চলাচলের সুযোগ।”

“তাতেও আমার উৎসাহ নেই”—

“ও”, ফার্ডিন্যান্ড মালের দিকে চাইলে—“আচ্ছা আপনিই বলুন ত, এই রকম একজন মধ্যযুগের লোকের সঙ্গে বিয়ে হয়ে আপনার কি মনের অবস্থা!”

“কি, কি বললেন”—মালের কথা আটকে যাচ্ছে।

“ঠিক তাই। আপনার স্বামী সময়ের প্রভাবের বাইরে। ও যদি ইচ্ছে করত ত সম্রাট হতে পারত—সভ্যতার সংগ্রামে ও নিতে পারত সেনাধাক্কের স্থান। নিজের শক্তিকে ও অবহেলা করছে—দেখবেন এমন একদিন আসবে যেদিন ওর মনে জ্বলবে বিদ্রোহের আগুন। আমার কথাটা মনে রাখবেন।”

মালের হাসল তারপর দ্বিধার সঙ্গে পাত্র তুলল—পীয়ারের দিকে সে ঝাঁক চাহনিত্তে চাইলে।

“আপনার স্বামী প্রকাণ্ড স্বার্থপর—আত্মাভিমानी। শুধু সুখ খুঁজে বেড়াচ্ছে ও।”

“আপনার কি মনে হয় খুব দোষের কাজ করছেন?”

“ও নিজের জীবনকে মিথ্যা সোনার সূতা বলে ভুল করছে।” ফার্ডিন্যান্ড বিনীতভাবে মালের দিকে চাইলে—কিন্তু চোখের দৃষ্টি তার ইম্পাতের মত শাগিত।

“কিন্তু তাতে দোষ কি?” তরুণী স্ত্রী দৃঢ়তার সহিত বলল।

“এ অত্যন্ত অন্যায্য। তার অমর আত্মার অবমাননা হচ্ছে এতে। নিজের জীবনকে নষ্ট করবার অধিকার মানুষের নেই। একজনের ব্যক্তিগত সুখের দিন কেউ মনে রাখবে, কিন্তু তার কীর্তি অমরতা লাভ করবে। বিশেষ করে আপনার স্বামী—কি অধিকারে ও সুখে থাকতে পারে। জগৎ সকলকে এক রকম চোখে দেখে—হয় ইচ্ছন নয়, জ্যোতি,

মানুষ তাকে কাজে লাগায়। আর পীয়ার—আপনার স্বামী—ও শুধু ইন্ধনের জন্য তৈরী হয় নি।”

মালেক তার স্বামীর দিকে চাইলে। পীয়ার হাসছে, কিন্তু হঠাৎ তার দৃষ্টি কঠোর হয়ে উঠল। ঠোঁটে ঠোঁটে চেপে সে খাবারের পাত্রে দিকে চাইলে।

এমন সময় নাস'এল ছোট্ট লুইসকে কোলে করে—প্রত্যেকের কোলে সে একবার গেল। কিন্তু তাকে যখন ফাডিগ্গাণ্ডের কাছে নিয়ে যাওয়া হল, সে তাকে স্পর্শ করলে না—মালেক তার চোখে স্পষ্ট অনুভব করতে লাগল। পীয়ারের প্রতি তার তিরস্কারের দৃষ্টি—“এই রকম বন্ধনে নিজেকে দিন দিন তুমি জড়িয়ে ফেলছ?”

“মাপ করবেন”—হঠাৎ সে উঠে হাতঘড়ির দিকে তাকাল—“আমাকে একবার টেলিফোনটা ব্যবহার করতে হবে।” তারপর সে চলে গেল। রুস অন্ত সন্ধ্যার পানে চেয়ে মাথা নেড়ে বললে—“ও যেখানেই থাকুক না কেন, ঘণ্টায় একটা টেলিফোন না করলে ও মরে যাবে।”

বেলকনিতে কফি দেওয়া হল। তারা বসে বসে ধূমপান করতে লাগল। প্রমথ শরতের ধূসর গোখুলি। গিরিশ্রেনী যেন বহু দূরে বলে বোধ হয়—গাঢ় নীল তাদের অঙ্গের আভা। বনফুলের গন্ধে চারিদিক আমোদিত। অল্পপরেই মালেক উঠে শুভরাত্রি জানাল। তারপর তার শোবার ঘরে একলা তার কাছে বড় কঠিন হয়ে উঠল এই প্রশ্ন—আজকের ব্যবহারে গল্পে সে সত্য স্মৃতি হয়েছে কি না! সে স্পষ্ট বুঝতে পারছে—এই দু'জন আগন্তুক তার স্বামীকে এতদিনের আনন্দবিলাস থেকে দূরে সরিয়ে দেবার চেষ্টা করছে। কিন্তু বড় অদ্ভুত তার স্বামীর ব্যবহার। রুস ব্রকের সঙ্গে প্রাণ খুলে সে গল্প করে, কোতুক-পরিহাস করে, কিন্তু যখনই ফাডিগ্গাণ্ড তার সঙ্গে কথা কয়—নিজেকে যথাসম্ভব সাবধানে রেখে সে

উত্তর দেয়—আর যখনই তিনি প্রতিবাদ করেন, তার চোখে যেন অবহেলা ফুটে ওঠে। বিরাট হলদে খালার মত চাঁদ পাহাড়ের পূর্ব দিয়ে ধীরে ধীরে উঠছে—কালো জলে যেন সোনার ঝিকমিক তিন বন্ধু বারান্দায় বসে নিস্তরক রাত্রে চেয়ে দেখছে বিশ্বপ্রকৃতির এই রূপ।

“তাহলে নিতান্তই তুমি এখানে আলস্য দিন কাটাতে চাও”— ফাউন্টাণ্ড তার পানীয়ের পাত্রে চুমুক দিলে।

“তুমি আমার বলেছ”—পীয়ার সামনের দিকে একটু ঝুঁকে জিজ্ঞাসা করে।

“আমি শুনলাম যে, তুমি দিনে আর রাত্রে শুধু এখানে স্থখ খুঁজে বেড়াচ্ছ ওরকম জীবনকে আমি অনসতা ছাড়া আর কিছু বলি না”—

“ধন্যবাদ”—

“নিশ্চয়ই—কিন্তু মনে মনে তুমি অসুখী। প্রত্যেকেরই তাই হয়—নিজের শক্তি ও সামর্থ্যকে যে না কাজে লাগায় তারই ওই দশা।”

“অশেষ ধন্যবাদ”—পীয়ার হাসিমুখে উত্তর দিলে। ক্লস চেয়ারে সোজা হয়ে বসল, ঘটনা কোন দিকে ঘুরছে তার বড় সন্দেহ হয়।

ফাউন্টাণ্ড সামনের ওই হ্রদের জলে দৃষ্টি স্থির করে বসে আছে। “তুমি তোমার নিজের ব্যবসা মাটি করছ—তোমার ইঞ্জিনীয়ারীং।”

“সত্যিই তাই।”—পীয়ার বলে।

“তার কারণ।”

“কারণ নূতন কিছুই সন্ধানের মধ্যে সুন্দরতার অপমান হতে দেখছি প্রচুর সোনা, দ্রুততর গতি, খাওয়ার প্রাচুর্য—বল এই আমাদের লক্ষ্য নয়?”

“শোন বন্ধু, অর্থ মানেই স্বাধীনতা। আর আহারই জীবন। গতি

আমাদের অলস মুহূর্তেই সজীব করে রাখে। মানুষের জীবনের সম্ভাবনা
 বিগুণ বাড়ছে জান—আর তুমি তাতে সাহায্য করতে বাধ্য।”

কিন্তু সংখ্যা তাদের বাড়িয়ে লাভ কি? কোটি কোটি কলের মানুষ
 —সেই কি তোমার লক্ষ্য?”

“ওসব কথা ছেড়ে দাও”—রুস অধীর হ’য়ে ওঠে—“আমাদের প্রিয়
 নরওয়ের কথাই ভাব, মনে কর নরওয়েবাসীর সংখ্যা যদি এত বাড়ত যে,
 পৃথিবীর লোক তার অস্তিত্ব স্বীকার করতে বাধ্য হ’ত—সেটা কি
 সমাজের সৌভাগ্য হ’ত না?”

“নিশ্চয়ই হ’ত”—পীয়ার ধীরে ধীরে বলল।

“কি করে যে তুমি এত অল্পতায় সুখী হতে পার—আশ্চর্য্য”—

“আমি চাই না সমস্ত নরওয়ে শুধু কলকারখানা আর দুর্গের আবাস
 হোক। আমাদের এখানে শান্তি—তাই থাক না কেন!”

“কিন্তু যন্ত্রদানব তা হতে দেবে না”—ফাডিন্যাণ্ড বললে—যেন এই
 চন্দ্রালোকে ও জলের মধ্যে কাকে দেখতে পেয়েছে।

“কি? কি বললে তুমি?”—পীয়ার বিস্ফারিত চোখে চেয়ারে সোজা
 হয়ে বসল।

কিন্তু ফাডিন্যাণ্ড তার কথায় কান দিলে না—“যন্ত্রদানব ছুটে চলেছে
 সামনে, শান্তি কিছুতেই নেই। অগ্নি—সে ত চূপ করে থাকবে না।
 আর প্রোমেথিয়াস তারও লক্ষ্য অনন্ত। এখনও অনেক শিলা অতিক্রম
 করে মানুষকে চরম সত্য উপনীত হতে হবে; শান্তি? তা হয় না
 কিছু, আমাদের মানুষের ইন্দ্রিয়াতীত সমস্ত শক্তি আমাদের চালিয়ে নিয়ে
 যাচ্ছে।”

পীয়ার মূহূ মূহূ হাসছে। সে একটা সীগার ধরাল। ফাডিন্যাণ্ড
 চেয়ারে হেলান দিয়ে তার বক্তব্য বলে যাচ্ছে—ওই সোনার বরণ চাঁদের

দিকে চেয়ে—“টাইগ্রিস আর ইউফ্রেটস, সিন্ধু আর গঙ্গা—যা কিছু বাকি আছে আমাদের এই পৃথিবীর—সমস্ত পৃথিবীকে উন্নত, ~~এবং~~ কল্যাণ তুলতে হবে—এর পরিণাম কি? মাত্র কয়েক বৎসরের চেষ্টার তিন বৎসর এত অতি তুচ্ছ স্মৃতি মাত্র। দেখ, আর দুই শতাব্দী পরে এই গ্রহে আর কিছুই থাকবে না—যেখানে মানুষের আকাজক্ষার অবসান হয়নি। তারপর আমরা যাব গ্রহ হতে গ্রহান্তরে সাম্রাজ্য বিস্তারে।”

এক মুহূর্ত সব চুপচাপ—তারপর পীয়ার আরম্ভ করলে।

“তাতে আমাদের সমূহ লাভ কি হ’ল?”

“তুমি কি মনে কর, মানুষকে শুধু চিরদিন ভুলিয়ে রাখা যাবে এই কথা বলে যে, এই শেষ আর নয়। অর্ধশতাব্দী পরে সমস্ত সূর্যমণ্ডল চালিত হবে মানুষের বুদ্ধির দ্বারা। বাধা-বিপত্তি ছরুহ হয়ে উঠবে, তা’ জানি। গ্রহে গ্রহে সংগ্রাম চলবে—কতকগুলি গ্রহ আর কতকগুলির বিরুদ্ধে বুদ্ধি ঘোষণা করবে—তা জানি। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রহ বৃহত্তর গ্রহের দ্বারা শাসিত হবে। এই সব ভেবে ভেবে পিছিয়ে যাবার কি আছে? মানুষ যে অনাগত শাসিত কাল ব্যেপে শুধু প্রকৃতিকে পরাজিত করবে পদে পদে—এতে সন্দেহ কি! বিশ্বমানবতার বাসনার অন্ত নেই। আমাদের বাধা দেবার ক্ষমতা কোথায়? মানুষ যখন প্রশ্ন করতেই ভুলে যাচ্ছে—সুখ কোথায়? বিশ্বব্যাপী লালসা অনন্তের আকাজক্ষিত, সে ত পরীক্ষা করছে—এই বিশ্বসংগ্রামে কে যোগ্যতর, কে অসহায় এবং এই ঠিক।”

“তারপর মৃত্যু যখন আসবে তখন কি ভাবব”—পীয়ার জিজ্ঞাসা করলে।

“তুমি? নিজের প্রতি চিরদিনের দরদ আজও তোমার আছে? অনন্তকাল বাঁচবার আশা তুমি রাখ? শোন বন্ধু—তোমার নিজের কান অস্তিত্ব নেই। সমগ্র বিশ্বে শুধু একজন আছেন, তিনি আমাদের

সকলকে ভরে রেখেছেন। তারপর এমন দিন আসবে, যখন বিশ্ববিধাতা আমাদের সম্মান করে চলবেন। মানুষ একদিন বসবে বিচারকের সিঁড়ি সেদিন হবে দেবতাদের বিচার—এ বিশ্ব রহস্যের সমাধান হবে শুধু সেইদিন—অনাদি শক্তি যেদিন পশু হয়ে যাবে। মানুষের সঙ্গে সেদিন বোঝাপাড়া হবে দেবতাদের। আমার কথাগুলো লক্ষ্য কর—আমাদের প্রত্যেক মানুষের অন্তরে একটি মাত্র ধর্মভাব জাগছে—সেই আমাদের মাথা তোলার শক্তি দিয়েছে, চলতে শিখিয়েছে—আমরা ভুলে গিয়েছি সেই বিরাট আনন্দে— আমরা ক্রীতদাস, আমরা মরণশীল মানুষ মাত্র।”

ইঠাৎ যেন সে চমকে উঠল—তারপর হাতঘড়ির দিকে চেয়ে বললে—
“মাপ কর, টেলিগ্রাফ অফিস যদি খোলা থাকে”—বলেই সে বেরিয়ে গেল।

তারপর যখন সে ফিরে এল—তখন রুস আর পীয়ার তাদের শৈশবের সেই চঞ্চল দিনগুলির কথা স্মরণ করে উৎফুল্ল হয়ে উঠেছে।

“মনে পড়ে, আমরা সেই হাঙ্গার শিকারে গিয়েছিলাম?”—রুস জিজ্ঞাসা করলে।

“হ্যাঁ হ্যাঁ, সেই হাঙ্গারটা—হ্যাঁ! মনে পড়ছে—তুমি বীরের মত শুধু একটা ঘুসির জোরে সেটাকে পঞ্চদশ পার্টিয়েছিলে। আর সেই—ভাই দড়িটা কেটে দাও—দড়িটা কেটে দাও ভাই—বাড়ী ফিরে চল”—ছেলে-মানুষী ভঙ্গিতে বলে পীয়ার হেসে লুটিয়ে পড়ল।

“আঃ তোর সব তাতেই শুধু রসিকতা। সে কথা যাক—আচ্ছা তার পর আর কখনও সেখানে গিয়েছিলি?”—

পীয়ার বললে—“হ্যাঁ।” এই ত গত বছর সেখানে সে গিয়েছিল। তার পালক পিতামাতা সবাই মারা গেছে—এমন কি পীটার রনিগেন

—সেও মারা গেছে। কিন্তু সেই যে মার্টিন ~~এভেংকুড~~—সে আজও তার সেই ছোট কুড়েতে আটটি ছেলেমেয়ে নিয়ে রাজত্ব করছে।

“অভাগা”—রুস সহানুভূতির সুরে বললে।

তিন বছর!

ফার্ডিন্যান্ড ততক্ষণে আবার বসে পড়েছে—এবার সে টাদের দিকে চেয়ে মাথা নেড়ে বললে, “আচ্ছা সেই বড়োটাকে হাজার ক্রাউন পাঠিয়ে দিলে হয় না?”

খানিকক্ষণ চুপচাপের পর ফার্ডিন্যান্ড বললে—“আমি যদি তোমাদের সঙ্গে যোগ দি তবে দোষ হবে কি?” সে তার ওয়েষ্টকোটের পকেট থেকে ৫০০ ক্রাউনের একখানা নোট বার করলে—“কিছু যদি মনে না কর।”

পীয়ার তার দিকে একবার চেয়ে নোটটা হাতে করে নিলে—“গরীব মার্টিনের কথা ভেবে আমার কি যে আনন্দ হচ্ছে। এই ত সব সমেত তার বরাতে হল দেড় হাজার ক্রাউন।”

রুস হৃৎজনের পানে চাইলে—তারপর হাসতে লাগল। তারা কিছুক্ষণ বাজে কথায় সময় কাটালে—তারপর হঠাৎ সে জিজ্ঞাসা করলে—“পীয়ার ব্রিটিশ কারবাইড কোম্পানীর বিজ্ঞাপনটা তুমি দেখেছ?”

“না—কিসের বিষয়।”

“তারা বেসনার প্রপাতের বাঁধ দেওয়ার যন্ত্র খুঁজছে, তোমার মত লোক তারা চায়।”

—“না না,”—ফার্ডিন্যান্ড ঝপ করে বলল—“অত ছোট কাজ ও নেই না। পীয়ার আমাদের সঙ্গে ইউফ্রেটিসে যাচ্ছে।”

—“কত টাকার কাজ হবে আন্দাজ?”—পীয়ার জিজ্ঞাসা করলে।

—“আমাদের যা মনে হয়, দু কোটি ক্রাউন বা সেই রকম কিছু হবে”

—রুস জবাব দিলে।

“ও কাজ পীয়ারের হওয়া উচিত নয়”—ফার্ডিন্যান্ড চেয়ার থেকে উঠল—হাত দুই উঠেছিল—বাঁ হাতে সেটা গোপন করে সে বললে—
কিছু বার্তা এখন থাক। গুডনাইট, গুড নাইট।”

তার ঘণ্টা দুই পরে সমস্ত বাড়ী যখন নিব্বুম হয়ে পড়েছে পীয়ার তখনও জেগে—প্রকাণ্ড হলটার হান্কা শ্লিপার পরে ঘুরে বেড়াচ্ছে। মাঝে মাঝে জানলার বাইরে সে তাকায়। ঘুম তার আসছে না কেন? আকাশে চাঁদ পাণ্ডুর হতে পাণ্ডুরতর হচ্ছে—উষার আলো আসি আসি করছে।

(৮)

পরদিন সকালে মালের তার ভাঁড়ারে দাঁড়িয়েছিল, হঠাৎ পদশব্দ শুনে সে পেছনে তাকাল। ক্লস ব্রক আসছে।

“সুপ্রভাত—ও আপনাকে প্রাতঃসাজে বুঝি এমন দেখায়? শুধু আপনার জন্মেই এসব সাজ সৃষ্টি হয়েছে—আপনি যেন ‘ঘীরল্যাণ্ডাজো—
ন।— স্বয়ং “এম্পাসিয়া।”

“আপনি এত সকালে উঠেছেন”—মালের হঠাৎ জিজ্ঞাসা করে।

“তাই নাকি? তাহলে ফার্ডিন্যান্ড হলম—সে ত সূর্য্যোদয়ের পূর্বে চিঠি লিখতে বসে গেছে। আপনাকে কিছু সাহায্য—এই চর্কির বাস্কাটা সরিয়ে দেব? বেশ, বেশ—আপনার ত বেশ গায়ে জোর আছে? কিছু দেখুন, মেয়েদের ব্যাপারে আমি চিরদিনই একটু বেসামাল ”

“সত্যি”—মালোঁ তার দীর্ঘ আঁখিপাতার মধ্য দিয়ে ক্লসকে একবার দেখে নিলে।

“জানেন, আমার প্রথমা প্রিয়তমা কে?”

—“না, কেমন করে জানব বলুন”—

—“তবে শুনুন, সে হচ্ছে লুইস—পীয়ারের বোন। আপনার যদি তার সঙ্গে পরিচয় থাকত।”

—“আর তারপর”—মালোঁ এই ধনী লোকটির দিকে তাকাল—একে দেখলে মনে হয় জগতের কোন দুঃখই একে স্পর্শ করতে পারবে না।

—“তারপর—তারপর? মনে করতে দিন। হ্যাঁ, তারপর আমি আর কোন মেয়েকে ভালবাসিনি’ শুধু”—

—“শুধু?”—

“শুধু একজন ছাড়া। সে হচ্ছেন আপনি।”

—“ধন্যবাদ।”

—“সুতরাং একজন সহৃদয় গৃহস্থ-বধুর মত আপনার কি উচিত নয় আমাকে একটা”—

—“একটু চর্কি দেওয়া?”

—“না, না, চর্কি নয়। তার চেয়ে ভাল কিছু।”

—“কি, বলুন।”

“একটি চুমো। আমি এখন তা নিতে পারি, দেখবেন?” ক্লস ব্রক এক পা এগিয়ে গেল আর মালোঁ হাসিমুখে পালাবার পথ খুঁজতে যেয়ে দেখে, তার ও ঘরের মধ্যে ক্লস দাঁড়িয়ে আছে।

“বেশ, আমার জন্ত একটু কাজ করে দিতে হবে। ওই মইটা দিয়ে ওপরে উঠে যান।”

“এ ত ভারী মজা”—তার বলিষ্ঠ দেহের ভারে কাঠের মইটা মড় মড় করতে লাগল।
 “কি ত দূর উঠছে হবে?”

“সবচেয়ে উচ্চ সেলফে—ওই যে মস্ত ব্রাউন জার, ওতে আছে ক্ল্যানবেরী—কিন্তু খুব সাবধান”—

“চমৎকার। নিশ্চয় প্রাত-রাশের সময় ‘ক্ল্যানবেরীর’ আচার পাতে পড়বে।” তারপর বুড়ো আঙ্গুলে ভর দিয়ে কোন প্রকারে ভারী জারটা ধরে সে দাঁড়িয়ে রইল—তার মুখ রাঙা হয়ে গেছে।

“তারপর?”

“ওটা সাবধানে ধরে একটু অপেক্ষা করুন, আমি একটা কিছু নিয়ে আসি”—মালের দ্রুত বেরিয়ে গেল।

ক্লস মইএর আগায় দাঁড়িয়ে রইল, শূণ্যে সেই ভারী জারটা ধরে। সে নীচে তাকাল। এরকম করে দাঁড়িয়ে থাকা? কিন্তু পাশের ঘরে কে যেন ‘পিয়ানো’ বাজাচ্ছে। ওকে কি ক্লস ডাকবে নাকি? মুখ তার ক্রমশ রক্তবর্ণ ধারণ করছে—তবুও মালের দেখা নেই।

তারপর খুব জোরে সে জারটা যথাস্থানে রেখে দিয়ে নেমে এল—এবং পাশের ঘরে যখন গিয়ে সে দাঁড়াল, তখন নিঃশ্বাস তার জোরে জোরে বইছে।

“বেশ বেশ—আমি কিনা...আর আপনি এঘরে বসে পিয়ানো বাজাচ্ছেন”—

“সে কি? আপনার গান ভাল লাগে না, হের ব্রক?”

—“এর প্রতিশোধ আপনি পাবেন, দেখুন স্তূদে আসলে আমি কি করি”—ব্রক ওপরে চলে গেল গজর গজর করতে করতে।

ক্লস যখন এল তখন পীয়ার তার নিজের ঘরে লেখার টেবিলে—

“আমি এই চিঠিটা পাঠিয়ে দিচ্ছি মার্টিন ব্রুভোল্ডকে—এর মধ্যে নোটগুলো আছে। তলার কি সই আছে, জান! ~~হান্সার~~ ~~ব্রুভোল্ড~~ ~~কাজ~~ ~~থেকে~~।”

“হ্যাঁ, ফার্ডিন্যান্ড চমৎকার মতলব করেছে। আচ্ছা বল দেখি, চিঠি খুলতেই যখন নোটগুলো বেরিয়ে আসবে তখন বুড়োর কি মনে হবে?”

খামের উপর ঠিকানা লিখতে লিখতে পীয়ার বলল,—“আমার বড় দেখতে ইচ্ছা করছে।”

ক্লস একটা চামড়ার আর্মচেয়ারে বসে পড়ল—“বুঝলে পীয়ার তোমার স্ত্রীর সঙ্গে এতক্ষণ রসিকতা করছিলাম। অদ্ভুত মেয়ে বটে।”

পীয়ার একবার তার এই বন্ধুটির দিকে চাইলে। সেই তরুণ যৌবনে এই মোটাসোটা ডাক্তারের ছেলে শহরের প্রত্যেক মেয়ের পেছনে ঘুরত। আজও তার সেই প্রবৃত্তি আছে। কিন্তু নানা দেশের আচার ব্যবহার দেখে একটু ভদ্র হয়েছে মেন—বাহিরের আচরণ সহজ সুন্দর হয়েছে।

—“আমি কি করছিলাম জান—হ্যাঁ, ফার্ডিন্যান্ড কি-রকম লোক—চমৎকার! না?”

—“হ্যাঁ”, পীয়ার অপ্রতিভ ভাবে উত্তর দিলে।

—“কালকে আমার মনে হচ্ছিল, আমরা তিন বন্ধুতে ~~যখন~~ আবার সেই ফেলে-আসা দিনগুলিতে ফিরে যাচ্ছি। আমি ~~ক্লস~~ ~~থ~~ তার কথা শুনি, মনে হয় ও ঠিক বলছে—আবার তুমি যখন তর্ক ~~নতে~~ তখনও মন আমার কোথায় সায় দেয়—আচ্ছা আমার জ্ঞানের গভীর ~~তে~~ খুব কম—না?”

—“আচ্ছা, তোমার ষ্টিমপ্লাউ—তারা নিজেরাই কাজ করে, আর”

তোমার ~~কথার~~ নারীরা আর ত তোমায় বিরক্ত করে না—তবে একটু

—“ওকথা বল না ভাই”—রুস দীর্ঘশ্বাস ফেললে। আজ এই মুহূর্তে পীয়ারের মনে হ’ল—রুসের মুখে এর মধ্যেই বার্কক্যের ছাপ পড়েছে।

—“ওকথা থাক। যত কম আলোচনা করা যায় ততই ভাল। কিন্তু একটা কথা—কিছু মনে ক’রোনা তাহলে—আচ্ছা, ফার্ডিন্যান্ড কোনদিন তোমায় ভাই বলে সম্বোধন করে নি?”

ক্রোধ-রক্তিম মুখে পীয়ার উত্তর দিলে—“না—কখনই না”।

—“না, কখনো না”!

—“এই পৃথিবীতে আমি সবচেয়ে ধনী ওর কাছে। কিন্তু সে আমাকে আত্মীয়ের মত দেখে না, দয়ার পাত্র ভাবে—সে বিষয়ে কোনদিনই সে কিছু প্রকাশ করে নি।”

—“ওই ওর ধরণ। অদ্ভুত স্বভাব। কিন্তু আর একটা কথা”—

—“কি, বল”?

—“কথাটা আমার বলা উচিত নয়। আমি জানি না যে, তোমার সমস্ত সম্পত্তি পৃথিবীর সবচেয়ে ভাল যৌথ কারবারে খাটছে কি না।”

—“হ্যাঁ, আর তোমারও ত”—

—“ও আমার! তোমার তুলনায় সে ত অতি তুচ্ছ। আচ্ছা, আজও কি ফার্ডিন্যান্ডের কোম্পানীতে তোমার সমস্ত টাকা খাটছে?”

—“হ্যাঁ আমি ভাবছি যে, আমার কতকগুলো শেয়ার বিক্রী করব। আয়ের চেয়ে খরচটা আমার কিছুদিন বেশী হচ্ছে।”—

—“এখন বিক্রী ক’র না যেন। কিছুদিন হ’ল কেনাদামের চেয়েও দাম পড়ে গেছে”।

—“সত্যি—কেনা দামের চেয়েও কম। কই আমি ত সে খবর পাই নি”!

—“অবশ্য বেশী দিন এ রকম থাকবে না। আবার কিছুদিনের মধ্যেই এর চাহিদা বাড়বে—তখনই এর দাম হু হু করে বাড়বে। কিন্তু খেদিবের ক্ষমতা যথেষ্ট রয়েছে, আর ওর মত বদখেয়ালী খরিদার আর নেই। ফার্ডিন্যান্ড, ওর কেবল চাই প্রসার—নিত্য নূতন, আজকে ও কিনবে একটা প্রকাণ্ড জমি, কাল একটা মরুভূমি,—এমনি ওর আকাঙ্ক্ষা। আর জল সেচনের ব্যবস্থার জন্ম ও কেবল চায় প্রকাণ্ড ভাবে কাজটা করতে; কারবার, কাজের বৃহত্ত্ব যত বাড়বে, খরচের দিকটা সেই অনুপাতে করবে। কিন্তু খেদিব এতে পিছিয়ে পড়েছেন। ওর খেয়াল আজকে এমনই, কালই হয়ত মত দিতে পারেন—কিন্তু তুমি ত কিছুই জানতে পারবে না। বিশেষ করে তোমার যদি মনে হয়ে থাকে যে, ফার্ডিন্যান্ড ওই বদখেয়ালীর কাছে আত্মসমর্পণ করবে—তাহলে তোমার মস্ত ভুল হবে। তার ইচ্ছা যে সমস্ত প্রসিদ্ধ রাজধানী সব সে কিনে নেবে। তাতে তোমার কি মত? খেদিবকে এসব দিক থেকে সরিয়ে ফেলতেই হবে। একটা মস্ত বড় ব্যাপার, তা জানি—কিন্তু আমার অবস্থা যদি তোমার মত হ’ত তাহলে দাম একটু বাড়লেই সমস্ত শেয়ার বিক্রী করে আমি দেশে ফিরে আসতাম। তারপর এইখানে স্বদেশে একটা কিছু কাজে হাত দিতাম। এখানেও ত অনেক রকম প্রয়োজন আছে—এখানেও ত কাজ করা চলে।”

পীয়ার একটু জ্রকুটি করলে—কিছুক্ষণ সে চুপচাপ বসে রইল। তারপর কথা কইলে—“তা হতেই পারে না—আমাদের দু’জনের মধ্যে কেউ যদি পিছিয়ে আসে—সে কখনই আমি হব না—তাতে যা হবার হোক”।

“তাহলে আমার আর কোন কথাই বলা চলে না। আচ্ছা এখন আসি।”—ক্লম চলে গেল।

পীয়ারের সদ্যজাত একটি পুত্রের নামকরণ উপলক্ষে লোরেঞ্জো বিরাট ভোজ ও উৎসবের আয়োজন করা হয়েছে। পীয়ার পরিপূর্ণ আনন্দে ঘুরে বেড়াচ্ছে! তারপর ভোজ টেবিলে ঠিক হ'ল যে, পুত্রের জন্মোৎসব ইথিওপিয়ান ষ্টাইলে অনুষ্ঠিত হবে—বনভোজন ও নৌকাবিহার তার অঙ্গস্বরূপ থাকবে।

সেদিন সন্ধ্যায় কালো মেবে চাঁদ ঢাকা পড়ে, কিন্তু কলহাস্তমুখরিত তরুণীগুলি গভীর কালো জলের ওপর নাচতে থাকে। একটি তরুণ উকীল—তার মাথায় একটু ছিট আছে—সে আর একজন স্ত্রীর কোলে বসে কণসাঁটিনা বাজাচ্ছে—আর শহরের অগাণ্ড বাসিন্দারা বাতায়নে বাতায়নে দাঁড়িয়ে এ আনন্দ-উৎসব গান বাজনা উপভোগ করছে।

তারপর রাত্রির অন্ধকারে দীঘির তটে প্রজ্জ্বলিত অগ্নির পাশে—অভাগত সজ্জনেরা ঘাসের ওপর ছোট ছোট দলে বসে গল্পে মেতে ওঠে—কোথাও-বা ছ' একটি তরুণ-তরুণী অতি ধীরে ধীরে গুঞ্জরনু করে।

মাল্‌ও পীয়ার এমনি একটি আগুনের পাশে দাঁড়িয়ে আছে—মুখে তাদের রক্তিমাতা; পরস্পরের মুখের পানে চেয়ে তারা হাসে—তারপর পীয়ার স্ত্রীর হাত ধরে তাকায় দূরে তাদের প্রাসাদের দিকে—অন্ধকারে আকাশের সামনে বাতায়নে বাতায়নে আলো যেন জোনাকি-পোকাকার নত স্থিরভাবে জ্বলছে।

—“আচ্ছা এই যদি আমাদের শেষ-উৎসব করা হয়—তাহলে?”—

—“পীয়ার, এসব কি তুমি বলছ?”

—“কিছু না—মনের মধ্যে একটা নূতন অনুভূতি এসেছিল। মনে হচ্ছে মাল্‌, যেন পুরানো জীবন ফেলে দিয়ে আমরা আবার একটা নূতন

কিছুর অন্তে প্রস্তুত হচ্ছি, কিন্তু কি আনন্দ মাল্—আজকের সমস্ত দিনে পরিপূর্ণ উৎসব”—

“কিন্তু পীয়ার তুমি কেন”—আর বলা হ'ল না, ততক্ষণে পীয়ার চলে গেছে ছোট একটা দলের কাছে—তারপর মুহূর্তের মধ্যে সে হাসি-আনন্দে মেতে যায়।

বন্ধু দু'জনের বিদায়ের দিন ঘনিষে এল। পীয়ারের ছেলে লোরঞ্জকে যে উপহার দিয়েছে, হল-ঘরের মেঝেতে সেটা দাঁড় করিয়ে রাখা হয়েছে। মানুষ-প্রমাণ “মান গড় রী হরমাচিস” এর একটা মূর্তি—লাল গ্রেনাইটের তৈরী—আলেকজেন্দ্রিয়া থেকে তাদের ‘গডফাদারের’ আনা—তার দু'পাশে দুটো ‘পামের’ টব। মূর্তির নিশ্চিত চোখ দূরদিগন্তের পানে নিবদ্ধ হয়ে আছে।

পীয়ার ঘাটের কাছে দাঁড়িয়ে তার বন্ধুদের বিদায় দিল। স্টীমার চলে যায়—পেছনে অসীম জল—বন্ধুদের ঢেউ তুলে যায়।

পীয়ার ফিরে এসে তার বাড়ীর দিকে তাকাল—তার গোলাবাড়ী প্রাসাদ-বন, ছেলে-মেয়ে, মাল্—সবই আজ তার কাছে নূতন ঠেকছে—রহস্যময় তার দৃষ্টি বড় করুণ দেখাল মাল্‌র চোখে।

পরদিন সারারাত বসবার ঘরে সে একা পায়চারী করেছে—বাতায়নের বাহিরে ঘন অন্ধকার জমাট বেঁধে আছে।

নিজের জীবনে সে কি শুধু মিথ্যা স্বর্ণসূত্রে গাঁথবার চেষ্টা করেছে? মিথ্যা—মায়ার মধ্যে, বিশ্বতির ঘন ষবনিকার অন্তরালে?

সে কি আঙনের দীপ্তি? না, সে কেবল মাত্র ইন্ধন? ..

কি তার আকাঙ্ক্ষা—কিসে তার সুখ? তার শেষ কোথায়? শৈশবে মনে হ'ত এ একটা বিরাট ধর্মসঙ্গীত, এ ভজন। আর আজ? হায় ভগবান! কিন্তু ভগবান ত অলসতার মধ্যে ধরা দেন না।

তোমার বিবাহ, তোমার গৃহস্থালী, তোমার পিতৃত্ব, আত্মীয় পরিজন, পল্লীশ্রী—সবার মধ্য হতে তুমি শুধু আনন্দ আহরণ করেছ, কিন্তু তোমার ক্ষুব্ধিত অন্তরাত্মা আজও কৰ্ম্মপ্রেরণায় চঞ্চল—সে কি জীবন-সংগ্রামে পেছনে পড়ে থাকবে ?

কাজ—‘বের্ণা’ প্রপাতের বাঁধ করবার কাজ—তোমার নেওয়া উচিত। কিন্তু সে কি তুমি পারবে ? যদি তুমি দেহ মন দিয়ে চেষ্টা কর—নিশ্চয়ই পারবে ? কিন্তু কি প্রয়োজন আছে তার ?

এতদূরে এসে আজও কি তুমি মোয়িং মেসিন নিয়ে কাজ করছ না ? স্পষ্ট অনুভব করতে পারছ যে, নিজের কাজ তুমি কিছুতেই ছাড়তে পারছ না—ইম্পাতের সঙ্গ তোমার পক্ষে অপরিভ্যক্ত হয়ে পড়েছে—তুমি একান্ত অসহায়।

এতদিন তুমি যে আলস্য বিলাসে দিন কাটালে, সে শুধু মিথ্যা মরীচিকাকে উদ্দেশ্য করে ! ইম্পাতের নিজের ইচ্ছাশক্তি আছে। তোমার অন্তরে সে গাইছে ইম্পাতের সঙ্গীত—অন্তরে বাহিরে তোমার মুক্তি নেই।

বিশ্বের সঙ্গে পা মিলিয়ে চলতে শেখ।—না পার—তোমার জীবন ভিত্তিহীন।

সারারাত্রি পায়ার খালি পায়চক্রী করতে লাগল অবিশ্রান্তভাবে। পরদিন সকালে সে ছুটল রাজধানীর দিকে। তার গাড়ী চলে গেলে, মাল্‌নে নিজের মনেই বললে—“ওর কথাই ঠিক, নূতন কিছু আসছে আমাদের জীবনে।”

পীয়ারের কাছ থেকে একখানা ছোট চিঠি এল—“জমির তদারকে এসেছি। শীঘ্রই ফিরছি।” তার এক পক্ষ পরে পীয়ার ফিরল, বগলে তার ম্যাপ, প্ল্যান ইত্যাদি। “চিরদিনের মত এবারও দেবী হয়ে গেল”— পীয়ার বললে—“একটু অপেক্ষা কর।” নিজের বসবার ঘরে সে খিল এঁটে দিল। তখনই মালেক জানতে পারলে এই মানুষটির কর্মরত রূপ কি? সকালে মালেক শুনতে পেল স্বামী তার নিজের ঘরে পায়চারী করছে শীঘ্র দিতে দিতে। তারপর চুপচাপ—হয়ত সে তার টেবিলের পাশে দাঁড়িয়ে ছবি আর অঙ্ক নিয়ে মত্ত। তারপর আবার পায়চারী। তার এই শীঘ্র দিয়ে গান করা একটা নূতন আবিষ্কার। তার মনের কোন আনন্দের এ উচ্ছাস যেন, হয়ত কোন প্রেমের স্বপ্ন, অথবা সৌন্দর্য্য কিংবা বিলাসে অতিবাহিত অলস মনের সাময়িক মত্ততা। একটা প্রকাণ্ড প্রপাতের প্ল্যান করতে করতে গাইতে কি দোষ? গণিত নীরস, তা ঠিক, কিন্তু তার মধ্যে এমন জিনিষ আছে যা আনন্দ দিতে পারে। পীয়ার গলা ছেড়ে গান গায়। তারপর আবার চুপচাপ। মালেক জানতেই পারে না কখন স্বামী তার বিশ্রাম করে, কখন তার কাজের বিরতি। তার নিজের ঘরে স্বামী গান গায় আর মালেক ঘুমে অচেতন—আবার সকালে যখন সে জাগে তখন তার স্বামী গান গাইতে আর পায়চারী করছে। মালেকের মনে হয়, এ যেন কোন সেনাধ্যক্ষের আদেশসূচক পদশব্দ শ্রুণে। শ্রুণে তার মাথায়

নূতন চিন্তা, নূতন যুক্তি, তাই স্বরের প্রাচুর্য্য তার বাড়ত। মালেক
অর্কনিমীলিত নেত্রে স্বামীর পানে তাকায়। এ এক নূতন মানুষ—
একান্ত অপরিচিত রূপ তার।

অবশেষে কাজ শেষ হলে পীয়ার একজন ভদ্রলোকের কাছে সব
পাঠিয়ে দিল। তারপর তার অস্থিরতা আরও বাড়ল। এক সপ্তাহ ধরে
সে অপেক্ষা করে বসে রইল উত্তরের প্রতীক্ষায়। মাঝে মাঝে সে বিজুকে
নিয়ে বেরিয়ে যায়—ফিরে আসে স্বেদসিক্ত তনুতে। অস্থিরমনা মানুষ
যখন ঘোড়ায় চড়ে যায়, তখন কদমে কদমে না ছুটলে তার শাস্তি হয় না।
দিন কেটে যায়। পীয়ারের আহ্বারে রুচি নেই, চোখে ঘুম আসে না।
অবশেষে একদিন সে ছুটল নাসাঁরাতে—“বিছানা পত্র বাক্স—মালেক—
কোম্পানীর ডিরেক্টরদের মিটিং-এ যেতে হবে। একুণি রওনা হওয়া
দরকার—তাড়াতাড়ি গুছিয়ে দাও--”তারপর নিমেষের মধ্যে সে ছুটে
গল শহরের দিকে।

এখন মালেকের পালা পড়ল অস্থির মনে দিন যাপন করার। স্বামী
তার এ কাজ পায় কি না পায়—এতে তার কিছু এসে যায় না, কিন্তু
স্বামীর ভাগ্যে পরাজয়—এ অসম্ভব। তাই অস্থিরতায় তার দিন কাটে।

দু’দিন পরে একখানা টেলিগ্রাম এল—“আমারই জয় প্রিয়তমে।”
মালেক সেই টেলিগ্রাম হাতে করে ঘরময় নাচতে লাগল।

তারপর দিন পীয়ার ফিরে এল—তারপর পায়চারী করতে করতে
বললে—“আচ্ছা মালেক, তোমার বাবার এ বিষয়ে কি মত হতে পারে?”

—“বাবা? তিনি কি বললেন?”

—“আমি তাঁকে ছ’লাখ ক্রাউনের জামীন থাকতে বলব।”—

—“বাবাকে এর মধ্যে জড়াবে নাকি?” মালেক বিস্ফারিত চোখে

—“তিনি যদি ভাল না মনে করেন, আমি তাঁকে ছেড়ে দেব। কিন্তু তাঁকে জানাতেই হবে। আচ্ছা, আসি এখন।” পীয়ার ছুটল শহরে।

লোরেঞ্জ এ ইউথোর প্রকাণ্ড বাড়ীর ভিতরে এবেশ করতে হলে প্রথমেই লোহা-তামার বাসনাদির দোকান পড়ে—তারপর তাঁর নিজের অফিস। পীয়ারের হাতে পোর্টফলিও—সে কড়া নাড়তে লাগল। ইউথো সেই সবে গ্যাস জ্বালিয়ে তাঁর রোলটপ ডেস্কের ওপর বসেছেন—এমন সময় পীয়ার ঘরে ঢুকল। লোকটির ধূসর দাড়ি, তার মুখে বানারের আগুনের ছায়া পড়েছে।

—“তুমি? ও বস, শুনলাম তুমি ক্রিষ্টিয়ানিতে গিয়েছিলে? সেখানে কিসের দরকার?”

ভারা মুখোমুখী বসল—পীয়ার সমস্ত ব্যাপার ধীর অথচ দৃঢ়ভাবে বলে গেল।

—“আচ্ছা কাজটার দাম কত হবে?”—ইউথো পীয়ারের দিকে মুক ফেরাল—উজ্জল আলোকে ভরে গেল তার মুখ।

—“তু’কোটি চা’র লক্ষ ক্রাউন”—

বৃদ্ধ লোকটি তার বলিষ্ঠ হাত দিয়ে ডেস্কটা ধরে সোজা হয়ে দাঁড়ালেন—পীয়ারের দিকে এক দৃষ্টিতে চেয়ে বৃদ্ধ হাঁপাতে লাগলেন। এই বিরাট সংখ্যার তাঁর মাথা ঘুলিয়ে যাচ্ছিল। এর পাশে তাঁর নিজের ব্যবসা অতি তুচ্ছ মনে হল। তাঁর সমস্ত মর্যাদা, তাঁর আসন—তাঁর সমস্ত কল্প প্রণালী এর কাছে ধূলীবৎ মনে হয়। তাঁর নিজের গচ্ছিত টাকা এর কাছে অতি ক্ষুদ্র!

—“আঃ আমি কথাটা ঠিক—তুমি কি বলছ—তু’কোটি?”

—“হ্যাঁ, আমার মনে হয় এ আপনার কাছে তুচ্ছ বোধ হচ্ছে। কিন্তু আমি নিজের হাতে পঞ্চাশ মিলিয়ন ফ্র্যাঙ্কের কাজ করেছি।”

—“কত বললে ? কত কোটি ?”—বৃদ্ধ সমস্ত ঘরময় ঘুরে ঘুরে বেড়াতে লাগলেন । তারপর নিজের চুল দৃঢ়মুষ্টিতে ধরে তিনি ভাবতে লাগলেন, এ লোকটার মস্তিস্কের স্থিরতার বিষয় ।

সঙ্গে সঙ্গে তাঁর মনে হল এত সহজে ধৈর্য্য হারান উচিত নয়—তিনি নিজেকে সামলাতে চেষ্টা করলেন ।

—“এর থেকে কত লাভ তুমি পাবে, আশা কর -- ?”

—“দু’লক্ষ টাকা নিশ্চয়”—

—“ও” । এতবড় লাভজনক ব্যবসা নিয়ে তিনি নিজে কখনও কারবার করেন নি । আজ তাঁর নিজের ক্ষুদ্রত্ব তাঁর কাছে ধরা পড়ল ।

—“কিসে তোমার মনে হল যে—এতে তোমার লাভ হবে ?”

—“আমি কষে দেখেছি ।”

—“কিন্তু ভুল ত হতে পারে । ধর তোমার অঙ্কে ভুল রয়ে গেছে”

—আবার তিনি উৎসুক নয়নে পীয়ারের দিকে তাকালেন ।

--“সাধারণত অঙ্ক আমার ভুল হয় না ।”—পীয়ার উত্তর দিল ।

তারপর পীয়ার যখন জামিন হওয়ার কথাটা পাড়লে, তিনি আবার অস্থির হয়ে উঠলেন । হঠাৎ খেমে পেছনে তাকিয়ে তিনি বললেন—“কি জামিন ? লক্ষ টাকার জামিন তুমি আমায় হতে বলছ ?”

—“না—কোম্পানী চার লক্ষ টাকার জামিন খুঁজছে ।”

খানিকক্ষণ চুপচাপ—তারপর বৃদ্ধ বললেন—“তাই বল । কিন্তু আমি—আমার তত ক্ষমতা নেই—”

—“আমি নিজে তিন লক্ষ টাকার ভার নিচ্ছি আর তাছাড়া বাড়ীটা—কারখানা—সে সব ত আছেই—আপনি কি এক লাখের জামিন হবেন ?”

ইতিমধ্যে বৃদ্ধ ঘরের এক প্রান্তে চলে গেছেন—সেখান থেকে জবাব দিলেন—“তাও আমার পক্ষে অসম্ভব ।”

—“বেশ! আপনার যদি ইচ্ছে না হয়—আমাকে অন্য ব্যবস্থা করতে হবে। আমার যে দুই বন্ধু এখানে এসেছিল তারা”—পীয়ার দাঁড়িয়ে কাগজপত্র গুটাতে লাগল।

—“না না—এ তাড়াতাড়ির কাজ নয়। তুমি যে ঘোড়ায় জিন দিয়ে এসেছ দেখছি। আমাকে একটু ভাববার সময় দিতে হবে। ভাল, আর কাগজপত্রগুলো আমার একটু দেখা দরকার”—

অশান্তি ও অনিদ্রার বৃদ্ধির রাত কাটল। মাথার মধ্যে এক দুর্ভর ভার। নিজেকে তাঁর শক্তিহীন মনে হয়—তাঁর জামাই নিশ্চয়ই গুণী লোক—কোন সন্দেহ তাতে নেই। কিন্তু এক লাখ টাকা, কোনও ব্যবসা নয়—কিষ্কা জমি জায়গা নয়—একটা সেতু তৈরীতে দেওয়া—এ এক নূতন অভিজ্ঞতা। এ এক রহস্যময় বস্তু—বাইরের পৃথিবীর সঙ্গে অথবা ভবিষ্যতের সঙ্গে এর যেন যোগ আছে। এত সাহস তাঁর আছে? না—একাজ সে করবে না—সে করতে পারে না। কিন্তু বড় লোভ হয়। সে ত চিরকালই বনগাঁয়ে শেয়াল রাজা হয়ে কাটিয়েছে। একবার পরীক্ষা করতে দৌষ কি? এ করা তার কি উচিত? এর মানে সমস্ত ভবিষ্যৎ নিয়ে ছিনিমিনি খেলা—তাঁর মর্যাদা, তাঁর নাম—নেহাৎ একটা কাজের ওপর সমস্ত নির্ভর করা—তার কোন জ্ঞান এতে নেই। এ একটা মস্ত আন্দাজ। এ ত জুয়া। সে স্পষ্ট বলে দেবে—‘না হবে না’। তবে কি শেয়াল রাজা থাকাই তাঁর ভবিষ্যৎ? না—সে বলবে, ‘হাঁ তাই দেব’। সেই ভাল—আঃ ভগবান...তিনি দৃঢ়বদ্ধ মুষ্টিতে দাঁড়িয়ে রইলেন। সমস্ত দেহ স্বেদসিক্ত, মনে ঘূর্ণি হাওয়ার কলরোল। এ একটা মস্ত জুয়া!—কিন্তু লোভনীয়। ভগবানের কাছে সে কি প্রার্থনা করবে? সে প্রার্থনার কি মূল্য—ভগবানের ওপর তাঁর কোন আস্থাই ত নাই।

পরের দিন সকালেই ফোনে শব্দরবাড়ীতে নিমন্ত্রণ হল তাদের।

কিন্তু খাবার টেবিলে—কথাটা তুলতে আর কেউ পারছে না। একই চিন্তা তাদের মাথায়, কিন্তু প্রকাশ করতে সকলেরই কেমন একপ্রকার ভারুতা আসছে মনে মনে। বৃদ্ধের মুখে রাত্রি জাগরণের ক্লান্তির ছায়া—আর মালের মা তাঁর চশমার মধ্য দিয়ে এক এক করে তাদের নিরীক্ষণ করতে লাগলেন। পীয়ার ধীরভাবে বসে আছে, মুখে তার অফোটা হাসি।

শেষে যখন মদ এল মালের মা গ্লাস নিয়ে জামাতার দিকে চাইলেন—“সুখী হও বৎস। আমরা তোমার পথের বৃদ্ধক হব না। তুমি যখন বুঝছ যে...তোমার কাজ ভালভাবে উদ্ধার হোক পীয়ার।” মালের তার মা বাবার দিকে চাইলে—এতক্ষণ সে উৎকর্ষিত ব্যথাতুর চিন্তে বসে ছিল, এবার তার চোখ বাষ্পকুল হয়ে উঠল।

—“ধন্যবাদ”—পীয়ার তার শ্বশুর শাশুড়ীর স্বাস্থ্য পান করলে। সমস্ত ব্যবস্থাই করা ছিল। এই দুই বৃদ্ধ নরনারীর মধ্যে বহু আলোচনা হয়েছে। ব্যবস্থা সমস্তই হল, কিন্তু এই চারটি প্রাণী নীরবে অনুভব করতে লাগল—তাদের পায়ের তলায় মাটিতে কাঁপন ধরেছে। তাদের ভবিষ্যৎ—তাদের ভাগ্য সমস্তই এই পাশার চালের ওপর নির্ভর করছে।

তার দু'দিন পরে, শান্ত সূর্য্যকরোজ্জ্বল এক প্রভাতে পীয়ার শহরে গেল।—সেখানে মালের মাকে জানালার দেখে তাঁর কাছে গেল—হাতে সঞ্জক্রীত ফুল!

তিনি বসেছিলেন পশ্চিমের ঐ হলদে আকাশের দিকে চেয়ে—যখন হাতে করে ফুল নিলেন দৃষ্টি তাঁর এতটুকু সরেনি। “ধন্যবাদ পীয়ার”—চোখ না সরিয়ে তিনি বললেন।

—“আপনি কি ভাবছেন মা”?

—“জান, সব সময় মনের কথা বলা উচিত নয়”—তারপর তিনি সামনের ঐ দীঘির কালো জলের দিকে তাকালেন।

—“নিশ্চয়ই কোন সুখের চিন্তা করছিলেন—না মা?”

—“আমি তোমাদের কথাই ভাবছি পীয়ার। তোমার ও মালের”—

“আমাদের সৌভাগ্য যে আপনি আমাদের কথা ভাবেন”—

“দেখ পীয়ার, তোমাদের দুঃখের দিন আসছে—দারুণ দুঃখ।”
চিন্তাগ্রস্ত মনে তিনি মাথা নাড়লেন যেন কারও পানে চেয়ে।

—“দুঃখ? কেন? দুঃখ কেন আসবে মা?”

—“তোমরা বড় সুখী, তাই”—

—“কি বললেন? আমরা—?”

—“হ্যাঁ—তোমাদের জীবনে শুধু আনন্দ আর হাসি। কিন্তু জান ত অলক্ষ্যে যে সমস্ত শক্তি কাজ করে, তারা সুখী সংসার সহ করতে পারে না—তাই তারা তোমাদের সুখে বিষ দৃষ্টি দেয়।”

পীয়ার হাসলে—“আপনার কি তাই মনে হয় মা?”

—“না আমি জানি”—দূর আকাশের দিকে চেয়ে তিনি দীর্ঘশ্বাস ফেললেন—“এই সমস্ত অদৃশ্য ছায়া—যারা তোমাদের হিংসে করে তারা তোমার চারিপাশেই ঘুরছে অদৃশ্যভাবে। তাদের আমি দেখতে পাই, কত বৎসর ধরে তাদের পরিচয় আমি পাচ্ছি। তাদের সঙ্গে আমার শক্রতা। আর মালের—সে ভালই করেছে গান শিখে, কারণ শুধু সঙ্গীত ও কলহাশ্রু এদের দূর করতে পারে—আর কেউ না। ভগবান করুন—হাসির রোলে তারা তোমাদের সঙ্গ ত্যাগ করুক।”

যখন পীয়ার সেখান থেকে বাড়ী ফিরল—সমস্ত দেহ তার শিথিল হয়ে গেছে। ভয়ে যেন গলা শুকিয়ে যাচ্ছে। পথে নেমে তবু সে

আপন মনে বললে—“বাজে, ওঁর মাথাটা খারাপ হয়েছে দেখছি”—
তারপর গাড়ীতে করে ছুটল বাড়ীর দিকে।

—“যাই হোক বুড়ো রোড় এইবার খুশী হবে। জীবনের স্বপ্ন তার
কারখানার সর্বময় কর্তা হওয়া—এখন সে-ই হবে। যে যার তালে
ঘুরছে। আর বছর দুই—লোরেঞ্জো বেলিফ শুধু রাজত্ব করবে। আচ্ছা,
আচ্ছা—দেখা যাবে— এখন ছুটে চল ব্রাউনি।”

(১০)

“পীয়ার—তুমি নিশ্চয়ই এক্ষুণি চলে যাবে না? না, না, পীয়ার যেও
না! আমার একলা ফেলে রেখে তোমায় যেতে দেব না!—”

“মাল্‌, কথা শোন, অত অধীর হয়ো না—না—না—আমাকে যেতে
দাও”—পীয়ার বন্ধনমুক্ত হ’তে চেষ্টা করতে লাগল, কিন্তু মাল্‌ তার
স্বামীর কণ্ঠ আরও জোরে জড়িয়ে ধরে রইল।

—“পীয়ার কখনও ত’ তুমি এমন ছিলে না। আমার জন্ম আর কি
তোমার কোন দরদ নেই?—আর ছেলেমেয়ে—তাদের জন্মে”—

—“মাল্‌—আমি কি চলে যেতে চাই—কিন্তু তুমিই বল, এবছরও
কি একটা মস্ত লোকসান খাব। আমি তোমায় বলছি—তাতে
একেবারে আমরা ভিখারী হয়ে যাব। হ্যাঁ—ছাড়, আমাকে যেতে
দাও”—

কিন্তু মাল্‌ তার বন্ধন শিথিল করলে না—“আচ্ছা—ওই যে ওখানে
কি সব কাজ হচ্ছে—সে সব কি তোমার কাছে আমার চেয়েও প্রিয় ঃর
হয়ে উঠেছে?”

—“তোমার কোন ভাবনা নেই মাল্‌স্‌, দরকার হলেই নাম্‌ আর ডাক্তার এসে পড়বে। আর গতবারে তুমি ত’ বেশী কষ্ট পাও নি। আমার পক্ষে এখন থাকা অসম্ভব। অনেক কিছু আমার ওপর নির্ভর করছে—তবে এখন আসি। আর যা খবর হয়, টেলিগ্রাফে—” স্ত্রীর অঁখি পাতার ওপর স্বামী চুপন করলে—তারপর তাকে একটা চেয়ারে ধীরে ধীরে বসিয়ে দিয়ে ছুটে বেরিয়ে গেল—তার মনে হতে লাগল মাল্‌স্‌র সেই ভয়াতুর ব্যাকুল দৃষ্টি তাকে যেন অনুসরণ করছে।

এপ্রিল মাসের স্বর্ষ্য—নিম্নভূমির সমস্ত বরফ গলিয়ে দিয়েছে, কিন্তু পীয়ার যখন এম্পাডেলে ট্রেন থেকে নামল তখন সে যেন আবার বরফের দেশে ফিরে গেছে—মাঠ কুটীর সাঁকো সব শুভ্র তুষারাচ্ছন্ন। তার একটু পরেই সমস্ত শরীর আবৃত করে সে একখানা ভাঙ্গা একঘোড়ার গাড়ী চালাচ্ছে—পার্বত্য পথ ধরে, উচ্চ মালভূমির দিকে লক্ষ্য রেখে।

এ সঙ্কীর্ণ পথও তুষারাবৃত। মাঝে মাঝে ঘোড়ার নাদ পড়ে হুলদে হয়ে গেছে আর তারই কাজের জন্তু যে সমস্ত ভারী সিমেন্টের গাড়ী এই পথ বেয়ে গেছে—তারা বরফে বড় বড় গর্ত করে গেছে। এই পথ চলে গিয়েছে বহুদূরে—‘বেসনা’তে হিমশীতল জলের হ্রদের পাশ দিয়ে।

যন্ত্র-সভ্যতা এগিয়ে চলেছে। মানুষের মন নিয়ে তার কোন প্রয়োজন নেই। মাল্‌স্‌কে এই পথ ধরে ছুটে আসতে হবে একা—নিঃসঙ্গল।

যদি একজন সুস্থ সুখী মানুষ একটা বিরাট কাজ হাতে নিয়ে বরাবর ধ্বংস ও বিপদ ঘটতে দেখে, তখন তার ব্যবহারটা অনেকটা অশ্বের মত হয়ে ওঠে। প্রথমে সে পাহাড়ময় চঞ্চল চরণে বেড়ায়, তারপর যত তার দম ও শক্তি ফুরিয়ে আসে ততই তার দ্রুততা বাড়ে—অবশেষে যখন তার শক্তি নিঃশেষ হয়ে যায় তখনই তার চলার গতিতে আসে স্থৈর্য্য—শ্রান্ত অবসাদ।

এই ধরণের কাজ সে সপ্নেও ভাবতে পারত না। কর্তব্যের মুখে দাড়িয়ে আজও তার অনন্ত জিগীষা প্রশ্ন করছে চিরন্তন রীতিতে—
“কোথায়? কেন? তারপর?”

ধীরে ধীরে অসুবিধা যখন বাড়ছে, তার সমস্ত মন জুড়ে কেবল এক চিন্তা—কর্তব্য সমাপনের। যেমন করে হোক—সাকল্য তার পাওরা চাই-ই। যখন সে হাতে তুঙ্গে নিয়েছে কাজ—শেষ তাকে করতেই হবে—জীবন সংগ্রামে পরাজয়ের গ্লানি অসম্ভব।

এমনি করেই সে লড়াই করেছে। এ যেন শক্তির পরীক্ষা—এ সংগ্রাম বাস্তবতার বিরুদ্ধে। কিন্তু তাই কি সব? তার কি মাঝে মাঝে মনে হচ্ছে না, কোন বিরাট শক্তির বিপক্ষে সে লড়াই—এ শক্তির উদ্দেশ্য কি অশুভ তা সে জানে না। এ এক নূতন অভিজ্ঞতা—জীবনে তার ব্যর্থতার নিষ্ঠুর অটুহাস। তার নিজের শক্তির বিরুদ্ধে কে যেন তার সংগ্রাম খেলা শুরু করেছে।

তোমার অঙ্ক ঠিক হোক না, তোমার প্রত্যেক কাজ নিখুঁত হোক না—কিন্তু ঘটনা ঘুরে যেতে কতক্ষণ?

তোমার হিসাবের মধ্যে কি ধরা ছিল যে, একজন অভিজ্ঞ ইঞ্জিনিয়ার একদিন মাতাল হয়ে এমন সব আদেশ দেবে—যার জগ্নে দেশ নষ্ট হবে। কে জানত বল—যে, সমস্ত সতর্কতা সত্ত্বেও একটা জলের মণ্ড ট্যাঙ্ক হঠাৎ কেটে গিয়ে—শ্রমিকদের ভাসিয়ে নিয়ে যাবে—আর পরদিন তাদের অদ্ভুত মৃতদেহ ভেসে বেড়াবে শীতল জলের ওপর নানা ভাবে?

কতবার পত্রিকায় পত্রিকায় প্রকাশ হয়েছে—“বেসন। জলপ্রপাতে আবার নূতন ছর্ঘটনা। দোষী কে! এর কারণ এই যে, সে নিজে কার্যাস্তরে দূরে গিয়েছিল আর মজুরেরা ছোটখাট সতর্কতা না নেওয়াতে মস্ত একটা পাথর ধসে চারজন লোক মারা গেল আর নূতন বেলার্ডিয়ান

রক্‌ড্রিলার চুরমার হয়ে গেল ; এত হিসেবের ভুল নয়—এ ঈর্ষ্যান্বিত ভাগ্যের চক্রান্ত ছাড়া আর কিছুই নয় ।

“ছুটে চল । আজ রাত্রে মধ্যই সেখানে পৌঁছাতে হবে । এ বছরের তুষার-বন্যা যেন আমার অনুপস্থিতির অভিযোগ না করতে পারে ।”

হুর্ভাগ্যের চরম হল যখন তার কাঁচা-মালের কনট্রাক্টর দেউলিয়া হয়ে গেল । আর ঠিক-করা দামের চেয়েও এখন দাম বেড়ে গেছে, সুতরাং খরচের অঙ্কও বেড়ে যায় ।

কিন্তু টাকার পরিবর্তেও কাজ সে শেষ করবেই । তার সমস্ত প্রতিবন্ধীরা পত্রিকায় তার প্ল্যান প্রকাশ করেছে—তাদের সে বোকা বানিয়ে দেবেই ।

কিন্তু তারপর ! হয়ত ঐ অসীম শূন্যের কোথাও প্রোমেথিয়াসের সত্তা মানুষের শেষ বিচারের অপেক্ষা করছে । কিন্তু তাতে আমার কি যায় আসে । আমার ক্ষুধিত অমর যাতনার এই কি সমাপ্তি ?

‘চুপ—কাজ কর—ছুটে চল । যে কোন মুহূর্তে শিলাঘটি হতে পারে । ছুটে চল—পাজী জানোয়ার ।’

নিদারুণ কষ্টের মধ্য দিয়ে টানাগাড়ী একটানা বার মাইল ছুটে যায়—তারপর উপত্যকা শেষ হয় এবং উন্মুক্ত মালভূমির ঝড়ের ঝাপটা এসে তাদের অভ্যর্থনা করে । এইখানেই উপত্যকা শেষের শেষে ফার্ম । পীয়ারের গাড়ী ঝাঁপিয়ে পড়ে প্রাঙ্গণে—তার কিছু পরেই দেখা যায় গনগনে আগুনের পাশে বসে কফি পান করছে সে ।

মাল্‌—তার কি হচ্ছে কে জানে !

আঃ তার নিজের ঘোড়ায়—গুডব্রাউণ্ডসেল থেকে আনা সেই কালো ঘোড়াটা । এর চলার সঙ্গে টানা গাড়ীর বেগের কত প্রভেদ । তার একটু পরেই আবার পীয়ার সারা অঙ্গে ফার জড়িয়ে শোজে বসে ছুটছে ।

নূতন একটা ঘোড়া ছুটে চলেছে বজুর পথ ধরে—জীবনের বোঝা কত যেন হালকা বোধ হয়। চঞ্চল পায়ে সে চলেছে—গলার ঘণ্টা বাজছে। মাঝে মাঝে পাহাড়ের ঢালুর ওপর ড' একটা কুড়ে অথবা Saeter হ্রত ড'হাজার বর্ষ ধরে নির্বিকারভাবে দাঁড়িয়ে আছে। অনাগত-কালে নব্বনের জয়ভেরী—Saeter হ্রনের শব্দ শোনা যায় না আজ, তার পরিবর্তে—কলের বিকট শব্দ আকাশ-বাতাসকে কাঁপিয়ে তুলছে।

তুহিন শীতল বাতাস বইছে। ঘোড়াটা মাঝে মাঝে মাথা নাড়ে আর হ্রেষা রব করে। বড় বড় বরফের রাত হাওয়ার সঙ্গে ছুটে আসছে—তার অল্প পরেই রীতিমত শিলাবৃষ্টি আরম্ভ হ'ল। পথিকের মুখে যেন চাবুক পড়ছে। প্রথমে ঘোড়ার জিনু- তারপর লেজ, অবশেষে তার সমস্ত দেহ বরফে ঢাকা পড়ে যায়—শিলাগুলো ক্রমশঃ বড় হচ্ছে। সামনের ছেলেটা বহুকষ্টে সেগুলো পরিষ্কার করেছে। সাবাস! সন্ধ্যার আগেই আমাদের পৌঁছতে হবে। পথে পড়ে থাকা ব্রাসউড আমাদের পথ দেখাবে—কিন্তু এই তুষারপাতে তাদের অস্তিত্ব ক্ষণে ক্ষণে মুছে যাচ্ছে। পীয়ারের মুখে কে যেন শাদা আন্তরণ পরিষ্কার দিয়েছে—চোখের পাতায় বরফ জমে দৃষ্টি তার অন্ধ হয়ে গেছে।

ইঞ্জিনের প্রচণ্ড রোদ্রে সে কাজ করেছে—কিন্তু এগুন! ইম্পাতের বাসনার শেষ নেই। সমুদ্রের বিপুল তরঙ্গ—পৃথিবীকে ভাসিয়ে নিয়ে যেতে চায়।

এই তুষারপাত যদি বৃষ্টিতে পরিণত হয়! তার সমস্ত লোককে আবার ছুটতে হবে বাঁধ বাঁচাতে।

আর একটা বিপদপাতে তার সমস্ত নষ্ট হয়ে যাবে। নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে কাজ তার কিছুতেই শেষ হবে না। প্রতিটি অতিরিক্ত দিনের জন্যে তাকে দিতে হবে এক হাজার ক্রাউন।

অন্ধকার বনিয়ে আসছে।

একটু পরে—চারিদিকে আর কিছুই দেখা যায় না—কেবল প্রবল তুষারপাত ও ঝড়ের মধ্য দিয়ে বরফের চাপ ছুটছে—মাঝে মাঝে তার মাথা নড়ছে, তার পথ এলোমেলো। তার পেছনে একটি ছেলে ছুটছে—সামনে তার একটা তুষারাবৃত বস্তু—অত্যন্ত সন্তর্পণে সে এগিয়ে যাচ্ছে। শেষ-বিলিতে বেরিয়েছে পিয়নের ছেলে।

অবশেষে অন্ধকারের মধ্য দিয়ে ছুটতে ছুটতে দেখতে পেলো—অদূরে তীরের বৈদ্যুতিক আলো। পীয়ার গাড়ী থেকে নামবার সঙ্গে সঙ্গে হঠাৎ ঝড় বর্ষণ সব বন্ধ হয়ে গেল—আর সেই উজ্জ্বল আলোকে পীয়ারের চোখের সামনে দৃশ্যমান হয়ে উঠল—তার কারখানা, শ্রমিকের ঘর, সহকারীদের থাকবার জায়গা, অফিস তার নিজের বাস করবার কাঠের বাড়ী। দু'জন ইঞ্জিনিয়ার এসে তাকে অভিবাদন করল।

—“সব কেমন চলছে—ভাল ত?”—

ধূসর শ্মশ্রুবিশিষ্ট লোকটি উত্তর দিলে—“কুলিরা সব ধর্মঘট করেছে।”

—“ধর্মঘট! কেন?”—

—“কালকে যে লোকটাকে মাতলামীর জন্য তাড়ান হয়েছিল—তাকে আবার কাজে বহাল করতে বলছে ওরা”—

পীয়ার তার কোট থেকে বরফ ঝেড়ে ফেলে দিল—নিজের ব্যাগ নিয়ে সে বাসার দিকে এগিয়ে চলল—অন্য দু'জনে তাকে অনুসরণ করতে লাগল। “তাকে আবার ফিরিয়ে নিতে হবে। ধর্মঘট করলে ত চলবে না”—

তার দু'দিন পরে পীয়ার তার বিছানায় গুয়ে—বেয়ারা তাকে

সব আসা চিঠিগুলো দিয়ে গেল। তার মধ্যে ক্লস ব্রকের চিঠিটা প্রথম তার দৃষ্টি আকর্ষণ করলে। কিন্তু একি? হাত তার কাঁপছে কেন? অতি পরিচিত সঙ্গদয় বন্ধুর কাছ থেকে আসা পত্র!

“প্রিয় বন্ধু,

বড় কঠিন কথা তোমায় লিখছি। আশা করি তুমি আমার কথামত কিছু টাকা দেশে নিয়ে গেছ। অল্প কথায় তোমায় জানাচ্ছি—ফার্ডিন্যান্ড হলম নিরুদ্দেশ—হয়ত জেলে, হয়ত আরও ভীষণ শাস্তি সে পেয়েছে। এরকম দেশে কোন বড়লোক হঠাৎ অদৃশ্য হলে তার সম্মান করা পাগলামি ছাড়া আর কিছুই নয়। সারা দেশ জুড়ে তার বহু শত্রু হয়েছিল—বিশেষত ভীষণ কাজে সে হাত দিয়েছিল—তার পরিণাম হল এই।

তুমি ত জান, হঠাৎ একটা ব্যবসা এমন এক জায়গায় যদি দেউলিয়া হয়ে যায়—তবে অবস্থা কি রকম দাঁড়ায়—এমন কোন ধনীলোক নেই যে তাকে সাহায্য করবে! আমরা ইউরোপীয়ানরা অবশ্য দমে যাবার পাত্র নই।

তুমি হয়ত এর গুরুত্ব বোঝবার চেষ্টাই করবে না। আমি এখন পথের ভিখারী, কিন্তু তোমার দেশে বাড়ী-ঘর আছে—কারখানা আছে তোমার যা আছে তার দু'চার গুণ করা তোমার পক্ষে খুবই সহজ। অথবা তোমায় আমি হয়ত চিন্তেই পারিনি। আশা করি তোমার বেসনা প্রপাতের কাজ ভালই চলেছে। ধন্যবাদ।

পুনশ্চ। অবশ্য ফার্ডিন্যান্ডের সত্যই যদি পতন হয়ে থাকে—তবে আমারও দিন ঘনিয়ে এসেছে। কিন্তু আমি এখন যেতে পারব না—কারণ সে চেষ্টা করলেই ওদের তাতে সন্দেহ হবে। বিদেশী আমরা—আমাদের সব কাজে সমতা রেখে চলা বড়ই দুষ্কর। আর একটা শেষ-

কথা—যদি আর কোনও পত্র আমার কাছ থেকে না পাও, তবে বুঝবে তোমার বন্ধুর ভাগ্যেও নিদারুণ কিছু ঘটেছে।”

বাইরে প্রপাত থেকে জন পড়ছে খালের মধ্যে। পীয়ার গুয়ে আছে নিখর মূর্তির মত—মাঝে মাঝে তার পা অজ্ঞাতসারেই নড়ছে। তার দুই প্রিয়তম বন্ধু—তাদের কথাই আজ বেশী করে মনে পড়ে। আজ তার মনে হচ্ছে যে বন্ধুদের মত সেও অসহায়—কিন্তু দুঃখের ভার সবচেয়ে দুর্ভর হয়ে উঠবে তার শ্বশুরের—লোরেঞ্জের।

বস্তুত পীয়ারের পথ নিকটক করা ছাড়া ভাগ্যদেবতার হাতে আরও অণুকাঙ্ক্ষ আছে। তোমার নিজের পথ নিজের হাতেই রচনা করতে হবে—পীয়ার, সেই তোমার অদৃষ্ট :

(১১)

শরত শেষের এক সন্ধ্যায় মাল্‌নে তার স্বামীর প্রতীক্ষা করছিল। কয়েক সপ্তাহ পরে স্বামী তার ফিরে আসছে, তাই সে একটু আলো, উৎসবের আয়োজন করেছে। প্রত্যেক কক্ষে আলো, আগুন গন গন করে জ্বলছে, রান্নাঘরে সুখাদ্য সমস্ত তৈরী হচ্ছে আর ছোট লুইস রু ফ্রক পরে তার মার সঙ্গে ঘুরে বেড়াচ্ছে। হঠাৎ তার মেয়ে ছাটকে দেখে লুইস সোফার ওপর বসে পড়ল, তারপর শাসনের সুরে বললে—“তোমার খুব ভাল মেয়ে হয়ে থাকা দরকার, জসেফিন—তোমাদের ঠাকুর্দা এখনই আসবে।” মাল্‌নে রান্না ঘরে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলে, “ক্যারোট এনেছ বার্থা? বেশ করেছ—ওটা বরং আগুনের কাছে রেখে দাও গরম থাকবে।”

তারপর মার্লে' সব ঘর ঘুরে দেখল, ছোট ছেলেমেয়ে দুটি গুমুচ্ছে - কাজও
আব কিছু বাকী নেই।

স্বামীর কিরতে এখনও একঘণ্টা দেবী আছে। তবু সে উৎকর্ষ
হয়ে বসে রইল গাড়ীর শব্দ শোনবার জন্য। কিন্তু এখনও তার সাজ
কিছু হয়নি। তাড়াতাড়ি বাথরুমে গিয়ে সে সমস্ত শরীর পরিষ্কার
করতে লাগল কিন্তু সাবধানে—চুল যাতে না ভিজে যায়। সে ত জানে
দুঃখের ছায়া ঘনিয়ে আসছে, কিন্তু স্বামীর কাছে স্তম্ভিত হয়ে যেতে
কী?

মাথার মধ্যে তার কথার ঝড় বয়ে যাচ্ছে। একজনের দেহ আর
একজনের কাছে এত লোভনীয়, আশ্চর্য্য! তিনি তোমাকে আদর
করেছেন, অধর স্পর্শ করেছেন, আর নিজেই উত্তেজনার কেঁপেছেন!
মনে আছে তোমার সেইদিন। তুমি তাকে ঠেলে দিয়েছিলে উদাসীন
ভাবে—একবার নয়, অনেকবার। প্রায়শ্চিত্তের দিন কি ফুরিয়ে গেছে!
এখন তাঁর মাথায় অন্য চিন্তা। বিপদের দিনে তুমি তাঁকে সাহায্য
দিতে পারতে; কিন্তু চরম দিন কি আমাদের ঘনিয়ে এসেছে? নিশ্চয়ই।
দেখছ না গতবার যখন তিনি বাড়ী এলেন, তখন সদ্যপ্রসূত মেয়েটির
কোন প্রশ্নই তিনি করলেন না, ঝড় আসলু। তাই তাঁর মন অভিযোগ
করতে ভুলে গেছে। ধীর শান্তভাবে শত চিন্তার বোঝা তিনি তুলে
নিয়েছেন, তাঁর এই নবতম জগতে স্ত্রীপুত্রের কোন দাবীই নেই। আজ
রাত্রেও কি তাঁর তেমনি উদাস দৃষ্টি থাকবে। আজকার এই প্রশোধন
কি তিনি চেয়েও দেখবেন না? তাকে আলিঙ্গন করে চঞ্চল আনন্দের
শিহরণে আর কি তার বুক ছলিয়ে দেবে না? আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে
মার্লে' একবার নিজেকে পরীক্ষা করতে লাগল। যৌবন তার জীবন
থেকে বিদায় নিয়েছে—গালের রক্তিমাতা সরে গিয়েছে—মুখের ওপর

দু'একটা কুঞ্চন আর ঢেকে রাখা একেবারে অসম্ভব। কিন্তু ক্রর সৌন্দর্য্য আজও তার অক্ষুণ্ণ রয়েছে—আজও অধর স্পর্শে তাতে মত্ততা আসে। নিজের অজ্ঞাতসারেই মালের আয়নার দিকে ঝাঁকে—তার সেই ক্র হৃটির ওপর হাত রাখে—মনে হয় তাদের যেন সে আদর করছে।

মালের নীচে নেমে এল রু গাউনে, কলারে চওড়া কিতে আর জামার হাতে সূচের কাজ করা। অতিরিক্ত সজ্জিত না দেখায় সেজন্য সে পড়েছে লাল ফুলকাটা এ্যাপরন—তাকে ঠিক গৃহকত্রী বলেই মনে হচ্ছে।

সাতটা বেজে গিয়েছে। লুইস তার কাছে ছুটে এল—মালের তাকে কোলে করে জানালার কাছে একটা চেয়ারে অপেক্ষা করতে লাগল।

রাতের অন্ধকারে চাকার আওয়াজ করে আসতে পারে স্বয়ং ভাগ্য-দেবতা। সম্পদের আনন্দ থেকে এক মুহূর্তে দৈন্যের অন্ধকারে হরত হবে পতন—অন্ধ নিয়তির গতি কোন পথ নিলে কে জানে? পীয়ার গেছে ইংলণ্ডে কোম্পানীর সঙ্গে কিছু ব্যবস্থা করতে। গাড়ীর শব্দ না? হ্যাঁ—মালের উঠে পড়ল। দেহলতা তার কাঁপছে—উৎকর্ষ হয়ে সে অপেক্ষা করে! না—বেরিয়ে গেল। আটটা বাজল, লুইসের ঘুমোবার সময়। লুইসের জামা কাপড় খুলে দিলে, তার একটু পরেই লুইস শুভ্রশয্যায় গুয়ে আছে—দু পাশে দুটা পুতুল। ঘুম জড়ান চোখে সে বলল—“বাবাকে আমার তুমু দিও মা, হ্যাঁ আর ত-কালে একবার আভতে বল।”

—“নিশ্চয়, এবার তুমি ঘুমিয়ে পড় লক্ষ্মীমেরে”—

মালের আবার এসে অপেক্ষা করছে—ধীরে ধীরে রাত্রি এগিয়ে আসে। অবশেষে সে একটা জামা চাপিয়ে পথে বেরিয়ে পড়ল।

অক্টোবরের আকাশ—দুখুত্ব এক কুয়াসার আবরণে সমস্ত সহর

সুপ্তিমগ্ন। আর ঐ কৃষ্ণবর্ণ পর্বতশ্রেণীর মাথার ওপরে নীহারপুরী।
হয়ত এতক্ষণে পীয়ার আসছে কোন গ্রাম্যপথ ধরে—রাত্রির অন্ধকার
ভেদ করে—তার ঘোড়া যথেষ্ট বিচরণ করছে, আর সে অবসন্ন দেহে
জিনের ওপর বসে।

- “ওগো, নীল আকাশের দেবতা—সাহায্য কর। স্বামীর জীবন-
পথ সহজ করে দাও ঠাকুর। জীবনের সঙ্কায় এত বড় বিপদে তুমি
তাকে অসহায় হ’তে দিও না, দিও না দেবতা”—

কিন্তু ঐ তারা-ভরা আকাশ চিরদিনের নিরুপেক্ষ—কোটি কোটি
লোকের প্রার্থনা তারা শুনছে, কিন্তু মানুষের জীবন তাদের কাছে
মুনাহীন।

মালেক মাথ’ নত করে আবার বাড়ী ফিরে যায়।

মধ্যরাতে পীয়ার পার্কৃত্য পথ দিয়ে বাড়ীর দিকে আসছিল।—
উজ্জ্বললোকিত গৃহের দৃশ্য তার কাছে নিশ্চয় বোধ হ’তে লাগল—তাই
সে ঘোড়ার পিঠে আরো কঠিন কশাঘাত করে। আস্তাবলের চাকরটার
হাতে চাবুক দিয়ে দ্রুতপদক্ষেপে বাড়ীর দিকে ছুটে চলে। সমস্ত মন
তার সংশয়াকুল—এ বাড়ী অন্য কোন লোকের, তার আর নয়।

বসবার ঘরের দরজা সে খুলে ফেলল—কিন্তু সেখানে কেউ
নেই, শুধু আলো আর বিলাস। তার পাশের ঘরে সে মালেক দেখতে
পেলে একা একটা আরাম কেদারায় শুয়ে আছে। হাত তার ঝুলে
পড়েছে—প্রতীক্ষমানা নারী সুপ্তিরতা।

তারই জন্ম মালেক এতক্ষণ অপেক্ষা করেছিল।

সমস্ত শরীরে তার আনন্দ লীলাচঞ্চল। মুগ্ধ দৃষ্টিতে সে চেয়ে রইল
প্রিয়তমার দিকে। যুগান্ত অবস্থায় মালেক—তাকে একটু আরামে
বসান; তার পাণ্ডুর মুখে ফুট উঠল হাসি। তাকে না জাগিয়ে পীয়ার

গেল মস্তুর পারে নাসারীতে—সেখানে তিনটি ছেলেমেয়ে তাদের রাত্রির সাজে ঘুমিয়ে আছে।

আবার সে ফিরে গেল খাবার ঘরে। ছোট টেবিলে ধবধবে শাদা কাপড় পাতা, দুখানা তোয়ালে, ফুল আর তার তোয়ালেতে একটা সূঁচ তোলা ফুল—বোধ হয় লুইসের করা—ছোট লুইস।

অবশেষে বাহমূলে করস্পর্শ পেয়ে মালের চমকে উঠে।

“তুমি এসেছ এতক্ষণে।” “মালের”—তারা পরস্পরকে জড়িয়ে ধরে, স্বামী স্ত্রীর ললাট চুষন করে। কিন্তু স্ত্রী দেখতে পায় স্বামীর ললাট চিন্তা-কুটিল।

তারা খেতে বসে। স্ত্রী দেখতে পায় স্বামীর মুখে, তার কণ্ঠস্বরে তার শান্তি ভঙ্গিমায় আসন্ন বিপদের সম্ভাবনা।

কিন্তু প্রশ্ন সে করতে পারে না। স্বামীর চোখে সে বড় করে তোলে এই কথা যে, ভালবাসা তাদের অটুট থাকলে তারা দৈন্যকেও মানবে না।

গত দিবসের জন্ম আক্ষেপ করে আর লাভ নেই—তার এক-একটি সোহাগ স্বামীকে পাগল করে তোলে। কিন্তু আজ সে কম্পিত বৃকে বসে থাকে, যদি স্বামী তার এতটুকু আনন্দ পায় তার স্ত্রীর সঙ্গসুখে—আজও সে তরুণী, তমুলতার সৌন্দর্য্য আজও তার চিরবিদায় নেয় নি।

পীয়ার স্ত্রীর দিকে চাইলে, মুখে তার কৃত্রিম হাসি।

“মালের, তোমার বাবার সম্পত্তির কত দাম হবে আন্দাজ?” কথাগুলো যেন মগ্নপ্রায় জাহাজের ক্যাপটেনের আদেশের মত শোনাল।

“পীয়ার, আজ রাতে ওসব চিন্তা কেন? সুস্থ হও।” মালের তার হাতের উপর স্বামীর হাত তুলে নিল। “ধন্যবাদ”—পীয়ার

হাসিমুখে বললে—কিন্তু মন তার অন্য কাজে পড়ে রয়েছে। নিজের অজ্ঞাতসারেই সে আহার করতে লাগল।

—“আর তোমার কী মনে হয়—লুইসের ভায়োলিন শেখার বিষয়।
স এরই মধ্যে বেশ আয়ত্ত করেছে”—

—“বেশ”—

—“আর এষ্টার নূতন একটা দাত হয়েছে—বড় কষ্ট পেয়েছে
তাই নিয়ে”—

—মনে হচ্ছে যেন বিস্মৃতপ্রায় এই সংসারকে সে স্বামীর সামনে
তুলে ধরছে। এক মুহূর্ত্ত তার চোখের দিকে চেয়ে পীয়ার বললে—
“আমাকে বিয়ে করা তোমার উচিত হয় নি। তোমার নিজের ও
তোমার আত্মীয়দের তাতে ভালই হ’ত।”

“কেন বাজে কথা বলছ পীয়ার—তুমি ত জান আবার সব গুছিয়ে
নেবার শক্তি তোমার আছে”—

তারপর শয্যাপার্শ্বে গিয়ে জামাকাপড় খুলতে লাগল।

—“এখনো আমাকে ভাল করে দেখেনি”—মালেক ~~মনে মনে~~ ভাবলে।

একটু হেসে মালেক বললে “তোমার অপেক্ষায় বসে আমি ভাবছিলাম
যে আজই প্রথম আমাদের মিলন হবে। তোমার এসব চিন্তা করবার
সময়ই নেই, না পীয়ার—”

পীয়ার ঘুরে দাঁড়াল—মালেকের সজীব কণ্ঠস্বর দেন, কেন বড় অদ্ভুত
ঠেকল। কই মালেক ত কখনও জিজ্ঞাসা করে
কাটছে অথবা আজকের খবর কি হল। কিন্তু স্মার কে চেয়ে
সে স্পষ্ট দেখতে পোলে উদ্বিগ্ন অন্তর সংশয়-দেলায় ঢলছে।

আর সেই সঙ্গে তার মনে পড়ে কতদিনের পুরান এক গ্রীষ্মের কী
পাহাড় ঘুরে যখন গৈবন কেটে যেত তার তারপর একদিন।

পাশে কফি পান করতে করতে প্রথম মানসী নারী তার পানে চেয়ে
হেসেছিল। আর মনে পড়ে দীঘির ওপর নৌকা ভাসিয়ে তাদের সেই
প্রথম প্রণয়লাপ, আকাশ ও পৃথিবীর মিলনের বাঁশী তার বুকে বেজে
উঠেছিল—নবনব ছন্দে সুরের হিল্লোল তুলে।

তেমনি ভঙ্গিতে আজও মানে' দাঁড়িয়ে আছে। আজও সে তার,
কিন্তু আজ স্ত্রী প্রথম স্বামীর কাছে এসে ভিখারিণীর মত দাঁড়িয়েছে তার
রূপের ডালি নিয়ে।

পীয়ারের সারা বুকে আনন্দ। কিন্তু আজ আর সে ছুটে গিয়ে তাকে
বুকে তুলে নিয়ে সোহাগে আদরে ব্যস্ত করে তুললে না, সে চাঁপা বুকে
দাঁড়িয়ে রইল, দাঁতে দাঁত চেপে প্রতিজ্ঞা করলে মনে মনে—জীবনের
হুঁভর বোঝা সে নামিয়ে ফেলবে—হুঁজনের ভুলবাসার বাঁধন সে কিছুতেই
শিথিল হতে দেবে না।

আলো নিভিয়ে তারা শুয়ে পড়ল পরস্পরের শয্যায়—তাদের নিঃশ্বাসে
অন্ধকার মুখর হয়ে উঠেছে। চোখ বন্ধ করে শুয়ে সে ভাবতে লাগল—
কোনও সাহায্যের কথা—স্ত্রীপুত্রকে বাঁচাবার উপায়। আর মালেক
সমস্ত স্ত্রীকে দিয়ে অপেক্ষা করে রইল স্বামীর একটুখানি সোহাগ, একটু
মুখের কথার আশায়। কিন্তু না, অবশেষে মুখে রুমাল চেপে সে
অবরুদ্ধ কণ্ঠস্বরে দমন করলে স্ত্রীকে।

—আজও . . .

পীয়ারের খণ্ডর লোরেঞ্জ ডি ইউথো কচিং কখনো ব্রুসেথে তার ধনী ভগ্নীর কাছে যেতেন, কিন্তু আজ তিনি দীর্ঘ পথ ক্লান্ত পায়ে অতিক্রম করে সেখানে উপস্থিত হলেন। তারপর এই দুই ভ্রাতাভগ্নী গন্তীর মুখে টেবিলের সামনে বসলেন।

— তার বিরাট বৃষ্টি হুল্লিঙ্গ. স্মার্ট ম্যারিট বললে—“তাই তুমি বৃষ্টি এতদূর কষ্ট করে এসেছ।”

“কেন, হ্যাঁ, আমি ভাবলাম তোমার খোঁজটা একবার নেওয়া উচিত তাই”—তাই একটু সন্তর্পণে কথাটা বলে।

—“তা বেশ ভালই। কিন্তু আমার ত জামাই নেই, তাই দেউলে হবার ভয়ও নেই—

“আমি ত এখনই দেউলে হইনি”—তাই রক্তচক্ষুতে তাঁর বোনের দিকে তাকালে।

“হয়ত না। কিন্তু তোমার জামাই—তার কি?—”

“সে আবার কি? কিছুদিনের মধ্যেই ত সে প্রকাণ্ড বড়লোক হয়ে উঠবে।”

“কি বড়লোক? সে, তোমার জামাই?”—“দেন, কেন

“এক বৎসরের মধ্যে”—তাই ধীরভাবে উত্তর। “খনি তার কিছু সাহায্যের প্রয়োজন। আর তোমাকেই সাহায্য করতে হবে।”

“আমাকে? আমি?”—আন্ট ম্যারিট চেয়ারের হাতলটা চুপে ধরলেন উদ্বেজনার মাথায়।

“হাঃ হাঃ হাঃ। ঠিক করে বল দেখি ওই যে ডিচ ড্রেন না কি—
চুলোর ছাই ওর জন্ম ও কত হাজার টাকা নষ্ট করেছে”—

“কাজ শেষ করার জন্ম সে ছ’মাস বেশী সময় নিয়েছিল। কিন্তু
কোম্পানী তার পাওনা অর্ধেক করে দিয়েছে—কারণ কাজ দেখে তারা
পরম সন্তোষলাভ করেছিল।” “আর কনট্রাক্টর যাদের এক পয়সা মাইনে
দিতে পারে নি—”

“সে সব দিয়ে দেওয়া হবে—ব্যাঙ্ক সে সমস্ত ঠিক করে ফেলেছে—”

“বুঝেছি। সমস্ত নষ্ট করে—এখন কিনা—তোমাদের দুঃস্বপ্ন
রীতিমত চাবকান উচিত তা জান”—

“টাকা পয়সার দিক থেকে অবশ্য কাজটা তেমন লাভের হয়নি, কিন্তু
কাজ হিসেবে এ একটা সৃষ্টি, দেখ সমস্ত পত্রিকায় পত্রিকায় কি ভীষণ
প্রশংসা।”—ভাই একখানা সাময়িকী বোনের দিকে এগিয়ে দিলে।

—“ও তোমার জন্ম রেখে দাও”—বৃদ্ধা উপেক্ষার ভরে চেয়ারে হেলান
দিয়ে বসলেন।

—“ও লোকটা দাঁড়াবে”—ইউথো জোর দিয়ে কথাটা বললেন।
হুঃখের গাধা দমে যাবার পাত্র তিনি নন—এইটে তিনি দেখাতে চেষ্টা
করেন। কারণ নিজের বুদ্ধিমত্তার ওপর তাঁর নির্ভর ভয়ানক।

“আবার কি আবার কোনও নূতন হুজুগে তোমায়
জড়িয়েছে—আজও কি—”

“সীমার সীমার দিকে ধরণের মোয়িং মেশিন আবিষ্কার করেছে। তা’
প্রায় শেষ বলে। ওস্তাদের বলে যে, তার দাম হবে কোটি
কোটি টাকা—”

—“ওঃ তাই বুঝি তুমি আমাকে বোঝাতে এসেছ!”—পা দিয়ে ঠেলে
তিনি চেয়ারটা একটু পেছনে সরিয়ে দিলেন।

“তুমি আমাদের একবছরের জন্ম সাহায্য কর—তুমি যদি ত্রিশ হাজার টাকা সিকিউরিটি দাঁড়াও, তা হলে ব্যাঙ্ক”—

হাতে হাত চাপিয়ে ম্যারিট বললেন—“আমার দ্বারা ওসব কিছু হবে না।”

“কুড়ি হাজার টাকা?”

“একটা আধলাও না”—লোরেঞ্জ তার বোনের দিকে স্থিরদৃষ্টিতে চেয়ে রইল—চোখ তার জ্বলছে।

“জন্মাকে গ্রেট ব্লকটাই হকে ম্যারিট”—তিনি পকেট থেকে একটা পাইপ বের করে তাতে মশলা ভরলেন—তারপর ধীরে ধীরে আগুন জ্বালালেন।

তারা পরস্পরের চোখের দিকে চেয়ে রইল, কার মনের জোর বেশী তারই পরীক্ষা হচ্ছে যেন। তারপর মৃদু হাসি দুজনেরই ঠেঁটের কোণে দেখা দিল।

“আজকাল তুমি বৌদিকে নিয়ে গীর্জায় যাচ্ছ বুঝি।”

“আমার যদি ভগবানে বিশ্বাস থাকত, আমি স্ট্রাইট হয়ে বসেই প্রার্থনা করতাম; ভাগ্যের হাতে সব ছেড়ে দিয়ে নিশ্চিত্ত হয়ে বসে থাকতাম।”

এই কথাতে বৃদ্ধার মুখে আবার হাসি ফুটে উঠল। বৃদ্ধা নিজে গীর্জায় যান না। তিনি ভগবানকে অভিযোগ দেন, কেন তিনি তাকে সম্ভানের জননী করেন নি।

চেয়ার থেকে উঠে বৃদ্ধা জিজ্ঞাসা করলেন,—“একটু কফি খাবে লোরেঞ্জ?”

“এতক্ষণ কি সব বাজে নকলছিলে”—তাই তার বোনের প্রকৃতি ফাল ফাল রকমেই জানে। তিনি চেয়ারে হেলান দিয়ে বসলেন—মনে গভীর শান্তি।

আবার পীয়ার ফিরে গেছে তার কারখানায়—আগুন আর ইম্পাতের সঙ্গে লড়াই করতে। কাজ করবার মত ছবি ত আঁকতে হবে ; মাথায় মডেলবটা থাকলে ত আর হয় না, কিন্তু যাকে সে কাজের ভার দিয়েছে সে বড় ধীরে ধীরে কাজ করছে। সে নিজেও ত সাহায্য করলে পারে !

যখন কর্মচারীরা আফিসে আসত, তারা শুনুতে পেত হাতুড়ী পেটার শব্দ। আর সন্ধ্যায় যখন তারা গৃহে ফিরে যায়, তখনও পীয়ার কাজ করে চলে অবিশ্রান্তভাবে। যখন রীংবি শহরের লোকেরা ঘুমুতে যায় তখনও তারা দেখতে পায় কারখানার ঘরে আলো জ্বলছে।

কাজ করার সময় মাথায় তার কত আজগুবি চিন্তা আসে। তার প্রথম জীবনে যখন সে কারখানায় কাজ করত, তখন কেউ কি তাকে ডিজেন্স করছে, সে এই জিনিষটা করতে পারবে কি না? আর এখন এই আগের দিনের মতই কাজ করে ফল তাকে পেতেই হবে—সারা জীবনে এত বড় বিপদের মুখে সে কোনদিন দাঁড়ায়নি ! এ জীবন-মরণের সমস্যা !

পেটার কার্টের কল তৈরী হয়ে গেছে—সমস্যা কত সরল দেখাচ্ছে। চিন্তা অর্জিত রূপ পেয়েছে, মনে হয় যেন যন্ত্রটার জীবনী-শক্তি আছে। এই ইম্পাতের চাকা, পাত এদের কি ইতিহাস নেই—এরা কি বংশগোরব বিলুপ্ত ? আজকের এই ইম্পাত যুগ হ'তে যুগান্তর শুধু নতনরূপে রূপ দিয়েছে, স্বল্প হতে স্বল্পতরর দিকে ছুটেছে—সমস্যা সমাধানের সুযোগ করে দিচ্ছে। আজ পর্যন্ত মানুষের চিন্তাধারা

যতদূর এগিয়েছে, আমি তার চেয়ে বেশীদূর পথ দেখেছি—টাকা—
সৃষ্টিকর্তার আজ টাকার প্রয়োজন। বিশ্বব্যাপী প্রচার করে আজ
শুধু অর্থের ভাণ্ডার পূর্ণ করতে হবে। নিদ্রা? শান্তি? আহারের
সুখ? এত বড় বিপদের মুখে—এই প্রাত্যহিক জীবনের দাম কতটুকু?

আজ আর সে প্রশ্ন মূর্ত হয়ে উঠেছে না। সেই চিরন্তন প্রশ্ন
কোথায়? কেন? কতদূর? আজ আর ওসব ভাববার সময় নেই।
জীবনের আকাশ আজ মেঘে ভরা—চিন্তাজাল বোনবার আজ আর
সময় নেই। একদিন সে স্বপ্ন দেখত মানুষের সঙ্গে দেবতার ভালবাসার
রাখী উৎসবের স্বপ্ন! আজ সে সব কোথায় মিলিয়ে গেছে। মানবাত্মার
কি উপকার হতে পারে একটা যন্ত্র নিয়ে? আত্মজ্ঞানের কোনো সাহায্য
সে কি করতে পেরেছে?

কিন্তু তবু এই তাকে করতে হাব। জীবনের পরম মুক্তি আজ
এই যন্ত্র। ইম্পাতের হাতে আজ সে খেলার পুতুল।

আধ-আবছায়া জানালার দিকে চাইলে অদৃশ্য মুখ যেন অস্পষ্ট
আলোকে দৃশ্যমান হয়ে কথা কয়—তারা বলে এখনো কোণার কাজ
শেষ হল না। শেষ না করতে পারলে ফল কি হবে জান? তারপর
আসে মালের আর তার মেয়ে—তারা যেন বলে—“আমাদের কি-
হবে? বাহিরে হিমের রাত্রিতে বরফ পড়বে, তার মধ্যে আমরা
ঘুরব, বল।”

ইউথো আর তার স্ত্রী তাকে বলে—“এই জুড়েই কি তুমি এই বনিয়াদ
বংশে প্রবেশ করেছিলে, শুধু ধ্বংস সাধন করতে।” আর সমগ্র মানব
সমাজ তাকে ধিক্কার দেয়। সবাই জানে, কত বড় বিপদের সম্ভাবনা
এ বিফলতায়—তাই সে পরিশ্রম করছে অতিরিক্ত। তার পথ চেয়ে
বসে আছে কত লোক, কত মর্যাদা, কত আত্মসম্মান, কত ক্ষুধিত

সন্তানের জননী। ব্যাক ম্যানেজার তার মুখের দিকে চেয়ে বসে আছে—তার টাকা কি উঠবে না?

এরা তার ঘাড় ধরে লোহার মুকুট পরিয়ে দিয়ে বলতে পারে—
“তোমাকে করতেই হবে! শ্রান্তি? কষ্ট? সময়ের স্বল্পতা? সে সব হয় না। তোমাকে করতেই হবে! অসম্ভব? সব কিছুকে সম্ভব করতে হবে। এই ত তোমার কাজ—বুঝলে?”

বাড়ীতে সে এখন থাকেই না। কারখানার একটা সোফায় সে ঘুমায়। প্রায়ই মাল্‌ আসে খাবার নিয়ে—কিন্তু তার কথাভুর শীর্ণমুখের দিকে চেয়ে সে কিছু প্রশ্ন করে না, তার বড় ভয় হয়। বরং সে কৌতুক করবার চেষ্টা করে। বহুদিনের অভিজ্ঞতা থেকে সে জানে যে বাড়ীতে বিপদের ছায়া ঘনিয়ে আসে সে বাড়ী কলহাস্ত্রে মুখরিত রাখতে হয়—তবে ছায়া সরে যায়।

কিন্তু একদিন যখন মাল্‌ বাড়ী ফিরে যাচ্ছে, পীয়ার তাকে ধরল— তার পর অদ্ভুত হাসিমুখে তার দিকে চেয়ে রইল।

“কি বলছ?”—অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে মাল্‌ তার দিকে চাইল।

কিন্তু পীয়ার তার দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে রইল। সে দেখছে তার অসুন্দৃষ্টি দিয়ে মাল্‌র ছোট্ট সংসারকে—তার মত ভবঘুরে লোক এই মাল্‌র মধ্য দিয়েই গৃহসংসারের সুখ অনুভব করছে। আহন্ন ঝড়ে সংসার কি ছিন্নভিন্ন হয়ে যাবে?

মাল্‌র নিকষকালো ভুরুর ওপর পীয়ার তার অধর স্পর্শ করে। মাল্‌র পদধ্বনি মিলিয়ে গেল, তার ইচ্ছা হয় একবার সেই সমস্ত শক্তির সমীপে প্রার্থনা জানায়—তার কাজের সাফল্য হেতু। কিন্তু দেবালয় আজ পরিত্যক্ত। তার পরিত্যক্ত সিংহাসনে বসেছে আশুনি আর ইম্পাত—তার নিজ হাতে গড়া যন্ত্র সব, তাদের দিকে চেয়ে

অন্তর তার প্রার্থনা করতে লাগল—“সাহায্য কর, আমার সাহায্য কর—আমার স্ত্রীপুত্রকে কেড়ে নিও না”—

ঘুম ? বিশ্রাম ? অবসাদ ? আর মাত্র এক বৎসর সময় আছে, তারপর ব্যাঙ্ক তার কাছ থেকে শেষ সম্পদটুকু ছিনিয়ে নেবে ।

শীত চলে যার, তারসঙ্গে বসন্ত—একদিন গ্রীষ্মের সন্ধ্যায় পীয়ার ছুটে মালের ঘরে গেল—“কালকে মালের, কালকে তারা আসবে !”

—“কারা আসবে ?”

—“যারা মেশিন পরীক্ষা করবে তারা । কাল পরীক্ষা হবে ।”

“পীয়ার”—নিশ্বাস রুদ্ধ হয়ে যাচ্ছে মালের—আনন্দ আবার ।

“ভালই হয়েছিল যে বাইরে আমি ঘুরেছিলাম । একজন আসছেন একটা ইংলিশ ফার্মের হয়ে আর একজন আমেরিকা থেকে—খুব বড় ব্যবসা চালান হবে—”

তারপর দিন মালের দাঁড়িয়ে রইল—তার স্বামী গাড়ী করে ছুটে যাচ্ছে—গত রাত্রে বর্ষার শেষ কুরাসার মাঝ দিয়ে ।

দাঁড়িয়ে উত্তেজনার কাঁপলে কোন লাভ নেই—আগন্তুকদের খাবার ব্যবস্থা করতে হবে ।

মাঠে মেশিনটা রয়েছে—সব রং দেওয়া হয়েছে, তাতে একটা ছেলে ঘোড়া ছটোকে জুড়ে দিচ্ছে ।

দু'জন লোক হাক্কা ওভারকোট পরে, নরম হ্যাট হাতে এগিয়ে এল । একজন বুড়ো ইউথো আর একজন ব্যাঙ্ক ম্যানেজার । তারা এসে অপেক্ষা করতে লাগল ছড়ির ওপর ভর দিয়ে । আজকের পরীক্ষার ফলাফলের ওপর তাদের অনেক কিছু নির্ভর করছে । পীয়ার নিজে হোটেল থেকে আগন্তুকদের এখানে নিয়ে এল ।

পীয়ার রক্তহীন মুখে নিজে মেশিনটার ওপর উঠে বসল, সামনে

জমি—তাতে বড় বড় নানা জাতীয় ঘাস ও আগাছা। ঘোড়াগুলো এক ঝাঁকুনি দিয়ে চলতে আরম্ভ করলে, হঠাৎ মেশিনটার অদ্ভুত আর্জনাদ শুনে লাফিয়ে উঠল—কিন্তু একটু পরেই সামলে নিলে। তারপর মস্ত চওড়া মাঠের ওপর দিয়ে বৃষ্টিস্নাত ঘাসগুলোকে ছেঁটে সমান করতে করতে চলল।

আগন্তুক দুজন পেছনে অগ্রসর হতে লাগলেন ধীরে ধীরে—মাঝে মাঝে নিচু হয়ে যন্ত্রটার নানা কলকল্লী পরীক্ষা করতে করতে। চাপাদাড়ি শুষ্ক লোকটি ভীডস এর জোন ফাউলার কোম্পানীর এজেন্ট আর বেঁটে দাড়ি গৌফ কামান ভদ্রলোকটি ফিলাডেলফিয়ার হারো এণ্ড কোংএর লোক।

মাঝে মাঝে তারা পীয়ারকে আসতে বলে ঘাস কাটা দেখতে লাগলেন। তারপর নানা রকম জমিতে পরীক্ষা চলতে লাগল। ফাউলার কোম্পানীর লোকটি বললেন পাথুরে জমির ওপর চেষ্টা করতে। কিন্তু তাতে ধারটা নষ্ট হয়ে যাবে। কিন্তু তারা জানতে চায় যে, পাথরে দাঁতগুলোর কি হবে?

পরীক্ষা শেষ হলে আগন্তুক দুজন চিন্তান্বিত মনে পরস্পরের দিকে চাইলেন। নতুন কিছু তাঁরা এখানে পেয়েছেন এবং এই বিশ্বব্যাপী বিরাট ব্যবসা প্রতিযোগিতায় দাঁড়াবার মত সম্ভাবনা যথেষ্ট তাঁরা দেখতে পেলেন।

পীয়ার এদের দিকে চেয়ে বুঝতে পারলে, এরা কি ভাবছে। অর্থ, সোনার খনি এরা দেখতে পেয়েছে এই মৃত যন্ত্রটার মধ্যে।

ভোজের পর আগন্তুকেরা বিদায় নিলে, মার্লে পীয়ারকে জিজ্ঞাসা করলে—“সব ঠিক হয়েছিল ত?”

“হ্যাঁ, কিন্তু একটা জিনিস ঠিক করতে হবে।”

“এতদিনের কঠিন শ্রমের পরও আবার খুঁত কি ?” হতাশায় মালে চেয়ারে বসে পড়লে।

“একটুখানি ব্যাপার। ঘাসগুলো যখন ভিজে থাকে তখন কলটার দাঁতগুলোর মধ্যে ফাঁকে ফাঁকে তারা জমে যায়। এটা আমার মাথায় আসেনি আর আমিও ভিজে মাটিতে পরীক্ষা করিনি। কিন্তু এই খুঁতটা ঠিক করতে পারলে আমরা বিশ্ববিদ্যুৎ হব, মাল্— আমরা আবার নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারব।”

আর একবার যন্ত্রটাকে কারখানায় নিয়ে যাওয়া হল। পীয়ার তার চতুর্দিকে ঘুরে বেড়াচ্ছে। কি করলে ঐটুকু দোষ নষ্ট করা যায়। সব শেষ শুধু একটুখানি, একটা সুযোগ, হঠাৎ সমস্ত যন্ত্রটা প্রাণশক্তিতে স্পন্দিত হয়ে উঠবে, দিকে দিকে ঘোষিত হবে তার জয়বার্তা।

যে কোনও মুহূর্তে আসতে পারে সেই সুবর্ণ সুযোগ। কিন্তু এত ধীরে ধীরে হলে কি করে হবে, হতাশায় দুর্বলতায় পীয়ার হাত কামড়াচ্ছে।

একটু পরিবর্তন, কোনটার আঙ্গুলগুলোর স্থান, না দাঁতটার দৈর্ঘ্য— কি করে যন্ত্রটা নিখুঁত হবে ? কেমন করে সে রাত্রে ঘুমবে ?

সে যেন একটা মস্ত বিপদের মুখোমুখি দাঁড়িয়েছে। এ কোনও নূতন অভিজ্ঞতা হলে সে স্থিরমস্তিষ্কে কাজ করতে পারত, কিন্তু তার শতবিচ্ছিন্ন চিন্তাজালকে আবার এক করবার শক্তি আর তার নেই।

প্রদীপ নিভে যাবার আগে একবার দপ করে জ্বলে উঠে।

অপেক্ষা করবার সময় নেই। আবার বাতায়নে সেই পুরান স্মৃতি সব, মাল্, তার মেয়ে, ইউথো, ব্যাঙ্ক ম্যানেজার সবাই উৎকর্ষায় প্রতীক্ষা করছে। সমগ্র জগৎব্যাপী যত প্রতিযোগী তারা। আজ

রাত্রে সে অগ্রগামী, কিন্তু কাল প্রভাতে হয়ত সে পিছিয়ে পড়বে।
ধৈর্য্য? বিশ্রাম? অসম্ভব!

শরৎ এসে পড়ল—শতবিন্দ্ররজনীর অত্যাচারে সে ডাক্তারের
শরণাপন্ন হতে বাধ্য হল। তিনি বললেন, শীতল জলে স্নান, বিশ্রাম,
নির্জ্বলতা আর আয়রণ এবং আর্সেনিক। হায় পীয়ার, পীয়ার সব
করতে পারে কিন্তু বিশ্রাম, ঘুম—সে যে অসম্ভব।

রাত্রির দীর্ঘতায় সে অপেক্ষা করে অবসন্ন দেহ মন নিয়ে, চেয়ে
চেয়ে দেখে নির্কাপিত আগুন, ইম্পাতের বোঝা আর যত যন্ত্রপাতি—
তার চোখের সামনে অজস্র ফুলিঙ্গ ঠিকরে পড়ছে—আর গলিত লৌহ
ক্ষুদিত স্থাপদের মত তার চারিদিকে ঘুরে বেড়াচ্ছে। আর ওই
আগুনের পাশে আবছা ও কারমূর্তি ক্রমবিস্তারমান, সুস্পষ্ট, অল্প দাড়ি
তার; নগ্ন এক অপদেবতা। এক হাতে তার অগ্নি আর এক
হাতে হাতুড়ী।

“কে,—তুমি কে?”

“তুমি আমার চেন না, মানুষ?”

“তুমি কি তাই বল আমাকে?”

“তোমাকে আমার একটা কথা বলবার আছে—পৃথিবীর ছন্দে
অন্য কোনও সুর যোগান তোমার পক্ষে বোকামি। প্রার্থনায় তোমার
কি হবে? তুমি হয়ত স্বপ্ন দেখবে যে বাস্তব থেকে দূরে সরে গিয়েছ
তুমি, কিন্তু প্রচণ্ড বাস্তবের আঘাতে তোমার স্বপ্ন মিলিয়ে যাবে
শূন্যে। তোমার মুক্তি নেই। বাস্তবকে পরিত্যাগ করে তোমার
আত্মা অর্থহীন। বিশ্বদেবতা? সুখ? আত্মা? জীবনের অনন্ত আনন্দ?
মিছে সব—সব ছায়া। বিশ্বের আত্মা ছুটে চলেছে তার শেষ পথে
আর মানুষের আত্মা সেই অগ্নির ইন্ধন শুধু।”

পীয়ার চমকে ওঠে, এ বাস্তব না স্বপ্ন—তার সংশয় হয়। কিন্তু সব ফাঁকা, শূন্যতার বাতাস শুধু হু হু করে।

মাঝে মাঝে লোরেঞ্জো সে যায়। কিন্তু সব কিছু তার কাছে কুহেলী বলে মনে হয়। সে অস্পষ্ট ভাবে দেখতে পায় মালের চোখ লাল, হয়ত কেঁদে কেঁদে, কিন্তু তবু মালের গান গাইছে—মুখে তার উজ্জ্বল হাসি। সে যখন শব্য্যার গুয়ে রয়েছে তার মনে হচ্ছিল মালের যেন তাকে ঘুমোবার জন্য অনুরোধ করছে। প্রশান্ত নিদ্রায় কি আনন্দ। মাঝে মাঝে রাত্রির অন্ধকারে তার মনে হয় কলটার দাঁতগুলোর উপর সব নির্ভর করছে। তখন সে উঠে পড়ে—তারপর ছুটে যায় কারখানার দিকে—কেউ তাকে রোধ করতে পারে না। শীত আবার এসে পড়েছে—বরফের ঝড়ের মধ্য দিয়ে সে ছুটে যায় তার কারখানার দিকে,—কেউ তাকে রোধ করতে পারে না। তারপর সেই থমথমে নিস্তন্ধ রাত্রে সে কারখানার আলো জ্বাল—তারপর আগুনের লেলিহান শিখা। শীয়ারগুলোর স্রু খুলে আবার সে লাগায়। কিন্তু তখন সে বুঝতে পারে কতবড় ভুল তার হচ্ছে—শীয়ারগুলোর দোষ কিছু নেই!

কফি খেলে মাথা ঠাণ্ডা থাকে। কারখানায় বসে তাই সে কফি তৈরী করে পান করে আর বিশেষ করে রাত্রে কয়েক পাত্র কফি তার উপকার করে। তার আর অন্য কিছু খাবারে লালসা থাকে না। হঠাৎ মাথায় তার একটা খেয়াল আসে যে আবার যন্ত্রের অংশগুলো নূতন করে তৈরী করবে এই সব রাত্রে—কফি দীর্ঘ পরিশ্রমে ক্লান্ত তার দেহকে চাঙ্গা রাখে।

তার মাঝে মাঝে মনে হয় যেন মালের, তার শ্বশুর, ব্যাঙ্কের ম্যানেজার সকলে একসঙ্গে কারখানার চার পাশে সতর্কিত ভাবে ঘুরে বেড়াচ্ছে আর লক্ষ্য করছে কতদূর কাজ শেষ হ'ল, তারা তাকে

একটু শান্তিতে থাকতে দেয় না কেন? অন্তত এক সপ্তাহের জন্যে। আসছে বছরের গ্রীষ্মের আগে ত আর এ যন্ত্রটার পরীক্ষা হতে পারে না। কখনও আবার পীয়ার ঘর থেকে ছুটে বেরিয়ে আসে—“কেউ এখানে আসতে পারবে না, আমার এখানে শান্তি চাই।” কর্মচারীর চমকে ওঠে এই উদ্বেজনায়, তারা পরস্পরে মাথা নাড়ায়।

একদিন সকালে মাল্‌ এসে কারখানার ঘরের কড়া নাড়তে থাকে। কিন্তু কোন উত্তর না পেয়ে ভেতরে প্রবেশ করলে। তার এক মুহূর্ত পরে কর্মচারীরা ছুটে আসে একটি স্ত্রীলোকের আর্তনাদে। তারা দেখে মাল্‌ পীয়ারের পাশে বসে আর স্বামী তার মুখের দিকে চেয়ে আছে উদ্দেশ্যহীন অদ্ভুত দৃষ্টি দিয়ে—“পীয়ার”—মাল্‌ তার স্বামীর সমস্ত শরীরে নাড়া দেয়—“পীয়ার গুনচ। কি হয়েছে তোমার বল, পীয়ার।”

এপ্রিল মাসে এক বুধবারে ছোট রীংবি শহরের অনেক লোক ভাল জামাকাপড়ে সজ্জিত হয়ে নদীর রাস্তা ধরে লোরেঞ্জের দিকে যায়। দলের মধ্যে ছ'জন পত্রিকার সম্পাদক—তারা এইমাত্র একটি তর্ক করছিল...হঠাৎ উঠে এসেছে। ছ'জন উকিল পরস্পরের হাত থেকে অতি ছোট কাজটুকু কেড়ে নিতে উচ্চত অবস্থায় চলেছে—আর এই দলের মধ্যে আছে ব্যবসায়ী, লেখক আর সব রকমের লোক। প্রত্যেকেই লম্বা ওঁভারকোট আর ফেঁট হ্যাট পরেছে—তাতে তাদের একটু দীর্ঘ দেখায়।

পথের মোড় বেকে প্রত্যেকই ওই শাদা বাড়ীটার দিকে চাইল। দূরদিগন্তে পাহাড়ের শ্রেণী তারই সামনে ছবির মত এই বাড়ী -সামনে উদার প্রশস্ত নদী আর পল্লীশ্রী এর প্রতি অঙ্গে। লোকেরা বলাবলি করছিল বিরাট ভোজ, আর মহাকাণ্ডিতের কথা নিয়ে—যা সেই গুভর্নরের

সময় থেকে সেদিন অবধি চলেছে সর্গোরবে—ইঞ্জিনীয়ার' এর যশ যখন অটুট ছিল—অর্থ ছিল অজস্র।

আর আজ সেই বাড়ীর সমস্ত জিনিষপত্র নীলাম হবে—তাই দূর থেকে লোকেরা এসেছে। কারণ ব্যাঙ্কের পরিচালক মণ্ডলী বিবেচনা করেছিল যে, পীয়ারকে আর সময় দেওয়া চলতে পারে না, বিশেষ করে সে এখন হাসপাতালে অসুস্থ অবস্থায়। কোনও ডাক্তারই জোর করে বলতে পারছে না—স্বাস্থ্য আর তার ফিরে আসবে কি না!

প্রাঙ্গন লোকে লোকারণ্য। ভেতরে নীলামকারী সমস্ত জিনিষ এক করছে, কিন্তু সকলেই বাড়ীর মধ্যে যেতে দ্বিধাবোধ করছে। বাড়ীর ভেতরে বাতাস আজও আতিথেয়তা ও সর্গোরবের ভারে মগ্ন হয়ে আছে, দেশের বড় বড় যোদ্ধা ও সেনাপতিগণ তাদের প্রিয়তমাদের আলিঙ্গন করত—বড় বড় ভোজের টেবিলে সম্মান জানাত দেশের সম্রাটকে—সেই সব পুরাতন দিন—আর ইজিপ্ট প্রত্যাগত ইঞ্জিনীয়ার তার সম্পদের সময় নিমন্ত্রণলিপি পাঠাত দেশের ভদ্রলোকদের—সে আর কত দিনের কথা—আজও তার স্মৃতি থামে থামে জড়ান আছে।

সকলেই প্রায় সিঁড়ির ওপর কিংবা হলঘরটার দাঁড়িয়ে আছে। মাঝে মাঝে কালো সাজে একটি মেয়ে—মসীকৃষ্ণ তার ভুরুছটি চিন্তাক্রান্ত ভাবে প্রাঙ্গনে যাওয়া আসা করছিল এবং চাকরদের সব জিনিষ বার করতে হুকুম দিচ্ছিল। এই মেয়েটাই মাল্—কিন্তু আজ আর সে গৃহকর্ত্রী নয়।

সিঁড়ির ধারেই ইউথো তার বোনকে দেখতে পেল। ব্রুসেথবাসী তার ক্র'ছটি কুঞ্চিত করে ভাইয়ের দিকে সংশয় মাখন চোখে তাকাল—কিন্তু ভাই তার পাশ দিয়ে যাবার সময় বললে—“তোমার কোনও ভয়ের কারণ নেই। আমি সমস্ত বন্দোবস্ত করেছি যাতে এখনও দেউলে হতে হয় নি

আমাকে । আর তোমার প্রাণ্য সে ত ঋণ্যামতেই ফিরে পাবে’—তারপর ভারী পা ফেলে তিনি ভিড়ের মধ্যে এগিয়ে গেলেন, এমন তার গতি-ভঙ্গিমা যাতে ভুল হয় এ লোকটি সমস্ত বিপদের মুখেও সরলভাবে হাসতে পারে ।

তারপর দিন গড়িয়ে গেল, বিজুকে বিক্রী করবার জন্তু নিয়ে আসা হ’ল । তাকে প্রাঙ্গন পেরিয়ে এক জায়গায় দাঁড় করান হল । কিন্তু পথিমধ্যে সে একবার থেমে মাথা উঁচু করে চোঁচিয়ে উঠল । সঙ্গে সঙ্গে আস্তাবলের ঘোড়াগুলো হেয়ারব করতে লাগল—তারা যেন একে বিদায়-অভিনন্দন জানাচ্ছে । বহু বৎসর পূর্বে সে যখন এখানে এসেছিল তখন যৌবনের শক্তিতে দেহ তার দৃপ্ত, আনন্দে তার যৌবন কাঁপছিল—আর আজ ?

কিন্তু কাঠের গোলায় একজন লোক আপনমনে কাঠ কেটে চলেছে, কোন খবরই সে রাখে না । একজন গৃহকর্তা চলে যায় আর একজন আবার আসে, প্রত্যেকরই আগুনের কাঠ চাই—তার এ কাজের অভাব নেই । আর কেউ যদি তাকে বলে চলে যেতে সে শুনতে পাবে না—সে ত একেবারে বধির । ঠক ঠক ঠক কুঠার তার কাজ করে চলে ।

নীলচক্ষু একজন তরুণ যুবক একটা গাড়ীতে করে আসছে । তারপর প্রাঙ্গনে এসে ওভারকোটটা খুলে হাতে নেয় । এ হচ্ছে ইউথো । জেয়ার ইংলিশ টুইডসের এজেন্ট—সে তার জামাইবাবুর সঙ্গে যোগ দেয় নি । তাই সে তার পিতাকে আসন্ন বিপদ থেকে রক্ষা করতে পেরেছে ।

এ সঙ্গেও লোরেন্সের নীলাম বেশ কয়েকদিন ধরে চলল ।

তৃতীয় খণ্ড

(১)

আবার সেই গভীর উপত্যকা আর সূর্যকরোজ্জ্বল গোলাবাড়ী—সামনে তাদের নদী, পিছনে পাহাড়ের সারি। গ্রীষ্মের মাঝামাঝি একদিন বুড়ো রোষ্টাড নিজে এল ষ্টেশনে—সঙ্গে তার একট' গাড়ী আর তার পেছনে মাল গাড়ী। বুড়ো কি কোনও নবাগতের প্রত্যাশা করছে? ষ্টেশনের লোকের তাকে জিজ্ঞাসা করল। “হয়ত তাই”—রোষ্টাড তার সেই ঘন চাপ দাড়ীতে চাপ দিলে, তারপর ঘোড়াগুলোর দিকে মনোনিবেশ করলে। “যারা কোর্ট হাউস ভাড়া নিয়েছে তারাই আসছে নাকি?” “হ্যাঁ, তারাই” --বুড়ো লোকটি উত্তরে বললে।

ট্রেন এল; একজন লোক, মুখ তার রক্তহীন, চুলে আর দাড়ীতে পাক ধরেছে, চোখে তার নীল চশমা, আর তিনটি ছেলেমেয়ে নিয়ে নামল। “পল্ রোষ্টাড”—আগন্তুক খোঁজ করলেন। “আমিই সেই।” আগন্তুক একবার উত্তরদিকের সেই বিরাট পাহাড়ের দিকে তাকালেন—খাড়া পাহাড়, আকাশের গা-ছোঁয়া। “এখানকার বাতাস ত ভাল হওয়ার কথা।” “হ্যাঁ, এখানকার হাওয়া সব রকমেই স্বাস্থ্যপ্রদ।”—বলে বুড়ো রোষ্টাড মাল গাড়ীটা ভর্তি করতে লাগল।

পর্বতমুখী পথটা ধরে তারা এগিয়ে চলল। স্বামী এবং স্ত্রী সামনের গাড়ীটাতে বসল—স্ত্রীলোকটির কোলে একটি শিশু। আর ছেলেটি ও মেয়েটি মাল গাড়ীতে বসল বুড়ো রোষ্টাডের পেছনে। “গোলাবাড়ীটা

এখান থেকে দেখা যায় না?"—স্ত্রীলোকটি জিজ্ঞাসা করলে। আঙ্গুল তুলে বুড়া দেখিয়ে দিলে—“ওই যে দেখা যাচ্ছে।” তারা দেখলেন একটা বড় রকমের গোলাবাড়ী—রৌদ্রস্নাত পাহাড়ের ঢালুর ওপর প্রায় পাহাড়ের মাথার কাছেই। পাশে তার একটা লম্বা বাড়ী, নাঁচু নাঁচু ঘর আর খাড়াই—ছাদগুলো স্নেটের। এই সমস্ত বাড়ীতে পুরোনো দিনে ডিষ্ট্রিক্ট অফিসার বাস করতেন। “ওই বাড়ীতেই বৃষ্টি আমাদের থাকতে হবে?” “ঠিক বলেছেন।”—উত্তরে বুড়া বললে—তারপর খোড়ার পিঠে লাগালে এক চাবুক।

দীর্ঘ আঁখিপক্ষ মেলে মেয়েটি চেয়ে রইল—তারপর ধীরে ধীরে একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেললে। এই তাদের নূতন ঘর-সংসার। এইখানে তাদের বাস করতে হবে—দূরে পড়ে রইল পুরানো বন্ধু যত। ভাস্ক্যারের ওদুধ যাতে ব্যর্থ হয়েছে, এই জল-মাটি বাতাস তাই কি ফিরিয়ে দিতে পারবে?

একটা লেপল্যাণ্ড কুকুর দরজার কাছে ঘেউ ঘেউ করতে লাগল; একজোড়া শূয়োর পথ থেকে ছুটে এল—চুপ করে গভীর মনোযোগের সঙ্গে এই আগন্তুকদের পরীক্ষা করল—তারপর একপাক ঘুরে বাড়ীর মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল।

চাষার স্ত্রী বাড়ীর বাহিরে অপেক্ষা করছিল—মাথায় তার কালো টুপি, লম্বা ধরণের চেহারা, মুখশ্রী কুঞ্চিত। খসখসে অস্থিবহুল হাত বাড়িয়ে দিয়ে এদের অভ্যর্থনা করলে।

নাঁচু ছাদের কয়েকখানি ঘর, মস্ত বড় বড় চিম্‌নি—শীতে কাঠ দিতে হলে প্রচুর। সব রকম আসবাব এখানে জড় করা হয়েছে। একটা মেহেগনি কাঠের সোফা.....ছবি আঁকা কাবার্ড, পুরানো নর্স ভঙ্গিতে খোদাই করা চেয়ার আর দেওয়ালে বিদেশী রাজপরিবারের

আর ক্রশবিদ্ধ যীশুর ছবি। “হায় ভগবান”—ঘরগুলোতে ঘুরতে ঘুরতে
 ঝালো ভাবলে—“কতদিনে এইসব আবার অভ্যস্ত হয়ে যাবে!” কিন্তু
 তৎক্ষণাৎ লুইস হাঁপাতে হাঁপাতে এল—“এখানে কত ছাগল রয়েছে
 মা।” তারপর পেছনে ছুটে এল লোরেঞ্জ—“মা কত ছাগল”— উত্তেজনার
 বশে সে চৌকাঠে হৌঁচট খেয়ে পড়ল।

জনশূন্য এই পুরাতন বাড়ীটা বহু বর্ষ ধরে মৃতের মত পড়েছিল।
 এতদিনে মনে হচ্ছে যে, আবার তার জীবনশক্তি ফিরে এসেছে।
 আসা-যাওয়ার পদচিহ্ন ঘরে বাহিরে অঁকা হতে লাগল—সিঁড়িগুলো
 ছোট ছোট চঞ্চল, অভিসাধা পায়ের চাপে কৌক কৌক করতে
 লাগল। বাড়ীর আনাচে-কানাচে আবার সাদা জেগেছে। রান্না ঘরে
 কড়াবাসনের আওয়াজ। আগুন জ্বলছে আর চিহ্নি গুলো ধূমোদার
 করছে। প্রতিবেশীর বাড়ীর পাশ দিয়ে যেতে যেতে দেখল—মৃতের
 দেহে আবার চেতনা জেগেছে।

অস্থির পর পীরার এখনও দারুণ দুর্ভাগ। কিন্তু তবু বাঁধাছাঁদা-
 গুলোর ব্যর্থস্বায় সে সাহায্য করবে। কিন্তু একটু পরেই হাপ ধরতে
 লাগল গারীর কিম্ব কিম্ব করে, আর মাথার ঠিক পেছনটায় কে
 যেন অধিগ্রাম হাতুড়া পেটায়। মনে কর এখনকার হাওয়ার কোন
 উপকার হ'ল না! জীবনের শেষ-স্তরে এসে হরত ঠাড়িয়েছ। এক
 বৎসর এখানে থাকবার মত ধার ভুমি করেছ। স্ত্রী-পুত্র পরিবার—
 চুপ করে ওসব ভেব না—ওসব চিন্তা সরিয়ে রাখ—অন্য কিছু ভাব।

জামা কাপড়গুলো ওপরে নিয়ে যেতে হবে। হ্যাঁ, মনে করতে
 পার, নিজে কোন দিন ভেবেছিলে যে পরের দরার জীবনের শেষ
 তোমার কাটবে। তাও ত চিরদিন চলতে পারে না। আসছে গরমের
 মধ্যে ভাল না হ'তে পার যদি—যদি বছর দুই এমনি করেই কেটে

যায়—তারপর—তোমার নিজের ব্যবস্থা হয় ও হতে পারে কিন্তু মাল্
—তার ছেলেমেয়ে—চুপ কর—আবার ঐ চিন্তা। একদিন তুমি নির্দিষ্ট
সময়ের মধ্যে কাজ শেষ করতে পারতে—এখনকার কর্তব্য হচ্ছে
আসছে বছরের মধ্যে শরীর খুব ভাল করা। এই তোমার কর্তব্য।
কিন্তু মাথার পেছনে হাতুড়ী পেটান যদি একবার বন্ধ হয়—ওরে ঐ
শয়তানটাকে থামতে বল—থামতে বল—উঃ!

ঘরের মধ্যে যাতায়াত করার সময় মাল্ও ঠিক তাই ভাবছিল
কিন্তু তার চেয়েও বড় ভাবনা তার মাথার মধ্যে ছিল—সমস্ত জিনিষ-
পত্র সাজান আর সংসারটাকে ঠিকভাবে চালান। খাবার সমস্ত স্থানীয়
দোকান থেকে কিনে আনতে হবে। সকালবেলা তার কত লিটার
দুধ দরকার হবে? ডিম কোথায় পাওয়া যায়? তাকে এক্ষুণি
রোষ্টাডের কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা করতে হবে। স্মরণে এই জ্বীলোকটি
রক্তহীন মুখে কালো পোষাকে সজ্জিত হয়ে অবনত মুখে প্রাঙ্গন দিয়ে
ধীরে ধীরে যায়। যখন কোনও লোকের সঙ্গে এই গ্রামের বিষয়ে
কথা হয়, তারা অভদ্রের মত মুখের পানে চেয়ে থাকে—এ কেমন
অদ্ভুত ধরণের হাসি মেয়েটির ঠোঁটের কোণে।

—“বাবা, দেয়ালে একটা ঠারলিং-এর বাসা রয়েছে”—ছোট লুইস তার
বাবার গলা জড়িয়ে ধরে বলল—সে তার বাবার কাছে শুভরাত্রি জানাতে
এসেছে—“আবার কড়ি কাঠের তলার একটা চড়াই পাখীর বাসা।”—

—“ও, হ্যাঁ দেখনা এখানে কত রকমের মজা হবে।”—তারপর
মাল্ আর পীয়ার তাদের সেই অদ্ভুত বিছানায় আশ্রয় নিল,—দৃষ্টি তাদের
ঐ স্নিগ্ধালোকিত নিদাঘের রাত্রির পানে।

জাহাজডুবির যাত্রী তারা চেউয়ের দোলায় পৌঁছেছে এসে তীরে।
কিন্তু এখনো বিপদের সম্ভাবনা রয়েছে।

অস্থিরভাবে পীড়িত পাশ ফিরছে বার বার। শরীরে তার মাংসভাব—মনে হয় অস্থি আর শিরাগুলো শূন্যতায় ভরে উঠেছে—কোন অবস্থায় তার শান্তি নাই। শত শত চাকা ঘুরে চলেছে তার মস্তিষ্কের মধ্যে আর তার থেকে স্ফুলিঙ্গ ঠিকরে পড়ছে—তার স্বপন দেখাচ্ছে তাকে।

শান্তি! দিন যখন সহজে ছুটে চলেছিল তখন কেন শান্তিতে থাকবার বাসনা কর নি'।

প্রথম প্রপাতে সে ত অবিমিশ্র যশ পেয়েছে। নূতন পরণের পাম্প তাকে অজস্র অর্থ এনে দিয়েছে। কিন্তু চিরদিনই ত তার মনে এই প্রশ্ন জাগত। কেন? কতদূর তোমার লক্ষ্য? কোথায় এর শেষ? সেত একজন বড় ইঞ্জিনিয়ার, সে ত বিরাট রেলপথে তৈরী করেছে এবং আরো রেলপথ তৈরী করবার সুযোগ তার ছিল। কিন্তু তবু সেই একই প্রশ্ন তার মনে আসত—কোথায়? কতদূর? নিজের ঘর-সংসারে সে ফিরে যাবে স্বদেশে—কিন্তু সংসার, গৃহ তাকে কি শান্তি দিতে পেরেছে? কি সে শক্তি বা আবার তাকে মত্ত করে তুলেছিল? ইম্পাত আগুন, আগুন ইম্পাত?

হায়, সেই দিন—যেদিন সে সেই মোয়িং মেশিন থেকে নেমে যন্ত্রটাকে উন্নত করবার চিন্তাজালে বাঁধা পড়েছিল। একরবার তার কি প্রয়োজন ছিল? অর্থের অভাব সে ত ভাবতে পারত না। না—না কাজ ত বন্ধ ছিল না—তাও না। কিন্তু হায়, ইম্পাতে চাকা গড়িয়ে যাচ্ছে। একটা মানুষের দরকার—পাথর আমার জিহ্বা ধরে আদেশ করলে—“তোমাকে করতে হবে।” কিন্তু উপায় কই?

সুখ? শান্তি? হায়, নেই, নেই। কতদিনের জমান জ্ঞান অভিজ্ঞতা একদিন হঠাৎ শয়তানের রূপ ধরে আসে, তারপর তোমার

পিঠে চাবুক চালায়—অবিরামভাবে চলে তার নির্যাতন। তুমি মরতে পার—তোমার যাই হোক—তার কি যায় আসে? ইম্পাত একজনকে ধরে, তার দেহের রক্ত নিঙড়ে বার করে—তারপর দ্বিতীয় খাণ্ডের দিকে হাত বাড়ায়। বিশ্বের অগ্নির ইন্ধন চাই—মানুষ অবনত শিরে ঝাঁপিয়ে পড়—আগুন জ্বলে, জ্বলে, জ্বলে।

আজ তুমি উন্নতি করছ, কাল তোমায় মর্তের পাতাল পুরীতে ফেলে দেবে। তাতে কার কি যায় আসে? আগুনের ইন্ধন বই ত আর কিছু নও তুমি, মানুষ?

কিন্তু না, আমিও বিরাট আগুনের খাণ্ড যোগাব না—ও আগুন আমার জন্ম নয়—হোক না—নিখিল প্রকৃতির দেবতার হাতে জ্বালা এ অগ্নিশিখা। আমাকে ছাড়া পেতে হবে—অন্তরে বাহিরে আমাকে বাঁচতে হবে। পৃথিবী তার গতিপথে ছুটে যাক হাজার হাজার বৎসর ধরে—তাতে আমার কি?

তোমার আয়া! তোমার সং ভাই-এর দিকে তোমার মনোবৃত্তির কথা একবার ভাব—হাঃ, হাঃ, হাঃ—সেকন্দরীয়রের ভুল হয়েছিল—বোকারাই শুধু ঠকে এ পৃথিবীতে। হাঃ হাঃ হাঃ—

“পীয়ার ভগবানের নাম করে বলছি—একটু ঘুমোবার চেষ্টা কর।”
“হ্যাঁ। ঘুমোব ঠিক—কিন্তু কি গরম!” সমস্ত অঙ্গ থেকে পীয়ার ছুঁড়ে দিলে রাত্রির সাজ। নিশ্বাস তার দ্রুত আর ভারী।

“তুমি নিশ্চয়ই শুয়ে শুয়ে ভাবছ? তুমি আর ভাবতে চেষ্টা করনা পীয়ার—সুইডিশ্ ডক্টর যা তোমাকে বলেছিল—মনে কর তোমার চারিদিকে শুধু অন্ধকার”—

পীয়ার একবার চারিদিক তাকিয়ে দেখলে—শুধু অন্ধকার। কিন্তু এই অন্ধকারের বুকে জাগছে চেঁউ, সুরের তরঙ্গ, কাছে, কাছে, আরো

কাছে। এ-এক ভজনের সুর—লুইস। আর শান্তি, সুখ—হা ভগবান—
শান্তি কি, সুখ কোথায়?

লুইস অদৃশ্য হয়ে গেল—যেমন করে নির্ঝাপিত আলোর অস্তিত্ব
মুছে যায়। তারপর ফিরে আসে বিরাট ধ্বনি—নানা প্রকারের বিরাট
ও বিকট আওয়াজ। আজ আর তার চেয়ে এ-ধ্বনির পরিচয় কে ভাল
করে জানে—এ সেই ইম্পাতের সঙ্গীত।

জাহাজ থেকে—রেলগাড়ী থেকে আসছে এই চীৎকার—তাদের
—সেই নিষ্করণ হলদে চোখে মানুষের তৃষ্ণা ফুটে উঠেছে। দ্রুত, দ্রুত
তার গতি—ছুটে চলেছে ইম্পাতের দানব মানুষ শিকারে—আর পৃথিবীর
আত্মা কাঁপছে জ্বর বিকার আর পাগলামীর অত্যাচারে।

ইম্পাতের রেলিংগুলো পড়ছে—চাকা ঘোরার ঘটং ঘটং
শব্দ, শিকলে, ক্রেনে ধাক্কার বিরাট আওয়াজ আর হাতুড়ীর
আর্তনাদ—সেই বিকট ধ্বনিতে সুর যোগাচ্ছে। আগুনের শিখা
জ্বলছে আর শয়তানের অনুচরের মত মানুষ সেই আগুনের পাশে
ঘুরছে। ওরাই ইম্পাতের ক্রীতদাস—চিরদিনের নির্যাতিত—বিশ্রাম-
বিহীন ওদের কাজ।

প্রোমেথিয়াসের আত্মার এই কি পরিণতি। চেয়ে দেখ, ইম্পাতের
ইচ্ছায় মানুষকে হাওয়ায় ছুঁড়ে দেওয়া হয়েছে। ওরা স্বর্গ বিজয়ে
গেছে। কেন? কারণ, গতি আরো দ্রুততর করতে হবে। শুধু দ্রুততা
আরো, আরো, আরো জোরে—কিন্তু কেন? কোথায়? তা কি তারা
জানে?

মাটির মানুষ কি নিরাশ্রয় হয়ে গেছে? এক মুহূর্ত্ত বিশ্রাম নিতে
তাদের. এত ভয় কেন? নিজের অন্তরের শূন্যতা চেয়ে দেখতে কি
তাদের ভয় হচ্ছে মনে মনে? হারিয়ে যাওয়া তাদের কোন বস্তু—

কোন স্তোত্র, কোন সুরলহরী, কোন হারানো দেবতার অনুসন্ধান কি তারা করছে।

ভগবান! তারা দেখতে পাচ্ছে এক রক্ত পিপাসু জীহোভা আর ক্রসের ওপর একজন ঋষি। আধুনিক এই যন্ত্র-জগতের দেবতা কারা? ধর্মের ইতিহাস ধর্ম নয়।

মার্লে পুনরায় বললে—“ভগবানের নাম করে বলছি—পীরার একটু ঘুমোবার চেষ্টা কর।”

“মার্লে, তোমার কি মনে হয় আমি এখানে থাকলে সেরে উঠব?”

“কেন? তুমি কি এখনো বুঝতে পারনি এখানকার বাতাস কি চমৎকার? নিশ্চয়ই সেরে উঠবে তুমি।”

নিজের আঙুলের মধ্যে মার্লের আঙ্গুলগুলো জড়িয়ে নিলে—অবশেষে আবার জাগল তরঙ্গ, ভজনের ধ্বনিতে ভরে উঠল অন্ধকার দোলা দেয়, —ধীরে ধীরে দোলা দেয়—ঘুম—চোখ তার বন্ধ হয়ে গেল।

বনের মধ্যে একটা সরু পথ, ছোট বাক তার, আর পায়ের তলায় ব্রাউন পাইনের কারপেট পাতা ; বন পতি আর আকাশ, স্তব্ধতা আর শান্তি—এখানে বেড়ালে আনন্দ হয় মনে । পথটি মাঝে মাঝে উঁচু নাচ কিন্তু তার জন্তে কোনও কষ্ট হয় না । এই পথ বন্ধুহান পথিকের একমাত্র সাথী—সে কানে কানে নীরব ভাষার বলে—“খনটা সহজ করে তোলা । সময় কাটিয়ে যাও । একটু বিশ্রাম করা ।” গাছের গুঁড়ির পাশ দিয়ে এপথের ছেঁড়, দেখলে মনে জাগে একটা তন্দ্রা, পরিপূর্ণা কুমারার মূর্তি ।

এইখানে গীয়ার রোজ বেড়ায় । মাঝে মাঝে খেমে ফার গাছের মাথার দিকে তাকিয়ে থাকে, তারপর আবার চলা ; মাঝে হয়ত একটা শ্রাওলা-পিচ্ছিন পাথরের ওপর একটু বিশ্রাম করা । কিন্তু সে অল্পক্ষণ—সর্বদাই তার মন গতিশীল । কিন্তু লক্ষ্য তার কোথায় কে জানে ? আর যা' কিছু হোক এখানে একটু শান্তি পাওয়া যায়—। হয়ত একটা পোকা ফার-শাখা দিয়ে চলে যাচ্ছে তাই সে দেখছে বহুক্ষণ ধরে কিংবা হয়ত নীচে উপত্যকার ওপর নদীর কলধ্বনি কান পেতে শুনছে কিংবা রেজিন গাছের গন্ধ যা' হাওয়াকে ভারী করে তুলছে তাই নিশ্বাসের সঙ্গে টেনে নিচ্ছে ।

এই যে তার বর্তমান জীবন ধারা এও একরকম বাঁচবার প্রণালী । মাঝে মাঝে কোনও বিনিদ্র রজনীতে বাতায়নে উষার আলো ফুটে ওঠা

দেখে সে চিন্তা করত—আবার আর একটা নূতন দিন—কিন্তু আমার কাছে এ ব্যর্থ! কিন্তু তবু তাকে উঠতে হবে, সাঙতে হবে—নীচে গিয়ে আহাৰ করতে হবে। খাবার তার কাছে বিস্বাদ লাগত—সে বেশ অনুভব করতে পারে কত বড় পরাধীনতা। কত বড় দয়ার উপর সে বেঁচে আছে—ক্রসেথের খুড়ীমা আর ‘ইংলিশ্ টুইড’এর এজেন্টের দয়ার উপর। তাকে ধীরে ধীরে খেতে হবে, প্রত্যেকটি খাবার ভাল করে চিবিয়ে তবে গিলতে হবে—আহারের পর বিশ্রাম করতে হবে আর সর্বোপরি বিরাট বিশ্বের কোনও চিন্তায় তার অধিকার নেই। পরে তাকে কতবার আসতে যেতে হবে কিন্তু তার এই আসা-যাওয়া একান্ত অকারণে। এ-সব সে করতে বাধা—স্বাস্থ্য ফিরে পাওয়া চাই-ই, চিন্তা বিসর্জন দিতে হবে তার সময় কাটিয়ে দিতে হবে।

কিন্তু কেমন করে এ-অবস্থা হ’ল!—এটা সে কিছুতেই বুঝতে পারে না যে এমন খাপছাড়া কাজ সংসারে কি করে হয় অথচ কোন দৈব তার প্রতিরোধ করে না, তাকে সোজা পথ দেখিয়ে দেয় না। কেন তাকে এমন অকস্মাৎ এত বড় পরংসর মধ্য ঠেলে দিলে? তার পরিপূর্ণ মনুষ্যত্বের যত দিন মাস ও বৎসর কেবল শূন্যতায় ভরে উঠছে। কেন? রাত্রি জাগরণ, স্নায়ুর দুর্বলতা তাকে ইচ্ছার বিরুদ্ধে কাজ করায়। মাঝে মাঝে সে হয়ত স্ত্রীকে কিংবা ছেলেমেয়েদের দারুণ তিরস্কার করবে অকারণে কিন্তু তারপর আসবে অনুশোচনা, শিশুর মত সে কেঁদে উঠবে, কিন্তু সেইখানেই কি তার শেষ? একই ঘটনা বারে বারে ঘটে। জীবনের এই বোঝা তাকে বয়ে বেড়াতে হবে। এই ধরনের জীবনযাত্রায় সে অভিশপ্ত।

কিন্তু এই সরু বনপথের মধ্যে কেউ তাকে বিরক্ত করে না। এখানে কোনও কৰ্কশ আওয়াজ তার শিরায় শিরায় ছুরি চালিয়ে দেয় না।

এখানে গভীর শান্তি—এ-শান্তি মানুষকে আনন্দ দেয়। নীচে ঐ যে
 গ্রামল জমি—ওখানে দাঁড়িয়ে রয়েছে একটা উণ্টেপড়া গোলাঘর; এটা
 দেখলে তার স্মরণ হয় একটা বোড়াকে, সে যেন মাঠে ঘাস খেতে খেতে
 হঠাৎ মুখ তুলে তোমার দিকে চাইছে—একান্ত নিরালস্য পরিত্যক্ত
 মৃত্যুমুখী এই জন্তুটি আপনার অদৃষ্টকে ধীরভাবে, শান্তভাবে গ্রহণ করেছে।
 উঃ কতদূর এগিয়ে এসেছি। শীতল স্বেদে তার শরীর ভিজে যায়—ভয়
 হয় যদি আবার ফিরে যাবার ক্ষমতা না থাকে! না-না, নিজকে ঠিক
 ক’রে রাখ। একটু বিশ্রাম করে নাও। তারপর চিৎ হ’য়ে সে গুয়ে
 পড়ে ঘাস-জমির উপর—আকাশের দিকে তার চোখ।

উপত্যকার উপর দিয়ে বয়ে যাচ্ছে শান্ত ধীর বাতাস। মনে হয় যেন
 ‘জটুনহেম’ পাহাড় তার আকাশ-ছোঁয়া গৃহে বসে ধীরে ধীরে নিঃশ্বাস
 নিচ্ছে। পীয়ার আবার হৃৎপিণ্ডের অস্তিত্ব বুঝতে পারে—সে বাতাস
 টেনে নেয় মূল্যবান ওষুধের মত—“ওগো বাতাস, ওগো আণোক,
 নির্জনতা—তোমরা আমার সাহায্য কর—আবার আমার স্বাস্থ্য ফিরিয়ে
 দাও, আবার কাজের যোগ্য করে তোল—কারণ জগতে কাজই আমার
 একমাত্র ধর্ম—আমায় সেই কাজের যোগ্য হবার সুযোগ দাও।”—

অনেক ওপরে ওই যে দুই পাহাড়ের মাঝখানে নীল স্থির সমুদ্র
 রয়েছে—ওই গভীরতার অনন্ত শান্তি। সেখানে এমন একজন শক্তিদর
 আছেন—পৃথিবী ও মানুষ যার আয়ত্তাবধীনে। তুমি হয়ত অবিশ্বাস করছ
 কিন্তু একটু ভজনা করলে তুমি তাকে জানতে পারবে। ওগো, অসীম
 শূন্যের সীমাহীন দেবতা আমায় সাহায্য কর! কে তুমি? তুমি ত গুন্তে
 পাও। যদি এই মাটির বুকের ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র জীব, যাদের মানুষ বলে—
 তাদের প্রতি কোনও সহানুভূতি তোমার যদি থাকে—তবে তুমি আমার
 সাহায্য কর। যদি আমি কোনদিন এমন কোন কাজ করবার প্রার্থনা

করে থাকি, যা আমার অনন্তের তৃষ্ণা মিটিয়ে দিতে পারত—তার জন্ত আমি ক্ষমা চাইছি—অনুশোচনা করছি—আমার সকল অহঙ্কার তোমার চরণতলে লুটিয়ে পড়ুক। আমাকে তোমার দাস করে দাও—মাল্যে আর আমার ছেলে মেয়েরা আমার কাছ থেকে দূরে না সরে যান—শূন্যে কি পাও তুমি বধির দেবতা?

অন্ধভাগ্যের দ্বারা নিপীড়িত মানুষের দুঃখ দেখে আনন্দ কি তারা পায়? খামখেয়ালী আকস্মিকতার দাস কি আমার দ্বী, আমার সন্তান-সন্ততি? তবু তারা হাসে—তারা চীৎকার করে। উত্তর দাও 'গোগো আকাশের দেবতা—শূন্যে কি পাও তুমি—শতনামে মাহুদ তোমায় বন্দন। করে।

তার চারিপাশে ঘাসের উপর একটা ফড়িং শীঘ্র দিচ্ছে। হঠাৎ সে চমকে উঠে বলে 'নাচের উপত্যকার উপর দিয়ে একটা রেন যাচ্ছে বিকট আওয়াজ করে।

এমনি করে দিন কেটে যায়।

প্রতিদিন সকালে মাল্যে গোপনে একবার স্বামীর মুখের দিকে চেয়ে দেখে, রাতে তার ঘুম হয়েছিল কিনা। চোখ তাঁর পৌঁছাতে না জলন্ত অথবা শান্ত। নিশ্চয়ই এখানে তিনি সেরে উঠবেন। এখানকার বাতাসে তার শরীরের উপকার হবে। তার নিজেরও ওষুধে বিশ্বাস হারিয়ে গিয়েছিল—কিন্তু এখানকার এই বাতাস—এই পল্লীশ্রী—এই নির্জনতা আর শান্তি, বিশ্রাম,—শীঘ্রই সে দেখতে পাবে স্বাস্থ্যের নিখুঁত চিহ্ন তার স্বামীর দেহে।

কত রাত তারও বিনিদ্র কেটে যেত। ভোরেই তাকে উঠতে হয়—ছেলেমেয়েদের দেখতে হবে—ঘর সংসার গুছাতে হবে—আর তারও যথাসাধ্য সে করত কারণ দাসদাসী রাখার অর্থ কোথায়?

—“গোলাবাড়ীতে বসে তুমি কি করছিলে এতক্ষণ ? তোমায় অনেকক্ষণ ধরে এখানে বসে থাকতে দেখছি”—মাল্‌ প্রশ্ন করে ।

—“আমি একটু আনন্দ করতে চাই—মনটা প্রফুল্ল থাকে তাতে ।”

“তোমরা কি রাজনীতি নিয়ে তর্ক কর ?”—

—“না’ আমরা তাম খেলি । আমার দিকে অমন করে চাইছ যে” ?

—“কই এর আগে ত তাসের দিকে তোমার কোনও ঝাঁক ছিল না”—

—“না, কিন্তু আমার ত একটা কাজ চাই । আমার এই ছোটো পোড়া চোখের জন্মে বই পড়াও বন্ধ—আর সেই মাথার দন্দপানি । উপত্যকার উপরে নীচে যতগুলো গোলাবাড়ী আমার প্রায় মুখস্থ । সবশুদ্ধ এখানে পঞ্চাশটা আছে ! এখানে একুশটা ছোট বড় বাড়ী আছে । তুমিই বল কি করে আমার সময় কাটবে ।”

মাল্‌ একটা দীর্ঘশ্বাস চেপে গেল । “গুরুতর ব্যাপার । তুমি ত সঙ্কে্য অবধি অপেক্ষা করতে পার—তারপর ছেলেরা ঘুমিয়ে পড়লে আমি তোমার সঙ্গে তাম খেলব ।”

“সে কথা ভাল । কিন্তু সমস্ত দিনটা কি করব আমি ? তুমি কি বুঝতে পার যখন সমস্ত দিনটা সকাল থেকে সঙ্কে্য অবধি বিনা কাজে নষ্ট হয়, তখন কি মনে হয় ! তুমি কেমন করে জানবে বল । এই সমস্ত দীর্ঘ দিনভর একা একা কি করতে পারি আমি । নিজের বিষয় চিন্তা করতে করতে ক্লান্ত হয়ে পড়েছি আমি ।”

—“আচ্ছা, মাঝে মাঝে উনুনে দেবার কাঠ কাটতে ত পার”—

“রান্নার কাঠ”—আনন্দ তার মুখে ফুটে উঠল—“হ্যাঁ ওটাও একটা ভাল মতলব । সেই ভাল, কাঠই কাটা যাক—নূতন রকম তবু একটু—।”

ঠক—ঠক—ঠক

একটু নিঃশ্বাস নেবার জন্য যখন সে সোজা হ'লে দাঁড়াল তখন হঠাৎ কানে ভেসে এল রোষ্ঠাডের মোয়িং মেশিনের আওয়াজ—সে নীচে তার বাগানে কাজ করছে—পীয়ার দাঁতে দাঁত চেপে রইল—অসহ্য যন্ত্রণায় সে কাতর হয়ে পড়ল। সে নিজে একটা মোয়িং মেশিন চালাচ্ছে—তার নিজের আবিষ্কার, কিন্তু ধামগুলো শুধু লেগে থাকছে—আঃ কি করে এটুকু এড়ান যায়—কেমন করে। মাথায় তার কে যেন ঘুসি মারছে—সমস্ত শিরায় শিরায় রক্ত রুদ্ধতালে নাচ্ছে। কোনরকমে ঐ যন্ত্রদানবের চাঁৎকারটা থামিয়ে দেওয়া চাই। ঠক—ঠকাস্—ঠক—ঠক।

একজন মানুষ একটা কাস্তে নিয়ে কাজ করছে কিন্তু তার মাথায় রাজ্যের আজগুবি চিন্তা। এই সমস্ত চিন্তা এড়াবার মত মনের শক্তি তার হারিয়ে গেছে। চারিদিক থেকে পোকামাকড়ের মত তার মাথায় কে যেন স্ফুস্ফুড়ি দিচ্ছে—শিকারী পাখীর মত তাকে আক্রমণ করছে আর বলছে—আমরা আবার এনেছি। বারে বারে আমাদের এড়াবার চেষ্টা, এ তারই প্রতিশোধ। সে আবার ফিরে গেছে তার কারখানায়—‘কম্প্রেস্ট এয়ার টিউব’ দিয়ে বিরাট একটা বয়লার’এর পাতগুলোকে জোরা দিচ্ছে। বয়লারের বিকট শব্দ সমস্ত শহরের কানে তাল লাগিয়ে দিয়েছে। ষটাং—ষটাং—ষটাং—উঃ। সমস্ত শরীরে তার কালঘাম ছুটছে। কাস্তেটা ফেলে দিয়ে সে পালাতে পারলে বাঁচে। কোন জায়গায় তাকে ছুটে যেতে হবে। চারিদিক থেকে মুখ বের করে তারা যাদের সে ঘৃণা করে, বলছে—“হেঃ আমাদের বক্তব্য কি জান? আজকে তুমি ভিখারী—কাল তুমি থাকবে পাগলা গারদে।”

কিন্তু রাত্রির ঐ নিকষকালো অন্ধকারে সাহায্য হয়ত আসতে পারে। ভাল স্মৃতিগুলি মাঝে মনকে দোলা দেয়। সেই দিন—সেই রাত্রি—

একটি কুমারী—এমনি এক জায়গায় তার সঙ্গে দেখা। তাদের ঘরে একটা ভিনিসিয়ান ছবি আছে—একটি মেয়ে প্রাসাদের মর্ম্মর সোপানে একটি ছেলের হাত ধরে নামছে—ছেলেটির সোনালী চুল—মেয়েটির অঙ্গে কালো ভেলভেটের সাজ—যৌবনের আগুন তার চোখ দিয়ে ঠিকরে পড়ছে। বাগানের মধ্যে প্রিয়তমের নাফাৎ! যৌবনের প্রথম চুষন—প্রথম পুরুষ স্পর্শ—চাঁদিনা রাত—আর ম্যাগোলিন।

ক্লান্ত পরীরের মধ্যে দিয়ে একটা পুলকের শিহরণ হয়। আলোর দূতের মত উজ্জ্বল স্বপ্নে ভেসে আসে গত দিবসের স্মৃতি—সেই অতীন্দ্রিয় দেবতাদের পক্ষপৃষ্ঠের ধ্বনি তার কানে ভেসে আসছে—সে তাদের সাহায্য প্রার্থনা করে—তারা তাকে বিয়ে দাঁড়ায়। অন্ধকারের শয়তানের সঙ্গে তারা যুদ্ধ করে তার আত্মার মুক্তির জন্ম। জীবনে উজ্জ্বলতা, সৌন্দর্য্য সে অনেক দেখেছে—ওই আলোকের দূত যারা তারাই শক্তিশালী। কেন সে রাজভোগে থাকেনি—নারী, ফুল আর সুরা হ'ত তার সাথী।

একদির সকাল বেলা বিছানা থেকে উঠেই পীয়ার বললে, “দেখ মাল্, আমি এগান একটা কাজ সারাদিন করব যা রাত্রে আমাকে গভীর অবসাদের মধ্যে ঘুম পাড়িয়ে দেবে।”

স্ত্রী বললে—“তাই চেষ্টা করে দেখ।”

“আমি পথের পাথর কুড়িয়ে ছুড়ব। সারাদিন খালি পাথর ছুড়লে ঘুম হয় কি না হয় দেখব।”

তার পরের দিন থেকে সে শুধু পাথর ছুঁড়তে আরম্ভ করলে। দীর্ঘ দিনভ'র পাহাড়ের পাদদেশ থেকে সে পথের দিকে পাথর ছুঁড়তে লাগল।

সুতরাং, সোনালী শরতের দিনগুলি। গোলাবাড়ীর পর গোলাবাড়ী ধীরে ধীরে পর্বতশীর্ষের দিকে উঠে গিয়েছে। সবগুলিই হরিৎ

ধান্যের শোভায় শোভাষিত। একখানি ছোট্ট কুটীর একা আকাশের দিকে চেয়ে পাহাড়ের দক্ষিণে দাঁড়িয়ে রয়েছে—তার আশেপাশে হলুদ ধানের ক্ষেত। একটি ঈগল পাখী ধীরে ধীরে উড়ে যাচ্ছে পর্বতের এক শিখর থেকে আর এক শিখরের দিকে।

খালি মাথায়, শার্ট গারে পীয়ারের পাশ দিয়ে প্রতিবেশীরা বলাবলি করতে করতে যেত—“আর দেখছ ভদ্রলোকদের কতরকম বদখেয়াল।”

“এই তার হোক”—পীয়ারের মাথায় আস্তে আস্তে কে যেন বলে—“জানি এ দুর্বুদ্ধি, কিন্তু এই তোমার করতে হবে। অস্থিবিহীন তোমার পা’ দুটোকে ক্লান্ত করে তোল। কত স্তর দিয়ে তোমায় আসতে হয়েছে, এই স্তরে নেমে আসতে। আজকে রাতে ঘুম তোমার চাই-ই। আর মাত্র দশ মাস আছে—তারপরই আসবে শয়তান ঐ পথের মোড় বেঁকে। হতভাগিনী মাল্—দুঃখ সন্তর্পণে তার চুলে পাক ধরিয়ে দিতেছে আর ঐ হতভাগা ছেলেগুলো—পিতা তাদের শুধু তিরস্কার করে—প্রহার করে—হয়ত স্বপ্নেও তারা শাস্তি পায় না। নাও—কাজ করে যাও—একটার পর একটা পাথর লক্ষ্য কর।”

“একদিন যে তুমি আত্মাকে মাননি’ যখন আহারের জন্তু পরিশ্রম করতে—আজ সেই কত নিরে নেমে এসেছ। আজ তুমি শুধু বয়ে বেড়াচ্ছ বোকামির বোঝা। তোমাকে মনে হয় যেন ক্রীতদাস—এই তোমার পরিণতি।”

সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে কপালের স্বেদ সে মুছে নেয়—তারপর আবার পথের দিকে পাথর ছোড়া।

হৃদশার মধ্যে এই যে জীবন, এর পরিধি কত বড়! জ্বের কথা তোমার মনে আছে? জব? হয়ত স্মৃতিহীন জীয়োভা, একদিন তার বিরাট আমোদ-প্রমোদের মধ্যে, মাতালের কল্পনারঙীন মস্তিষ্কে শয়তানকে

ছেড়ে দিয়েছিল—এক সুখী পরিবারের সর্বনাশ করতে! জ্বর? তার সাতটি পুত্র, একটি কন্যা—গাভা ও বাছুর, সবই তাকে প্রত্যর্পণ করা হয়েছিল, কিন্তু সেই যে কোতুক-বিলাস তাকে নিয়ে করা হয়েছিল, তার সমাপ্তি হ'ল কই? রাজদরবারে ভাঁড়ের অভিনয় করতে হয়েছিল, কিন্তু তার বুকে ব্যথা—দারিদ্র্য, বেদনা, কিন্তু দেবতার কাছে এ নিছক আমোদ! জ্বর ফিরে পেল তার সব, কিন্তু তাতেই কি শেষ হ'ল সব? হাঃ হাঃ-হাঃ—

প্রোমেথিয়াস—ক্রুরবিলাসী ঐ দেবতাদের দরবারে একমাত্র বন্ধু তুমি মানুষের। আমাদের মুক্তি দেবার ক্ষমতা কি তোমার আছে? কবে তুমি আসবে—সেই বিরাট বিদ্রোহের আগুন জলে উঠবে?

ও সমস্ত চিন্তা বিসর্জন দাও—যা' করছ তাই কর—পাথরের পর পাথর ছোড়।

“বাবা খাবারের সময় হয়েছে—বাড়ী চল”—লুইস চেঁচিয়ে বলতে বলতে ঢালু পথ দিয়ে নেমে আসছে—কানের কাছে তার জামার হলদে ‘প্লেট’ ছটো উড়ছে। কিন্তু সন্তর্পণে ভয়ে ভয়ে সে কিছু দূরে দাঁড়িয়ে রইল—বাবার মেজাজ কেমন আছে না জেনে কাছে সে যাবে কি করে?

“বেশ চল—ছোট আমার মেয়ে। আজকে খাবার নূতন কিছু আছে নাকি?”

“সে এখন বলব না বাবা”—মেয়েটি গম্ভীর মুখে বললে। বাবার মনের অবস্থা দেখে সে উৎফুল্ল হয়ে উঠল। “আমাকে ধরতে পারবে বাবা—আমি তোমার চেয়েও জোরে ছুটতে পারি।”

“আমি যে বড় ক্লান্ত হয়ে পড়েছি, লুইস—ছুটতে আমি পারব না”—

“বাবা তুমি হাঁপিয়ে পড়েছ?” তারপর লুইস এগিয়ে এসে বাবার

হাতের মধ্যে হাত ঢুকিয়ে দিলে—“এ ভারী মজার, বাবার হাত ধরে পাহাড়ের পথে বেড়ান একটি পূর্ণাঙ্গী কুমারী কন্যার মত।”

তারপর এল শীত। একদিন প্রাতে দেখা গেল—গিরিশিখর সমস্ত খুসর শাদায় ভরে গেছে—আর বরফ গলে পড়ছে। মাল্ বাতায়নে এসে দাঁড়াল—ধোঁয়াটে দিনের স্বপ্নালোকে মুখ তার গভীর দেখাচ্ছে, সে তাকিয়ে আছে দূরের দিকে—সেখানে পাহাড়ের সীমানায় বন্ধ হয়ে গেছে উপত্যকার সীমা। তাদের ছয়ের ব্যবধান আরো সঙ্কীর্ণ হয়ে গিয়েছে। একজনের বুক থেকে ধীরে ধীরে বেরিয়ে আসে দীর্ঘনিঃশ্বাস আর একজনের মন শীতল স্যাংসেতে চানরের মত হীনবল হয়ে পড়ে।

আবার ফিরে যায় সে রান্নাঘরে—কাজ, কাজ—কাজ—কাজের মধ্যে সব সে ভুলে যায় আবার।

তারপর একদিন তার কাছে এক পত্র আসে—মায়ের মৃত্যু-সংবাদ তাতে লেখা।

প্রিয় রুস ব্রক—অস্তুত তোমার জীবন কাহিনী—

রূপকথার রাজ্যের বাসিন্দা তুমি ! খেদিভের পদমর্যাদা থেকে একদিন তোমার পতন হল—আজকের এই অভিশপ্ত জীবনে । কিন্তু হৃদানে কি করতে গেছ তুমি ? ওমড়ুরমানে নিজের সমস্ত বাজী রাখতে গিয়েছিলে, কেন বলত ? চিরদিনের সেই অনন্ত তৃষ্ণা—যার জন্য তুমি কতবার অভিযোগ করেছ, তারই আবেদনে নিশ্চয় ! কিন্তু এত রকমের মধ্যে সোপেন-হায়ারের অরণ্যে বাস তুমি পছন্দ করে নিয়েছ কেন, বলত ? শুধু দীর্ঘরাত্রি ধরে আত্মহত্যার চিন্তা করবার জন্তে নাকি ? তুমি ত লিখেছ যে, তোমার জীবনের কোন নির্দিষ্ট ধারা ছিল না । তোমার যৌবনকে তুমি ব্যর্থ করেছ । আজ তুমি গৃহহারাদের একজন—যাদের কোন নীতি নেই, কোন দেশ নেই, কোন জাতি নেই ! কিন্তু পারিপার্শ্বিক অবস্থা আরও শোচনীয় করে তুলে তোমার কি উপকার হবে বল ?

আমার এই পল্লী জীবনকে হিংসা করবার কিছুই নেই । আরও এক কথা—তুমি কিরে যেতে চাইছ তোমার কৈশোরের সেই গীর্জায়—যেখানে রয়েছে মোজেস আর ভগবান, অনন্ত স্তোত্রের রাগিনী বাজছে যেখানে । তবে বলছি শোন—প্রত্যাশা করায় কোন দোষ নেই, কিন্তু কখনও আশা কর না । বহু আমার সত্যিকথা বলছি শোন—তোমার এই প্রত্যাশার বস্তু আজকের অগতে খুঁজলে আর মিলবে না ।

আমি ধরে নিচ্ছি যে, শৈশবের ধর্ম তোমার আমার দু'জনের মনেই সমান প্রভাব বিস্তার করেছিল। আমরা ছিলাম দুর্দান্ত তরুণ দল—কিন্তু আমরাও গীর্জায় যেতাম—আমার মনে হয় আমাদের উদ্দেশ্য ছিল না বাণী শোনবার—আমরা যেতাম স্তোত্র গানের সুর মিলিয়ে অবমত্ত মস্তকে বসে থাকতে। যখন অর্গানের সুর তরঙ্গাকারে ভেসে বেড়াত বাতাসে—আমার নিজের মনে হ'ত যেন সেই সুর আমার অন্তরে অন্তরে হলে উঠছে—আর আমায় ভাসিয়ে নিয়ে যেত সেই অজানা রাজ্যে যেখানে মানুষের শেষ পরিণতি। তারপর আমরা যখন এই বিরাট বিশ্বে পা দিলাম তখনও আমার মনে এই স্তোত্র গানের সুর। জীয়োভাকে হয়ত আমরা অভিষেক দি' কিন্তু আমাদের মনের এক গোপন কোণে গুপ্ত ছিল এক সুর বা' এই বিশ্বের গতির ছন্দে কেঁপে উঠত—এক পরম আকাঙ্ক্ষা—জীবনের অ-মেটা কোন্ তৃষ্ণা। সারাদিন আমরা ইম্পাতের সঙ্গীতে যোগ দিতাম কিন্তু সন্ধ্যায় মির্জাম কোচে বসে অক্লভব করতাম এক অদৃশ্য শক্তি—অনন্তের প্রতি এক আকুল ভিষ্মসা—সীমাহীন সঙ্গীতের এক গোপন রাগিনী—অ-দেখা এক পথ—চিরদিনই যা অনাবিস্কৃত রয়ে যায়—তারই আহ্বান।

মনে কখনও বিশ্বাস কর'না. তারুণ্যের সেই গীর্জা আবার তুমি ফিরে পাবে। আমাদের চারিপাশে এখানে বৈজ্ঞানিক আলো, টেলিফোন, সেপারেটর, শ্রমিক সঙ্ঘ, রাজনৈতিক সমিতি কিংবা দেবালয় আজ জনশূন্য। আমি সেখানে গিয়েছিলাম—অর্গানের সুর ভেঙ্গে পড়েছে—ধর্মঘাটিক যেন কোন্‌ও রকমে স্তোত্র বলে দিয়ে যায়—আর সমবেত জনতা তাদের ঐক্যসুরে আর দেওয়ানে দেওয়ানে কাঁপন জাগাতে পারে না—এর আসল কারণ কি জান?—মানুষে!

আদিম মন আর বেঁচে নেই। আর হতভাগ্য ধর্মযাজক—তার কালো গৌফ ও নাকের উপর স্পীংযুক্ত চশমা নিয়ে বেদীর উপর দাঁড়িয়ে থাকেন। তিনি একজন রিজার্ভ আর্মির অফিসার—তাই তিনি নিজের পুঁথি থেকে কতকগুলো বড় বড় ব্যাখ্যা পড়ে শোনান। কিন্তু মন আর সব সময় বলে—“ওহে তোমরা দুটি অভাগা - যারা আজকে গীর্জায় এসেছ—এসব তোমরা কিছুই বিশ্বাস কর না—আর বেশী কথা কি আমারও এ সমস্ত বিশ্বাসের বাইরে।” এর চেয়ে বড় বেদনা আর কি হতে পারে—যে মানুষ তার নিজ হাতে গড়া এই দেবতার অবমাননা করতে শুরু করেছে। কিন্তু নিশ্চয়ই জীয়োভার চেয়ে মানুষ উচ্ছে প্রতিষ্ঠিত। দেবতার নিজের করা পাপ—তারই প্রায়শ্চিত্তের শাস্ত্রীয় বিধি আমাদের মনে বিদ্রোহ জাগায়। আমরা মুখ ঘুরিয়ে চলে যাই—উপেক্ষার হাসিমুখে, কখনও বিরক্তির সঙ্গে। দেবদূত হবার দেবী থাকতে পারে, কিন্তু মানুষ আর এ জীয়োভাকে প্রণাম করতে পারছে না।

ধর্মযাজকের একটা ক্ষমা আছে—কারণ তাকে একজন দেবতার পূজা করতে হবে, আর তার ঐ এক দেবতা।

আশ্চর্য্য কথা এই যে শিক্ষিত চাষীরাও আজ গীর্জাকে তফাতে সরিয়ে রেখেছে। তারা রবিবারে কি করে জান? আসলে রবিবারের মানে তাদের জানা নেই। তারা লম্বা টেবিলে বসে গল্প করে আর ভাবে দিনটে কেটে গেলে হয়। তারা একজন আর একজনকে ঘোড়াগুলোর কথা জিজ্ঞাসা করে—পশুগুলো উদর পূরে খেয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে নাক ডাকে—কাজ তাদের যে কিছু নেই।

এই নূতন জীবনধারা—ইম্পাতের আবিষ্কার ও বিজ্ঞানের যাত্রতে উন্মত্ত বিজয়ী বীরের মত এগিয়ে চলেছে—পৃথিবীর রূপ তারা

পরিবর্তন করে দিচ্ছে, আর জগতের চেতনায় বসে এনেছে দ্রুততা। কিন্তু ধর্মহীন, পবিত্রতাহীন চাষাকে তার ছইলব্যারোর উপর দিয়ে আকাশে ঘুরিয়ে আনার কি প্রয়োজন? ঐ মেঘের মধ্যে তার জন্ম কি বাণী লুকিয়ে থাকতে পারে—অন্তরাখ্যার বিরাট ভুবন যখন শূন্যতার ভরে যায়!

আজকের দিনে এই হচ্ছে জলন্ত প্রশ্ন। সেতুর নীচে, আমার মনে জাগছে এই প্রশ্ন আর বিরাট মরুভূমির মাঝে তুমিও বসে তাই ভাবছ। আমার মনে হয় আজকের দিনে সবচেয়ে প্রয়োজন একজনের—যে নূতন করে ধর্ম আবার গড়ে তুলবে—কোন ধর্মযাজক নয়—কোনও ষড়ৈর্ঘ্যাবান দেবতা।

শরীরের গতিক খুব ভাল নয়। কোন দিন তুংখে, বাথার যখন অন্তর তিক্ততার ভরে উঠবে তখন এই কথাগুলো ভেবে দেখ—

—তোমার পীয়ার ডেলস্ম্যান।

ক্রীষ্টমাস আগত প্রায়—দিনগুলি কেবল ধূসর গোধূলিতে ভরা—দেওয়ালের কাঠগুলো শব্দ করতে থাকে, যখন বরফ তাতে জমে উঠে। শীতে নীল হয়ে যায়—তবু ছেনেদের ছুটোছুটির বিরাম নেই। তারপর মার্চ মেরে জল দিয়ে পরিষ্কার করার পর—ছেনেরা মেরের ওপর যখন স্কেট করতে থাকে হয়ত তখন চিম্নিতে গনগনে আশ্বন। আর পীয়ার শীতে ঠক্ঠক্ করে কাঁপছে—দূর কুয়া থেকে সে জল আনতে যায়, বিপুল দাড়ি তার মুখে যেন মালা পরিয়ে দেয়।

এই শীত! বুড়ো রোষ্টার্ড'এর দুই মেয়ে—তারা ডাইরীতে whycheese তৈরী করছিল। দরজাটা খুলে গেল, শীতের হাওয়া ঘরের মধ্যে মাতামাতি শুরু করেছিল, আর পীয়ার তার চোখ দুটো পিট্ পিট্ করতে লাগল।—“আঃ বুড়ো মেয়ে দুটো কেঁরে?”

—“আমরা”—দুটো মেয়েই হেসে উঠল—একজনের চুল ঘন লাল, আর একজন বেশ সুন্দরী। তারা জানে যে, এই অদ্ভুত শহরে লোকটি তাদের দেখলেই রসিকতা করে।

—“হ্যাঁ, এখন কাজের কথা বলা যাক—কাল রাতে আমি স্বপন দেখলাম যে, তোমাদের বিয়ে হচ্ছে।”—আনন্দে মেয়ে দুটি ভেঙ্গে পড়ল।

“হ্যাঁ, মেরি তোমার বিয়ে হচ্ছে ওই বেলিফটার সঙ্গে।”

“আমার? ওই বুড়োটার সঙ্গে—”

“হ্যাঁ, কিন্তু দেখলাম সে আরও বড়ো হয়ে গেছে। বয়স তার নব্বুই পেরিয়ে গেছে!”

“আপনার যত সব বাজে কথা”—প্রথম মেয়েটি বললে—তারপর তার মাথার বরফ ঝাড়তে লাগল।

পীয়ার ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। মেয়ে দুটির বয়স আঠার উনিশ, কিন্তু মুখে তাদের এর মধ্যেই দৃতা ফুটে উঠেছে। যে অসাবধান মুহুর্তেই পীয়ার কোনও এক কথা নিয়ে কৌতুক করবার চেষ্টা করত—তারা প্রথমে শুধু কাষ্ঠ হাসি হাসত, কিন্তু পরমুহুর্তেই তাদের মুখ পাণ্ডুর হয়ে যেত—কোনও এক গোপন অন্সায় ইঙ্গিত করার ভয়ে।

কান অবধি ফারের টুপিটা টেনে দিয়ে পীয়ার ঘুরে বেড়াচ্ছে সেই বরফের ওপর দিয়ে। ওই উত্তর দিকের জটুনহেম পাহাড় থেকে আসে হিম-শীতল বাতাস। আর সে? এই ভাবে সারাজীবন ধরে বোঝা বয়ে সে কুজ ও পঙ্গু হয়ে যাবে? তার এই বেদনার শৃঙ্খল সে কি চূর্ণ করে দিতে পারবে না? ভাগ্যের এই জ্বরদস্তির হাত এড়ান কি অসম্ভব?

মালের রান্নাঘরের চৌকাঠে দাঁড়িয়ে বললে—“আচ্ছা ছেলেমেয়েদের বড়দিনে কিছু উপহার দিলে কি রকম হয় বলত।”

—“বেশ ত, ছেলেমেয়েদের প্রত্যেককে একটা করে রাজপ্রাসাদ আর একটা করে আরবী ঘোড়া। যখন অর্থ আসবে প্রচুর, তখন ভাববে টাকা জমাবার কথা। হ্যাঁ, তোমার কি হলে চলবে—দু’হাজার ক্রাউন মূল্যের ফারের জামা কয়েকটা, কি বল?”

“হাসির কথা নয়—দেবনা ছেলেদের স্বী,—কি একটা হ্যাণ্ড গ্লোজ পর্য্যন্ত নেই।”

“কী, হ্যাণ্ড শ্লেজ—তা ক’রে দেওয়া যেতে পারে”—পীয়ার শীষ দিতে লাগল—মুখে তার আনন্দের জ্যোতি—“কিন্তু এ্যাষ্টা তার জন্য কি হবে ? ওসব ত আর তার জন্য নয় ।”

“তার পুতুলের একটাও বিছানা নেই—”

পীয়ার আবার শীষ দিতে লাগল—“ও—একটা মতলব ক’রেছি স্বটে ? এখনও অতটা অকর্মণ্য হ’য়ে পড়িনি যে ঐগুলো করতে পারব না ।”

পীয়ার কাজ আরম্ভ ক’রে দিলে । একটা বাড়ীতে যন্ত্রপাতি সব ছিল—সেইখানেই সে কাজ করত । কিন্তু অবসাদে—পা তার ভারী হ’য়ে উঠত—তবু সে বিশ্রাম করত না । ভালভাবে মনে করলে হয় না কি ? আমি করব—নিশ্চয়ই । ছেলেদের জন্য এই তার অবসাদ মাথার সেই হাতুড়ী পেটানকে ভুলিয়ে দিত ।

ছেলেদের উপহারের জিনিষ—পিতা নিজ হাতে তাই গড়ছে—মনের মধ্যে সে আলো দেখতে পার—অস্তুর সুখায় ভ’রে ওঠে । কাজ ক’রে যাও তবে ।

শ্লেজ রানারের লোহার পাতগুলোর জন্য তাকে কামারের দোকানে ছুটতে হ’ল । লোকটা তখন ঘোড়ার পায়ের জন্য লোহার জুতা তৈরী করছিল । আবার, ইস্পাত আর গনগনে লাল লোহা । হাতুড়ীর বা লোহার ওপর মাথার শির তার ছিঁড়ে দেবার চেষ্টা ক’রেছিল, কিন্তু তবু তাকে যেতে হবে । কতদিনের বিস্মৃত ঐ ধ্বনি ! ঠিক যেন স্বপনের মত মনে হয় ।”

“জেন্নস—এই পাতগুলো জোড়া দেব ? সোইগা কোথায় ? দেখ এই রকম করে করতে হবে ।”

জেন্স ভাবে—“এরও বোধ হয় সেই নেশা আছে— নইলে এমন ধীর ও সহজভারে কাজ করে।”

ক্রীষ্টমাসের সন্ধ্যা ঘনিয়ে এল। ধূসর রঙের একটি ঘোড়া— একটা কাঠের বাক্স, তাদের দরজায় টেনে নিয়ে এল। পীয়ার বাক্স খুললে—তারপর সমস্ত জিনিষ ঘরের মধ্যে নিয়ে যাওয়া হ'ল— রীংবির আত্মীয়দের কাছ থেকে ক্রীষ্টমাসের উপহার।

যখন রান্নাঘরের টেবিলে সমস্ত উপহার জমা হ'ল, তাই দাঁখে পীয়ার ঠোঁট কামড়াতে লাগল। সে বেশী দিনের কথা নয়—সে আর মাল্‌ গ্রামের সমস্ত দরিদ্র লোকদের বাড়ীতে ক্রীষ্টমাসের উপহার পাঠাত। সমগ্র বৎসরের এ তাদের আনন্দ কোঁতুক ছিল। আর এখন—পরের দেওয়া উপহারে সন্তুষ্ট থাকতে হবে তাদের।

“মাল্‌—এ বছর দেবার মত ঘরে কি কিছুই নেই। এতে ক্রীষ্টমাসের অপমান হবে যদি শুধু আমরা গ্রহণ করেই ক্ষান্ত থাকি—কিছু দিতে না পারি।” মাল্‌ দীর্ঘনিশ্বাস ফেললে—“যে দিন গিয়েছে, সে হয়ত আর ফিরে আসবে না।”

“এ আমি কিছুতেই হ'তে দেব না।” ঘরের মধ্যে পায়চারী করতে করতে পীয়ার বললে—“গ্রামের শেষে থাকে ওই কামার—অনশনে তার দিন কেটে যায়। আমি ওর দরজায় ছোট্ট একটা পাসেল রেখে আসব—তার জন্য তোমার সায়া কিংবা আমার সার্ট দিতে হয়, তাতেও কাপ'ণ্য করব না। যদি এমন কাজ কিছু না করি তবে ক্রীষ্টমাসের আনন্দ আসবে কোথা থেকে।”

“আচ্ছা, তাই কর। আমি দেখি ছেলেদের এমন কিছু আছে কিনা, যা দিয়ে দেওয়া যেতে পারে?”

এর ফল হ'ল এই যে, মাল্‌ ছোট ছোট প্যাকেটে ধান,

রেজিন আর কেক ভর্তি করলে আর পীয়ার তাই দিয়ে আসতে ছুটল। মালের ধরণই এই রকম। তাকে একলা থাকতে দাও, সে একটা কিছু মতলব করবেই।

পীয়ার ছুটে চলল—বরফ তার পায়ের চাপে ফেটে যেতে লাগল। নক্ষত্রখচিত নীল আকাশ আর শাণিত ছুরীর মত ধারাল বাতাস। অঙ্কার গিরি পার্শ্বে গোলাবাড়ীর বাতায়নের আলো এসে পড়েছে। আর উচ্চে আকাশে একটা ছোট্ট বস্তু—হয়ত একটা কুটীর হয়ত বা একটা নক্ষত্র।

পীয়ার সমস্ত মনে উৎফুল্ল হ'য়ে উঠেছে, দেহ তার গরম হ'য়ে উঠেছে—সে বাড়ী ফিরে আসে। “তোমাদের বাবা আজ তোমাদের স্নান করিয়ে দেবেন।”—মালেক ছেলেমেয়েদের জানিয়ে দেয়—তারা চেঁচিয়ে আনন্দ প্রকাশ করলে।

একটা পিপের ধার কেটে—স্নানের টব তৈরী করা হয়েছে আর পীয়ার রান্নাঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে হাত গুটিয়ে দেখছে—ছেলেমেয়েদের নগ্নতনু, গরম জলের মধ্যে ঘুরছে।

তাদের মা খাবার ঘরে কি একটা কাজে ব্যস্ত ছিল। একটা দারুণ গোপনীয় ব্যাপার—গভীর রহস্যের মত মনে হয়। ছোট্ট এ্যাষ্টা যখন মার কাছে যাবার বায়না ধরলে, তখন তারা তাকে আটকে রাখলে, বললে—“না, যেতে দেব না।”

তারপর সন্ধ্যার অঙ্কার গাঢ় হ'য়ে উঠল—ক্রীষ্টমাস ট্রী জ্বালান হবার পর যখন বাতায়নে শাদা বরফ উজ্জ্বল হ'য়ে উঠেছে ঘরের আলোর—বসবার ঘরের মেঝেতে তখন প্রচণ্ড কোলাহল। লুইস তার স্বী চালাতে সিরেই প্রথমে আছাড় খেলে আর গোরেন্ড তার নুতন মেঝেতে চ'ড়ে চেঁচাতে চেঁচাতে চলেছে—“পথ ছাড়, পথ

ছাড়—গাড়ী যাচ্ছে”—আর এক কোণে ছোট্ট এ্যাষ্টা তার নব শস্যের
তার মেয়েকে গুইয়ে ঘুম পাড়াচ্ছে।

স্বামী-স্ত্রী পরস্পরের মুখের দিকে চাইলে—উজ্জ্বল হাসিতে ভরে
মাঝ তাদের মুখ। মালের ধীরে ধীরে বললে—“দেখছ ত।”

অত্যন্ত শান্ত পদে—গভীর অলস মনে—ধূসর শীত বিদায় নেয়
দিবসের দুঃখটা মাত্র শুধু গোধূলি—তারপর নিরবচ্ছিন্ন অন্ধকার
দীর্ঘ শীতের রজনী—উত্তুরে বাতাস ছ ছ গর্জন করে—আর পথে
বরফের স্তূপ জমে ওঠে—গভীর বরফের চাপ তৈরী হয় শ্লেজ-গাড়ীর
চলার সুবিধার জন্ম। দিন আসে, রাত্রি আসে—আবার চলে যায়—
অভিনবত্ব হীন, মহুরতায় ভরা। একই সেই ধূসর গোধূলি—মাছুষের
দেখা পাওয়া যায় না। ওই যে উপত্যকার শেষে একটা বিরাট
পাহাড়—ওর দিকে চেয়ে চেয়ে মনে মত্ততা আসে। কোন রকমে
ওর নুকের ভিতর দিয়ে একটা গর্ত ক’রে যদি বাহিরের পৃথিবীর
দিকে চাওয়া যায়—অথবা একবার গিরিশেখরে উঠে বাহিরের
জগতটাকে দেখা যায় কিংবা বাহিরের বাতাস গ্রহণ করা যায়।

অবশেষে একদিন ওই ধূসর যবনিকা ওঠে—আকাশের নীল রূপ
একটুখানি দেখা যায়—মনের ভার লঘু হ’য়ে আসে। গিরিশৃঙ্গের বরফে
একটা সোনালী আলো। এ কি সত্য? সূর্য্য! দিনের পর দিন
সোনালী রোদের মেখলা বৃদ্ধি পায়। অবশেষে একদিন কোর্ট-হাউসের
মাথায় রৌদ্রছায়া লুকাচুরি খেলে—মালের ঘরের মেঝেতে রোদ
এসে পড়ল।

রৌদ্র আর আলো ব’য়ে এনেছে নূতন জীবন—অনন্ত শান্তি।

“মা আবার সূর্য্য উঠেছে”—লুইস আনন্দে উৎকুল হ’য়ে ওঠে।

“হ্যাঁ”—কিন্তু লুইস এসেছে তার নিজের জন্ম আর ভারের জন্য

হ'একখানা কেক চাইতে—সে তাই নিয়ে চলে গেল পাহাড়ের ঢালুতে—স্বার্থের প্রাচুর্য্যে তার মুখ উদ্ভাসিত।

আবার যদি স্বামীর স্বাস্থ্য ফিরে আসে! হয়ত আজকে জীবনের একটা মোড় তার বেকেছে, কিন্তু কে বলতে পারে কালকে আবার দুঃখ আসবে না। আবার তিনি ওষুধ খেতে আরম্ভ করেছেন—আয়রন আর আর্সেনিক। উপরন্তু এখানকার জল-বাতাসের প্রাচুর্য্য তাকে কি এতটুকু সাহায্য করবে না? আর ত এক বছরের বেশী দিন বাকী নেই।

তারপর? আর একটা শীত? তারপর পরের দ্বায় জীবিকানির্ভাহ! উঃ—মালের হ'চোখ দিয়ে জল ছুটে আসে।

লুইস বড় হ'য়েছে, তাকে স্কুলে দিতে হবে।

ব্রুসেথ্ থেকে আন্ট ম্যারিট চিঠি দিয়েছে—তোমার তিনটি ছেলেমেয়েকে এখানে পাঠিয়ে দাও—আমি মানুষ করব।” তার উত্তর গেছে—“ধন্যবাদ, তা হয় না।” মালের ত জানে এ চাওয়ার অর্থ কি? আন্ট ম্যারিট তাদের জন্মের মত কেড়ে নিতে চায়।

ছেলেমেয়েদের জন্মের মত হারান—পরের হাতে তাদের সমর্পণ করা—হায় ভগবান—সে দুর্ভাগ্যের বোঝাও কি তাদের স্বন্ধে চাপান হবে।

কিন্তু শিক্ষা তাদের ত চাই। যখন তারা বড় হ'য়ে উঠবে—জীবিকানির্ভাহের মত কিছু সাধারণ জ্ঞান তাদের থাকা প্রয়োজন। আর পিতামাতা যদি তাদের শিক্ষা দিতে না পারে তবে সুযোগ থেকে বঞ্চিত করবার কি অধিকার তার আছে!

মালের তার সূঁচ নিয়েই ব্যস্ত থাকে—হুঠাৎ সে মুখ তুলে চায়!—স্বার্থের আলো তার মুখে আশীর্ষাদের মত ঝ'রে পড়ে।

রবিকরের রক্তিম আভা বরফের মধ্যে 'পার্পল' রূপ দান করেছে। এই সূর্যালোকিত দিবসে জীবনের তার হালুকা মনে হয়। হৃৎপিণ্ডের কাছে এত দিনের জমান ব্যথা যেন নূতন আলোর উত্তাপে গলে পড়েছে—কি শান্তি !

ভায়োলিন লুইসের হাতে চমৎকার বাজছে। তার মায়ের সেই দূর স্বপ্ন একদিন হয়ত সফল হবে কণ্ঠার জীবনে।

বাইরে সিঁড়িতে দ্রুত পদধ্বনি। মালের চমকে ওঠে। হয়ত স্বামী তার দুঃখে-বিরক্তিতে কিংবা আনন্দিত মনে আসছে? কি, কে জানে? দরজা খুলে গেল।

“মালের আমি পেয়েছি। এতদিনে একটা চমৎকার সুযোগ।” মালের চেয়ার থেকে অকোথিত অবস্থায় আবার পড়ে গেল—মাথা তার ঘুরেছে। “মালের এবার আমি ঠিক পেয়েছি—এত সহজ আর মাথায় এতদিন কিছুতেই আসেনি। আশ্চর্য্য।” জামার পকেটের মধ্যে হাত দিয়ে সমস্ত ঘরের মধ্যে পায়চারী করছে পীয়ার।

“সে কি? পীয়ার।”

“দেখ মালের আমি ওইখানে দাঁড়িয়ে কাঠ কাটছিলাম। হঠাৎ আমার কানে ভেসে এল এক লক্ষ মোয়িং মেশিন-এর কর্কশ আওয়াজ আর ঘাসগুলো প্রত্যেকবারই লেগে থাকছে। আমার গা’দিয়ে ঘাম ছুটতে লাগল—মনে হ’ল যেন জীবন্ত নরক আমার মাথায় তাণ্ডব লীলা শুরু করবে—তারপর হঠাৎ যেন মুক্তি, নূতন জীবনের শুরু।”

“তুমি কি বলছ পীয়ার, একটু স্পষ্ট করে বল—আমি যে কিছুই বুঝতে পারছি না।”

“কেন এত খুব সহজ—Sheerগুলোর কাছে একটা ছোট ইম্পাতের পাত—নিজেই ঘাসগুলো সরিয়ে দেবে—এ ত একটা ছোট ছেলেও

বলতে পারে। মাল্‌, এতদিনে হয়ত ভগবান মুখ তুলে চাইলেন।”

মাল্‌র কাছে এ এক স্বপ্ন কাহিনী। কিন্তু এ যদি সত্য হয়।

“মাল্‌—আমি আমার মেশিনটাকে এখানে নিয়ে আসব। আর একটা ত্রাশ তৈরী করতে কিছুই কষ্ট নেই—একদিনের কাজ।”

“তুমি কি আবার কাজ করবে নাকি? পীয়ার তোমার পায়ে পড়ছি ওসব আর নয়—তোমার শরীর একটু ভালর দিকে যাচ্ছিল—আবার কেন তা নষ্ট করবে।”

“মাল্‌, যত দিন না ওই যন্ত্রদানবটা আমাকে মুক্তি দেবে ততদিন আমার নিষ্কৃতি নেই—সুস্থ আমি হতে পারব না। হয় মৃত্যু নয় জয়। এ থেকে আমার ছাড়া পেতে হবে—তবে রাতে আমার ঘুম আসবে। ভগবানের দয়ায় এদিনের যদি কখনও অবসান হয়, তবে কি আমি ভাল হয়ে উঠতে পারব না, মাল্‌?”

মাল্‌ পীয়ারের বাহু বেষ্ঠনের মধ্যে বাধা পড়ল কিন্তু পীয়ার চলে গেলে মাল্‌ তবু বসে রইল অন্তমান সূর্যের দিকে চেয়ে—অবশেষে গোধূলির আবছায় চোখের আলো তার নিস্তেজ হয়ে এল—তারপর কান্না!

এর এক সপ্তাহ পরে একদিন একটা বিরাট বাক্স টেনে নিয়ে এল একটা ঘোড়া—রোষ্টাডের বাড়ীর দরজায়। সূর্য তখন তার জ্যোতিসমুদ্রে পৃথিবীকে স্নান করিয়ে দিচ্ছেন। তার পর দিন রাত্রি ধরে কামারের দোকানে কাজ।

এখন আর কয়েকটা বিনিদ্র রজনীকে কি করতে পারে? এখন আর ভাবনা, চিন্তা উত্তেজনা নয়—এখন দীর্ঘ দিনমান কেটে যায় স্বপ্নের ঘোরে। ছুঁজনেই তারা স্বপ্ন দেখে। আবার লোরেঞ্জের বাড়ীটা

কেনাঃ হয়েছে—প্রকাণ্ড বড় বড় হল ঘরে তারা ঘুরে বেড়াচ্ছে—
দিন কেটে যায় আনন্দে! আবার যৌবন ফিরে এসেছে—তারা স্বী
করেছে—এক সঙ্গে আহারে পরস্পরের স্বাস্থ্য পান করছে—চোখে
তাদের আবার ফুটেছে তারুণ্য, ভালবাসা—কতদিনের এ ঘটনা—
আবার কতবার হবে? “শুভ রাত্রি মালের্” “শুভ রাত্রি পীয়ার—
ভাল করে ঘুমাও।” দিনের পর দিন পীয়ার কাজ করে চলে
অবিশ্রান্ত ভাবে।

কয়েক বছর পূর্বে এটুকু কাজ সে দু’দিনেই সেরে ফেলতে
পারত! কিন্তু আজ আধ ঘণ্টার কাজ তাকে অবসন্ন করে তোলে।

অলস চিন্তাযুক্ত তোমার মনকে আনন্দ দিতে পারে একমাত্র
কাজ। আগে যা মনে হ’ত ঠিক আছে—এখন তাতে গলদ বেরিয়ে
পড়ে। নিজের তা সারতে হয়—কোন সহকারী নেই—নিজের
কাজের যন্ত্র নিজেই তৈরী করে নিতে হয়। কারখানার দুস্রাপা
যন্ত্র আজ আর সাহায্য করে না। তাতে কি যায় আসে।

অলস বাজে চিন্তা আর নয়—মনকে সে যুক্তি-তর্ক দিয়ে বেঁধে
ফেলে। মনের প্রত্যেক বাতায়ন রুদ্ধ করে দাও—মন পড়ে থাক
শুধু যন্ত্রটার মধ্যে। কিছুক্ষণ কাজের পর সে শয্যায় শরীর এলিয়ে
দেয়—একটু বিশ্রাম! মনের চারিপাশে শুধু অন্ধকার—পরদিনের
শক্তি সংরক্ষণ করতে হ’বে!

মালের্ মনে কি সন্দেহ জাগে? তার কাজের বিষয় কিন্তু সে
তাকে বেশী জানায় নি। মন তার উত্তেজিত হয়ে থাকে। এখন
ছেলেদের তিরস্কার করলে, সে আর কোন কথা কয় না—কারণ
ভগবান মুখ তুলে চাইলে, এ দুঃখের রজনী পোহাতে পারে।

কোন কোন দিন টাদনী রাতে ছেলেরা ঘুমিয়ে পড়লে তারা

হুঁজনে পথে পথে ঘুরে বেড়ায়। পরস্পরের হাতে হাত জড়িয়ে তারা গান গায়—কথা বলে উচ্চহাস্তে—আনন্দে তাদের ব্যথার অবসান হয়। প্রতিবেশীরা শুয়ে শুয়ে ভাবে—এ নিশ্চয় কোন মাতালের কাণ্ড কিংবা ওই কোর্ট হাউসের স্বামী-স্ত্রী ওরা।

বসন্ত পায়ে পায়ে এগিয়ে আসে—দিনের লঘুতা বাড়ে। কিন্তু শ্রামার এগরিকালচারাল একজিবিশনে যেখানে এই যন্ত্রটি পরীক্ষার জন্ম দেওয়া হয়েছিল—সেখানে একজন আমেরিকান এর চেয়ে একটু ভাল যন্ত্র দিলে। সকলেই ভাবলে এ একটা ব্যবসায়ী চাল। কারও যদিও মতলবটা চুরি করা নয় কিন্তু যন্ত্রপাতির সমস্তই তার থেকে নেওয়া। কিন্তু আমেরিকান মেশিনে এমন একটু ভাল কিছু আছে যা নিয়ে কোর্টে গিয়ে জয়ের আশা অনিশ্চিত, তাছাড়া একজন গরীব গ্রামবাসী একটা ফার্মের বিরুদ্ধে কি করে দাঁড়াবে—তার সে সামর্থ্য কই?

সমগ্র পৃথিবীর মধ্যে এই যে বিরাট প্রতিযোগিতা তাতে পীয়ারের জয় নিশ্চিত জয়। কিন্তু তার বিজয়-রথে আর একজন উঠে পড়ল—আর শেষ পর্যন্ত তার থেকে একটু উর্দ্ধে আসন নিলে—ভাগ্যলক্ষ্মী তার কণ্ঠে জয়মাল্য ছলিয়ে দিলেন।

এ জয় উত্তম, কিন্তু পৃথিবী একবার পরীক্ষা করলে না—এ জয়ে সততার বিচার কতটা হল।

ভাল মেশিন যখন রয়েছে তখন জয়েন্টস্টক কোম্পানী খোলার প্রয়োজন কি আছে! ইম্পাতের লৌহ-মুষ্টিতে পীয়ার বাধা পড়েছিল, কিন্তু জয় হল অগ্নি জনের।

ইংলিস টুইডের এজেন্ট হের ইউথো জুনিয়র জুলাই মাসের এক আতপ্ত দিনে ট্রেন থেকে নামল—তারপর প্লাটফর্মে নেমে চারিদিক একবার দেখে নিলে। চমৎকার দৃশ্য—এই সুন্দর উপত্যকায় তার ভগ্নী বাস করছে অনেকদিন ধরে—এক বৎসরেরও বেশী। নিশ্চল বাতাস, কিন্তু এতে কি তার বোনের স্বামীর কিছু উপকার হচ্ছে? দেখা যাক’—বলে নিখুঁত সজ্জায় এই যুবকটি রোষ্টাডের বাড়ীর দিকে এগিয়ে চলল মাঝে মাঝে পথ জেনে নিয়ে—সে তাদের আশ্চর্য্য করে দিতে চায়। রীংবির বাড়ীতে একটা সাংসারিক বিতর্কে এই হতভাগা স্বামী-স্ত্রীর বিষয় আলোচনা হয়েছিল—তাত কোনও একটা বন্দোবস্ত করার কথা ঠিক হয়েছে।

এই ভদ্রলোক গোলাবাড়ীর মোড় বেঁকে হঠাৎ একটা লোককে দেখতে পেল—লোকটার গায়ে একটা সার্ট—সে একটা বাক্সে অনেক পাথর জমা করে একটা একটা করে ছুড়ছে। কে? তার কি ভুল হচ্ছে? না এই ত সেই পীয়ার হোলম—পাথর ভর্তি করছে আর ছুড়ে দিচ্ছে—এর ভাব দেখে মনে হয় যেন প্রতিপদক্ষেপের জন্য সে পুরস্কৃত হবে।

এই যুবকটি সেই ধরণের নয় যে সে এই অবস্থা দেখে দুঃখ প্রকাশ করবে কিংবা সমবেদনা জানাবে—“হ্যালো—খুব যে জোর খাটছ হে—চাষবাস করতে আরম্ভ করেছ নাকি?”

পীয়ার সোজা হয়ে দাঁড়াল—তারপর ট্রাউজারে হাতের ঘাম মুছে নিলে।

“হায় ভগবান ! এর একি স্বাস্থ্য !” নিজে নিজে ভাবলে—তারপর পীয়ারকে লক্ষ্য করে বলল—“তোমাকে ত বেশ উজ্জ্বল দেখাচ্ছে—আজ-কাল চেনাই যায় না।”

মালে রান্নাঘরের জানালা থেকে এদের দেখতে পেল। “আমারও বোধ হয়”—বলতে বলতে সে ছুটে বেরিয়ে এল—কতদিন আত্মীয়-স্বজনের মুখ সে দেখেনি—সাধারণ ভদ্রতা করা পর্যন্ত সে ভুলে গেছে—নিজের পদ মর্যাদা তার দরকার সেই—ভায়ের গলা সে জড়িয়ে ধরল।

ইউথো এদের দুঃখে সহানুভূতি প্রদর্শন করতে আসেনি। তার বাক্সে এক বোতল ভাল মদ ছিল—তাই সে খাবার সময় বিতরণ করলে—আর সিনেমা থিয়েটারের গল্প ও তাদের অঙ্গভঙ্গী নকল করতে লাগল—আর এই দু’টি দারিদ্র্য-যন্ত্রণা-ক্লিষ্ট মুখে হাসির রেখা ফুটে উঠল। এখন এদের আসল দরকার হাসি আর আনন্দের—ইউথো এটা খুব ভালরকমই জানত।

কিন্তু যে সমস্ত পরিবার তাদের ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ করবার ভার নিয়েছে—তারা কোন পথে তাদের চালাবে এ বিষয়ে স্বামী স্ত্রী কি রকম উৎকণ্ঠিত হয়ে আছে, এ কথা সে জানে। এখনকার দিন তাদের দারিদ্র্য ও বেদনার মধ্য দিয়ে কেটে যায় কিন্তু যে সাহায্য তারা পায় তা যেন বন্ধ না হয়—এই তারা আশা করে। তাদের সাহায্যের পথ রুদ্ধ হয়ে গেলে তারা না পারবে এখানে থাকতে, না তাদের সামর্থ্য থাকবে অল্প কোথায় যাবার। তারা কি করবে তখন? সুতরাং তারা যে উৎকণ্ঠায় দিন কাটাবে এতে আর আশ্চর্য্য হবার কি আছে?

সাপারের পর ইউথো পীয়ারের সঙ্গে একটু বেড়াতে গেল আর মালের বাড়ীতে বসে রইল উৎকণ্ঠিত মনে। সে বুঝতে পেরেছে যে, এই এতক্ষণ তাদের ভাগ্যের মীমাংসা হচ্ছে।

অবশেষে তারা ফিরে এল এবং আশ্চর্য্য হাসিমুখে ।

তার ভাই তাকে ‘শুভরাত্রি’ জানিয়ে কপালে চুমু খেলে—বাহুতে দুটো টোকা দিয়ে । তারপর ঘুমাত গেল—মালেক ভাইকে তার শয়নঘর দেখিয়ে দিলে এল—তার ইচ্ছে ছিল, সেখানে বসে ভায়ের সঙ্গে কিছুক্ষণ গল্প করে । কিন্তু সে জানে পায়ার তার জন্ত অপেক্ষা করছে একা এ বিষয়ে আলোচনা করবার জন্তে—“গুড নাইট, কারষ্টেন”—বলে সে নেমে এল ।

তারপর রাত্রি গভীর হলে তারা দু’জনে জানালার ধারে টেবিলে বসল পাশাপাশি ।

“কি বললে ?”—মালেক জিজ্ঞেস করে ।

“কথাটা কি জান মালেক—যদি সত্যই তুমি দিন কাটাতে চাও তবে জীবনটাকে আমাদের মুখোমুখী দেখে নিতে হবে ।”

“পীয়ার, আমরা কি এখানে থাকতে পারব না ?”

“আমার মত অকর্মণ্যের সঙ্গে কি তুমি দিন কাটাতে পারবে ? আগে এ কথার জবাব দাও ।”

“বেশ, তার আগে আমার কথার জবাব দাও—এখানে কি থাকা চলবে ?”

“চলবে । কিন্তু হয়ত বৎসরের পর বৎসর কেটে যাবে আমার সেরে উঠতে—এই আশা-আকাঙ্ক্ষার মধ্যে আমাদের বেঁচে থাকতে হবে । আর পরের দয়ার ওপর বেঁচে থাকা—সে আমি পারব না, সে আমার অসম্ভব ।”

“তা হলে আমাদের কি করতে হবে পীয়ার ? আমার পক্ষে টাকা উপায়ের ত কোনও পথ দেখছি না ।”

“চেষ্টা আমাকেই করতে হবে”—পীয়ার জানালার বাইরে আকাশের দিকে চেয়ে রইল ।

“তুমি,—না, না, পীয়ার—তা হ’তে পারে না—ড্রাফটস্‌ম্যানের কাজ পর্যাপ্ত তোমার আমি করতে দেব না—তোমার চোখের তাতে অনিষ্ট হ’বে জান ।”

“কেন, আমি কামারের কাজ করতে পারি ।”—

কিছুক্ষণ চুপচাপ । মাল্‌ স্বামীর দিকে চেয়ে রইল, সে নিজেকে বিশ্বাস করতে পারছে না । সত্যিই কি স্বামী তার কামার হবে । দীর্ঘ শ্বাস ফেললে সে । কিন্তু স্বামীকে দুর্বল করে তুললে চলবে না । জোর করে সে কঁথাটা প্রকাশ করলে—“ই্যা, তাতে তোমার সময় কাটবে ভাল । আর দীর্ঘ দিনের পরিশ্রম রাত্রে তোমার ঘুমের সাহায্য করবে ।” ঠোঁট ছ’টো চেপে সে কামার বেগ রুদ্ধ করতে চেষ্টা করে ।

“আর আমি যদি তাই করি, মাল্—তবে এখানে ত আমাদের থাকা চলবে না—কারণ এত বড় বাড়ীর আমাদের কোনও দরকার নেই । আর তা’ছাড়া এখানে ত’ তোমাকে কেউ সাহায্য করবার নেই ?”—

“কিন্তু এ গ্রামে কি আর ছোট বাড়ী আছে ?”

“আছে । ওপাড়ার একটা ছোট বাড়ী বিক্রী আছে—সামনে একটু জমি সমেত । যদি আমরা একটা গুয়োর, একটা গাভী ও কয়েকটা মুরগী রাখি—আর জমিতে যদি কিছু ধান হয়—তাহলে, আমাদের একেবারে সেবাসঙ্গনে গিয়ে উঠতে হবে না । ওসব কাজ আমি কিছু কিছু করতে পারব—আর মুরগীর চাষে লাভ আছে । আবার এতে আমার স্বাস্থ্যের দিক দিয়ে সেটা অনুকূল । তোমার কি মত ?”

মাল্‌ কোন কথা বললে না । স্বামীর দিক থেকে সে চোখ ফিরিয়ে দিল । বাহিরে জ্যোৎস্নাপ্লাবিত ধরণী ।

“আর একটা কথা, মাল্—তুমি কি আমার সঙ্গে এই দারিদ্র্যের মধ্যে যেতে পারবে ? আমার কোন অসুবিধা হবে না—কারণ

ছেলেবেলায় জীবন আমার এমনি ঢংখেই কেটেছে। কিন্তু তোমার? আমি তোমাকে সত্যি সত্যি ভেবে দেখতে বলছি।” স্বর তার কৈঁপে যাচ্ছে। দৃষ্টি তার অক্ষর অন্তরালে ঝাপসা হয়ে ওঠে—মুখ সে নামিয়ে নেয়।

তারপর আবার নিঃস্বকতা। “আর টাকা কোথায় যে বাড়ীটা কিনবে?”—মালেক জিজ্ঞাসা করলে।

—“সে তোমার ভাই আমায় ধার দেবে বলেছে। কিন্তু আমি আবার তোমায় ভেবে দেখতে বলছি, মালেক—যদি তুমি ভায়ের সঙ্গে ক্রসেথে গিয়ে বাস কর আমি দোষ দেব না। আর খুড়িয়া ভ’ তোমাকে আর ছেলে-মেয়েদের পেলে খুব খুশীই হবেন।”

কিছুক্ষণ কেউ কোন কথা বললে না। এ নিঃস্বকতা ভঙ্গ করলে মালেক—“যদি সেই কুঁড়েতে ছোট ঘ’খানা ঘর থাকে তাহলেই আমাদের পক্ষে যথেষ্ট। আর তাহাড়া ঘর-সংসার গোছানও খুব সহজ হ’বে, কি বল।”

পীয়ার কোন কথা বলতে পারলে না। গলার স্বর তার ভেঙ্গে গেছে। সে এতক্ষণে বুঝতে পেরেছে দারিদ্র্য মালেককে তার কাছ ছাড়া করতে পারবে না। এ যেন তার এক পরম আবিষ্কার—কিছুক্ষণ সে আনমনে চিন্তা করতে লাগল—এ বিষয় নিয়ে।

মালেক স্বামীর দিকে মুখ করে বসে ছিল কিন্তু দৃষ্টি তার উদাস। তার চমৎকার ভুরু আঙ্গু তেমনি মসীকৃষ্ণ কিন্তু মুখে তার যৌবনের জ্যোতি নেই—চুলে কে যেন ধূসর রং বুলিয়ে দিচ্ছে ধীরে ধীরে। পীয়ার এবার বললে—“কিন্তু ছেলেদের বিষয়।”

মালেক চমকে উঠল। এতদিনের ভয় আজ বুঝি রূপ নিয়েছে—
—“ছেলেদের—ছেলেদের কি পীয়ার?”

“আন্ট ম্যারিট লিখেছে—তোমার ভায়ের সঙ্গে যদি লুসিকে তার কাছে পাঠাও।”

“না, না, পীয়ার—তুমি অমন কথা বল না। আমি জানি, দিয়েছ। তুমি তাকে যেতে দিও না পীয়ার—তাকে দিয়ে দিও না। এর মানে কি জান, সে চিরদিনের জন্ত পর হয়ে যাবে।”

“তা জানি—কিন্তু এতে ভাববার কথা আছে। লুইসের নিজের এ অধিকার—তুমি কি করে বলবে, না।”

মাল্‌ চমকে উঠল, সে দাঁড়িয়ে হাত কচলাতে লাগল—“না, না, পীয়ার—তুমি অমন কথা বল না। আমি জানি, তুমিও ও চাও। এখনও আমাদের সে অবস্থা হয়নি যে, নিজদের—না, না পীয়ার দিয়ে দিও না, বিনিয়ে দেওয়ার অবস্থা ত আমাদের আজো আসেনি”—কান্নায় সে ভেঙ্গে পড়ল—“পীয়ার আমি তা কিছুতেই 'তে দেব না, দেব না”—

“তোমার যা ইচ্ছে মাল্‌।”—নিজেকে যথাসম্ভব শাস্ত ও সংযত করে পীয়ার বললে—“এবিষয়ে আমরা কাল অবধি ভাবতে পারব। প্রত্যেক জিনিষের হুঁটো বিভিন্ন দিক আছে। আমাদের হয়ত একদিক—কিন্তু ঐ নিরীহ লুইসের জীবন—সে কথাটা একবার ভাব দেখি মাল্‌।

পরদিন সকালে, ছেলদের আগবার সময় স্বামী-স্ত্রী নাসারীতে গেল, সেখানে লুইসের শয্যার পাশে তারা দাঁড়াল। এখানে আসার পর মেয়েটি অনেক বেড়ে উঠেছে। বিছানায় নাক গুঁজে সে ঘুমোচ্ছে—তার কালো চুলে সুন্দর মুখখানা ঢাকা পড়েছে। আজো অবধি সে এখানে পিতামাতার কোলের কাছে—জঁগতের সবচেয়ে নিরাপদ জায়গায়।

“লুইস ওঠ।”—মালোঁ তাকে নাড়িয়ে দিলে।

লুইস উঠে বসল—তখন ঘুমে তার হুঁচোখ জড়িয়ে রয়েছে—সে আশ্চর্য্য হয়ে বাপ-মার মুখের দিকে চাইলে। কি ব্যাপার ?

“তাড়াতাড়ি জামা কাপড় পরে নাও। কারাষ্টেন কাকার সঙ্গে ব্রুসেথে খুড়ীমার কাছে যাবে না ? কি ?”—

মেয়েটি এত তাড়াতাড়ি করতে লাগল যেন একুনি বেরিয়ে পড়লেই হয়। কিন্তু মা বাবার মুখের দিকে চেয়ে আনন্দের অতিশয়তা তার আর রইল না।.. আর ছোট ভাইবোন দু’টি পরম্পরের মুখ চাওয়াচাষি করতে লাগল। তাদের দিদি বেড়াতে যাচ্ছে অনেক দূরে। লোরেঞ্জ দিদিকে তার ঘোড়াটা দিয়ে দিলে আর ছোট্ট এষ্টা তার ডল পুতুলটা। আর মা এমনভাবে ঘুরে বেড়াতে লাগল যেন মেয়ে ভাবে, সে বেড়াতে যাচ্ছে আবার ফিরে আসবে কিছুদিনের মধ্যেই।

ছপুরের আগেই একটা ছোট ট্রাঙ্কে লুইসের যাবতীয় জিনিষপত্র ভর্তি করা হল—লুইস সবচেয়ে ভাল জামা পরে বাড়ী বাড়ী বিদায় নিতে লাগল—আদর কুড়িয়ে কুড়িয়ে। কামার বাড়ীর পেছনে যে ঘোড়াটা থাকে তার কাছে সে সবশেষে বিদায় নিতে গেল। মুজিম তখন খাচ্ছিল, একবার মুখ তুলে চাইলে, লুইস তাকে হাতে করে ছুটি ঘাস দিলে—তারপর তার গলা জড়িয়ে ধরলে।

“আমি সন্ধ্যাইকে চিঠি লিখব”—সে জনান্তিকে বলে চললে।

তারপর ট্রেন প্ল্যাটফরম ছেড়ে দিল ধীরে ধীরে। লুইস আর ইউথো তাদের ক্রমাল ওড়াতে লাগল। বিদায়—বিদায়।

আর পীয়ার ও মালোঁ দাঁড়িয়ে রইল ছোট ছোট্ট ছেলেমেয়ের হাত ধরে। তখনও দূরে একখানি শাদা ধব-ধবে হাতের ক্রমাল

নাড়া দেখা যাচ্ছিল—তারপর ট্রেনটা ঘুরে গেল—শুধু পেছনে পড়ে
রইল ধূলি পূমাচ্ছন্ন ষ্টেশনে রেলের বিরাট শব্দের প্রতিধ্বনি আর
সবচেয়ে বড় দু'টি ব্যথাতুর প্রাণ।

পেছনের এই চারিটি পথ-চাপুয়া প্রাণ স্থিরভাবে কিছুক্ষণ
দাঁড়িয়ে রইল—তারপর অজ্ঞাতসারে তারা পরস্পরের কাছে সরে
এল।

৬

বড় রাস্তা থেকে একটু দূরে একখানা একতলা বাড়ী—সামনে
তিনটে জানালা—বাড়ীটার একদিকে একখানা গোয়াল ঘর আর
একদিকে একটা কামারশালা। যখন কামারশালা থেকে ধোঁয়া ওঠে
প্রতিবেশীরা বলে,—“আজকে বোধ হয় ইঞ্জিনীয়ার একটু ভাল আছে
—আজকে আবার কাজে লেগেছে। আর আমাদের যদি কিছু করিয়ে
নেবার থাকে ত ওকেই দিও—লিয়ার জেনো'র চেয়েও সস্তায় ও
করে দেয়।”

মালে আর পীয়ার বছর দুই এখানে বাস করছে। তারা
একসঙ্গে জীবন কাটাচ্ছে কিন্তু একটু পার্থক্য। তাদের জীবনে এসে
গেছে। মালে এখনও স্বামীর মুখের দিকে চেয়ে থাকে—হয়ত

স্বামী তার সেরে উঠবে। কিন্তু পীয়ার নিজে আর কোন আস্থা রাখে না। হয়ত কখন মাথার যন্ত্রণাটা একটু কম থাকে কিন্তু শরীরের অন্য কোন একটা যন্ত্রণা তাকে কাতর করে তোলে—কিন্তু পীয়ার তা প্রকাশ করে না। সেও তার স্ত্রীর মুখের পানে চায় আর ভাবে—“মালের দিন দিন কত না পরিবর্তন হচ্ছে আমারই ত দোষ আমিই তাকে নামিয়ে নিয়ে এসেছি এই অবস্থায়—আমাকেই আবার তাকে সুখা করতে হবে।” তাই নিজে সহ্য করার শক্তি সে বাড়িয়েছে—এমন কি যখন যন্ত্রণায় কাঁদা পায় তখনও মুখে সে হাসতে চেষ্টা করে। প্রথম প্রথম ক্ষেতে তার লাঞ্ছন কষ্ট হ'ত কিন্তু প্রত্যেকবার ভান করার পর পরের দ্বারের জগু সে প্রস্তুত হ'ত রীতিমত।

এমনি করে সে ভাগ্যকে শান্তমনে গ্রহণ করতে শিখেছে। হাঙ্গারস তার আরও সহজ হয়ে উঠেছে। এখন সে নিজেকে সংযত করে নিয়েছে, আর দুর্ভাগ্যের মুখের পানে চেয়ে বলতে পারে—“যদিও আমি অসহায়, তুমি আমায় অশান্তি থেকে অশান্তির মধ্যে ডুবিয়ে দিতে পার কিন্তু আমার এই অদৃষ্টকে উপহাস করবার শক্তি কেড়ে নেবার ক্ষমতা তোমার নেই।”

এখন দিন কত সহজে কেটে যায়—কোন আশা নেই, আকাঙ্ক্ষা নেই, আর ভগবানের কাছে' মানুষের কাছে তার কোন অভিযোগ নেই। কিন্তু যখন হাপর নিয়ে কাঁদ করতে করতে সে ক্লান্ত হয়ে পড়ে—তখন মুখে সন্তোষের হাসি নিয়ে সে মালেকে বলে—“না মালেক, আমি ত তোমাকে বলেছি যে জল তোলার ভার আমার। বালতিটা আমাক দাও।” “তুমি, তুমি পারবে জল তুলতে?” “আমি পুরুষ মানুষ না অন্য কিছু—স্ত্রীলোকের জগু রান্নাঘর—সেইখানে

তুমি দিবে যাও ” এতে তার মনে শান্তি আসে—যদিও মাঝে মাঝে শিরদাঁড়া ভেঙ্গে পড়তে চায়। আর কখনও কখনও সে বলে—
 “আজ বড় ক্লাস্ত বোধ করছি মানে—আমি একটু বেশীক্ষণ বিছানায় শুয়ে থাকব।” তখনই স্ত্রী বোঝে—তার আবার সেই মাথার যন্ত্রণাটা শুরু হয়েছে। প্রতিদিনের অভিজ্ঞতাই তাকে এ বুঝতে সাহায্য করত; আর স্বামী তার সেই মাথার যন্ত্রণা আলশ্চের দোহাই দিয়ে চেপে যেতে চায়।

তাদের একটা গাভী, একটা গুরুর আর কতকগুলো মুরগী আছে। এদের সংখ্যাধিক্য লোরেঞ্জের বাড়ীর মত অভ বেশী নয় কিন্তু পীয়ার নিজেই এদের তত্ত্বাবধান করে। গত বৎসর তাদের জমিতে এত অশু হয়েছিল যে তারা কয়েক কুড়ি বিক্রীও করেছিল। তারা এখন আর ডিম কেনে না—বিক্রী করে। পীয়ার নিজে মাথান্ন করে বাজারে নিয়ে যায়, সেগুলি বিক্রী করে নিজেদের প্রয়োজনীয় জিনিষপত্র কিনে আনে। তাতে আর হয়েছে কি? মানে ত ঘর মুছতে বা রান্না করতে দ্বিধা বোধ করে না। একথা সত্য যে, একদিন তাদের দিন অন্তর্ভাবে কেটেছে, কিন্তু সে সব গত-দিবসের কথা স্মরণ করে আজ আর লাভ নেই। কিন্তু মানে—সে আজও অনাগত দিনের সুখের স্বপ্ন দেখে। তাছাড়া তারা দু'জনে নৌকা-ডুবির যাত্রী—তীরের ধারে বাসা বেঁধে দিন কাটাচ্ছে—প্রকৃতির রুচ আঘাত যত কঠিন হোক না কেন সেখানে।

কখন কখন এমন হ'ত যে, নূতন আমেরিকান টাইপের মোয়িং মেশিন-এর কোন দোষ তার কাছে সারাতে এসেছে, তখন সে ঠোঁট দুটো চেপে ধরে এক অদ্ভুত চাউনিতে চেয়ে থাকত—তারপর একটা ঢোক গিলত। যে লোকটা, এক চুলের

স্বস্ত্যায় তাকে চূর্ণবিচূর্ণ করে দিয়েছে—সে হয়ত আজ ক্রোরপতি !

এ দোষ সারাত তার ইচ্ছা করত না, কিন্তু তবু সে ঘাড় গঁড়ে কাজ করে চলে—মালের একজোড়া জুতার দরকার।

মাঝে মাঝে সে হাতুড়ীটা ফেলে দিয়ে অন্ধকার কামারশাল থেকে বাইরে আসত মুক্ত বাতাসের লোভে : তখন সে শুধু এই বিরাট শূন্যতায় ভরা আকাশের পানে নিনিমেষ নয়নে তাকিয়ে থাকে। একজন লোক, তার হাতে একটা হাতুড়ী—তাকিয়ে আছে দূর আকাশের পানে। এই যে তার প্রবৃত্তি, এটা সে পেয়েছে তার পিতামহদের কাছ হতে—যারা মানুষের জন্ম এনেছে আশুনা আর চিন্তা, তাদের অন্তর জ্বালিয়ে দিয়েছে বিদ্রোহের অগ্নি শিখায়।

পীয়ার আকাশের দিকে চায়। মেঘের দল ধীরে ধীরে সরে বাচ্ছে অকারন অন্তমনস্কতায়। ওরই অন্তর দেবতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ? কিন্তু আকাশের বক্ষ আজ দেবতাহীন। কার বিরুদ্ধে এ বিদ্রোহ ?

কিন্তু মানুষের প্রতি এই যে অন্তর্য অবিচার ? এই যে যথেষ্টাচারিতা—সেই শেষ বিচারের দিনে কে হবে তার বিচারক ? কে সে ? কেউ নয়।

কি ? কেউ নয় ? মনে করে দেখ সেই সমস্ত মাটারদের কথা যারা অন্তরে শিশুর মত সরল হয়েও অসহ্য অমানুষিক যন্ত্রণার মধ্যে প্রাণ বিসর্জন দিয়েছে তাদের কি ক্ষতিপূরণ হবে, হ্রাশা ?

কিন্তু তারা বিশ্বমানবের এক বিরাট গোষ্ঠী যারা সমগ্র ব্যথার ভার নিয়েছে নিজদের মাথায় তুলে, যাদের আত্মা চঞ্চলভাবে ঘুরে বেড়ায় মিথ্যা লজ্জার ফলকে—যারা সত্যের জন্য যুদ্ধ করতে গিয়ে জীবন বলি দিয়েছে—কারণ পৃথিবীতে মিথ্যাচারের প্রলোভনও বেশী,

তার শক্তিও অবিক। সত্যতা? বিচার? কেউ কি নেই যে একদিন মৃত আত্মাকে শান্ত করবে, বিশ্বের এই গরমিল আবার শুধরে দেবে? কেউ কি নেই? না কেউ নেই!

পৃথিবী ছুটে চলেছে তার গতিপথে। ভাগ্য অন্ধ আর দেবতার মুখ প্রসন্ন হাসিতে ভরে যায় যখন শয়তান 'জবে'র উপর অত্যাচার করে।

মূর্থ, চুপ কর, হাতুড়া দৃঢ় মুষ্টিতে ধরে থাক। যদি কোন দিন তোমার চেতনা এই বিশ্ব প্রকৃতিকে আলিঙ্গন করতে পারে, সেই দিন বিশ্বের ভীষণতা তোমায় আঘাত করবে। মনে করে রাখ—তুমি কেবলমাত্র মেরুদণ্ডী প্রাণী আর ভুলবশত একটা আত্মার অধিকার তুমি পেয়েছ। ঘণ্টা ঘটাং—হাতুড়ীর মধ্য থেকে স্কুলিঙ্গ ঠিকরে পড়ছে। জীবনটা কোন রকমে কাটিয়ে দাও। কিন্তু ধীরে ধীরে তার মনে জাগছে এক আশ্চর্য্য স্ফুধা, পৃথিবীর এই যত ভাগ্যানির্পীড়িত নর-নারী—তাদের সঙ্গ লাভের বাসনা—এইসব স্কন্ধ অন্তরকে এক করে এক পরম বিজয়বার্তা ঘোষণা করতে—ছুঃখ বা বিদ্রোহ করতে নয়। তারা করবে নিখিল প্রকৃতির বন্দনা। চেয়ে, দেখে ওগো অসীম পৃথিবীর নিষ্ঠুর দেবতা—আমরা তোমার নিষ্ঠুরতাকে পূজা করছি। অনুভব কর আমাদের মনের মহত্বকে।

একটি মন্দির, মানুষের ক্ষুদিত আত্মার এক বিরাট বিশ্বদেউল। সেখানে মৃতমন্ন আবৃত্তি হবে না, গীত হবে শাশ্বত মানব মনের চিরন্তন এক ভজনীর সুর—যা দেবতার অন্তর-আত্মাকে কাঁপিয়ে তুলবে। সে দিন কবে আসবে—এ মন্দির প্রতিষ্ঠার দিন আর কত দেরী!

এক সন্ধ্যায় পীরার পোষ্ট অফিস থেকে একটু বেন উল্লসিত মনেই ফিরে এল—“দেখ মালো, ক্রসেথ থেকে চিঠি এসেছে।”

মাল্‌ লোরেঞ্জের দিকে তাকাল, সে ততক্ষণ তার মার কাছে এসে দাঁড়িয়েছে। “কসেথ থেকে? লুইস কেমন আছে?”

“এই যে চিঠি, পড়েই দেখ না।”

মাল্‌ এক নিশ্বাসে চিঠিটা পড়ল—তারপর লোরেঞ্জের দিকে তাকাল। সেই দিন রাতে ছেলেরা বুঝতে গেলো তাদের মা আর বাবা আলোচনা করতে লাগল। মাল্‌ স্বীকার করতে বাধ্য হ'ল তার স্নামীর কথাই ঠিক। ছেলোটিকে এখন রাখা পরম স্বার্থপরের মত কাজ হবে— কারণ একদিন সে তার পিতার খুড়ীমার সমস্ত সম্পত্তির অধিকারী হ'তে পারে।

সে যদি এখানে থাকে সে বড় জোর কামার হবে। কিন্তু কামারের ত আর প্রয়োজন নেই—যন্ত্রদানব মানুষের সমস্ত ক্ষুধা মিটিয়ে দিচ্ছে। আর এই পরীতে কি শিক্ষাই বা সে পেতে পারে? আর্ট ম্যারিট লিখেছে, তিনি ওকে ভাল সুলে দেবেন।

অতএব লোরেঞ্জকেও যেতে হবে!

তারপর যখন তারা লোরেঞ্জকেও ট্রেনে তুলে দিয়ে এল, তখন মায়ের চোখের জলে ক্রমাৎ সিক্ত হচ্ছে—দৃষ্টি তার ঝাপসা হয়ে গেছে। বাড়ীতে ফিরে এসে মাল্‌ কান্নায় ভেঙ্গে পড়ল—আর পীয়ার গুন্ গুন্ করতে করতে স্নীর জন্ম সঙ্ক্যর খাবার ঠিক করতে লাগল।

“আমি কিছুতেই বুঝতে পারছি না তুমি কি করে হাসছ”—মাল্‌ ভাঙ্গা গলায় বললে, অদ্ভুত ধরণের হাসি তার ওষ্ঠে। পীয়ার উত্তর দিলে— “ওবিষয়ে যত কম ভাববে ততই ভাল।” কিন্তু পরদিন পীয়ার গুয়ে রইল বিছানায় বহুক্ষণ। মাল্‌ স্নামীর কপালে হাত দিয়ে উত্তাপ পরীক্ষা করলে।

এমনি করেই দিন কেটে যায়। পরের কাছে হাত না পেতে দারুণ

কষ্টে তারা সংসার চালায়—হুঁজুনেই পরিশ্রম করে অসাধারণ। যখন বড় রাস্তার ওপরে ওই মস্ত ডেইরীটা তৈরী হল, তখন পীয়ার প্ল্যান করে দিয়ে কিছু টাকা পেলে। মাঝে মাঝে হাত কাটা ওয়েষ্ট কোট পরে পীয়ার মুদির দোকানে যায়—পিঠে তার একটা বস্তা। মাথা নীচু করে এসে হাঁটে। দাড়ীতে তার রীতিমত পাক ধরেছে—সে পথ চলে—চোখ হয়ত অনিদ্রায় রক্তজবা, কিন্তু তার পদক্ষেপ লঘু আর কৌতুকপ্রিয়।

গ্রীষ্মের সময় প্রতিবেশীরা মাঝে মাঝে দেখত—তারা বাড়ীতে চাবী দিয়ে ছোট্ট এষ্টাকে নিয়ে পাহাড়ের ধারে বনভোজনে যাচ্ছে। তাদের মনে হয়ত গত দিনের কোন স্মৃতি, ছোট্ট আগুনের কুণ্ডের পাশে বসে গরম গরম কাফি পান করা।

শরৎকালে যখন প্রকাণ্ড প্রান্তুর সব হলদে রঙে মাখান হয়ে গেছে—মালের ও পীয়ারের বাগানেও তখন ধান। ছোট্ট তাদের জমি হুঁজুনের পক্ষে স্বচ্ছল। যদি কখনও আন্দাজ মত আলু না হ'ত হয়ত তাদের অসুবিধা হ'ত কিন্তু তবু তারা থাকে ছোট্ট ঝকঝকে বাড়ীতে—সর্বাসুন্দর সংসারে—সুখী তাদের গৃহস্থালীতে। মালের সারাদিন পরিশ্রম করে আবার প্রতিবেশী মেয়েদের রান্না, সেলাই-এর বিষয় শিক্ষা দেয়। কিন্তু তার একটা স্বভাব হয়েছে—বাতায়নের বাহিরে যেখানে পাহাড়ের দীমানায় উপত্যকার সীমা মিশে গিয়েছে, তার পানে চেয়ে থাকা দীর্ঘ দিন ধরে। তার কি মনে হয় আবার সুখের দিন ফিরে আসবে, তাদের এই বাথার রজনীর অবসান হবে—এসব কল্পনা আজ তার কাছে বিলাসে দাঁড়িয়েছে।

এমনি করেই চিরন্তন কালের স্রোত বয়ে যায়।

প্রিয় ক্লস ব্রক --

সম্প্রতি এখানে একটা ঘটনা ঘটেছে—সেই বিগয় জানবার জন্ম তোমায় এই পত্র লিখছি—হয়ত শুনে কিছু শান্তি পাবে। ভেবে দেখলাম যে এই দুঃখ দারিদ্র্য ভরা পৃথিবীতে মানুষ ইচ্ছা করলেই সুখ পেতে পারে, যদি সে নিজের চোখ দিয়ে পৃথিবীর দিকে চায়—অপরের অভিজ্ঞতার একমাত্র বিশ্বাস না করে।

একথা সবাই জানে যে আমাদের জীবনে দুঃখ চরম ইংরেজি চরমের দিকে যাচ্ছে,—বিশেষ করে আমরাই দুঃখ প্রীতির ভান করতে চাই না। বরং ঠিক তার উল্টো, দুঃখ আমাকে পীড়িত করে তুলেছে। দারিদ্র্য মানুষকে হীন করে। এর প্রভাব অভ্যস্ত খারাপ—অবশ্য আমি এমন প্রভাবের কথা বলছি না—যা সমস্ত বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডকে আলিঙ্গন করতে পারে। একদিন আমি ছিলাম 'প্রথম প্রপাতের ইঞ্জিনীয়ার আর আজ আমি ছোট গ্রামের আরও ছোট কামার মাত্র। এ অভিজ্ঞতা আমাকে আঘাত করে। চোখ দুটোর জন্ম আমার বই পড়া বন্ধ—ভাবতেও আমার দুঃখ হয়। তবু আজ আমি এ সবে অভ্যস্ত—এ সবে মধ্য আমি কোন সং বা শুভ উদ্দেশ্য দেখতে পাচ্ছি না। কতবার আমার মনে হয়েছে দৈত্যের শেষ সীমায় আমরা এসে পৌঁচেছি কিন্তু প্রত্যেক বারই দেখছি, এ একটা স্তর মাত্র। চরম দৈত্য আজও অনাগত। মাথার শিরা তোমার ছিঁড়ে যেতে চায়, তবু কাজ তোমায় করতেই হবে, প্রত্যেক খুঁটিনাটি জিনিস তুমি

বাঁচাচ্ছ তবু অন্তের গ্রাসে পরের দয়ার স্বাদ। এসব আমার ভাল লাগে না। ভবিষ্যতের যত আলোকোজ্জ্বল দিন আজ অন্ধকারে হারিয়ে গেছে—সব স্বপ্ন, সব আকাঙ্ক্ষা, সব অভিমান জীবন থেকে মুছে গেছে। মনে হয় এসবের শেষে তুমি এসে দাঁড়িয়েছ। কিন্তু তা নয়। মানুষের অস্তরের আসল সত্য আজও সমুজ্জ্বল। জীবনের চরম দৈন্তের মধোগুণ্ড কি সে মূল্যবান জিনিষ যা 'হারায়নি'—তারই কথা জিজ্ঞেস করছ না?

সেই কথাই তোমায় বলব!

আমাদের এই অন্ধকার জীবনে যখন একটু আলো আসছিল ঠিক সেই সময় অতিথি এল। কিছু দিন হ'ল মাথার মধ্যে যেন শান্তি পাচ্ছি, আবার আমি লাঙ্গল নিয়ে কাজ করছি আবার ইম্পাত—এ কাউকে মুক্তি দেবেনা—তুমি ত জান এর মধ্যে মানুষ কতরকমের সম্ভাবনা দেখতে পার। মাল্লে আবার যেন বাহুতে বল পেয়েছে। আমার এই স্ত্রীকে তুমি কি মনে কর? নিজেকে আনন্দ থেকে বঞ্চিত করে, একজন দুঃখাবনত মানুষের দৈন্তের ভার হাতে যে তুলে নেয়? আজও আমি আশা করি তোমার জীবনে এমন কোন নারীর পরিচয় তুমি পাবে। একথা সত্যি যে তার চুলে পাক ধরেছে, তার মুখে বান্ধকের ছাপ। তার দেহলতা যেন ভারাতুরা, তার হাত আর আলোকের মত রক্তাভ নেই। কিন্তু এই তার দেহের দিকে চেয়ে আমার মনে হয় যেন আমি নূতন এক সৌন্দর্য্য দেখতে পাই—ওর ঐ মুখের প্রত্যেকটি রেখা যেন কালের ফেলে রাখা নিদর্শন—দুঃখ এসেছে কিন্তু আমাদের বন্ধন শিথিল হয়নি। আজও যখন সে হাসে কঁকণভাবে, রক্তহীন মুখে, তখন আমার মনে পড়ে পুরানো কথা যখন স্বর্গ ও পৃথিবী আমাদের উপর নিষ্ঠুর হস্তে উঠেছিল, আর

মালের উষ্ণ নিশ্বাস আমার বুকের পাশে জোরে জোরে পড়েছিল।
জীবনের সুখ ও আনন্দ তাকে আজকের রূপে রূপান্তরিত করেছে।
পৃথিবীর চোখে সে আজ পুরাতন, কিন্তু আমার কাছে এ আর এক
আবিষ্কার।

আসল কথা এইবার বলব। দুটি ছেলে মেয়েকে পরের হাতে
বিলিয়ে দিয়ে মায়ের মন কেমন হয় তা হয়ত তুমি বুঝতেও পারবে না।
বিশেষ করে ছেলে মেয়ে দুটি প্রায়ই পত্র লেখে তাদের নিয়ে আসতে,
মাকে তাদের মনে পড়ে—মন কেমন হবে মার জন্ম। কিন্তু তবু
আমাদের একটি মেয়ে তখনও কাছে ছিল। এষ্টা—পাঁচ বছরের এষ্টা,
তুমি যদি একবার তাকে দেখতে? তুমি যদি পিতা হ'তে এবং তোমার
অশান্ত মস্তিষ্কে বড় দুটির ওপর তোমায় স্নেহ সফল না হত, তুমি ত
চেষ্টা করে ছোট মেয়েটাকে স্নেহ প্রেমে অভিযুক্ত করে রাখতে?
নয় কি? এষ্টা চমৎকার ছোট্ট নাম, মনে করতে পার একটি মেয়ে
মাথায় কালো কৌকড়ান চুল, মুখ তার রোদে ঘুরে ঘুরে একটু কটা,
তার মায়ের একজোড়া চমৎকার ভুরু টানা টানা চোখের ওপর—
সর্বদাই কাজে ব্যস্ত; হয়ত সে পুতুল নিয়ে খেলছে কিংবা কাঠের
টুকরা খুঁজছে অথবা তার মা যখন রুটি সেঁকছে, তখন নিজের তৈরী
ছোট্ট ছোট্ট কেক সে ভাজছে মা বাবার জন্মে, হয়ত বা পাখীর সাথে
কথা কইছে কিংবা নাচছে, কখনও বা আপন মনে গান গাইছে—
মাথায় তার কবে শোনা একটা গানের রেশ। যখন তার মা মেঝে
পরিকার করে, ছোট্ট এষ্টা তখন একটা নেকড়া নিয়ে চেয়ার
পরিকার করবে, তারপর হঠাৎ উণ্টে গিয়ে ফাঁদে পড়ে যায়
তারপর কান্না, যখন তাকে ছাড়িয়ে দেওয়া হল হঠাৎ কান্না
ভুলে গিয়ে সে নাচতে নাচতে ছুটল বাহিরের দিকে, মুখে হাসি।

যখন কাজ করছি কামারশালার, ছুটি ছোট পায়ের শব্দ শোনা যায়—
“বাবা খাবে এস।” একটি ছোট কোমল হাত তোমায় দরজা অবধি
টেনে আনবে। “আজ তুমি আমায় চান করিয়ে দেবে বাবা”—“এই
যে তোমার ভোরালে।” হয়ত যখন আনু আর দুধ আমাদের খাবার,
ছোট্ট এষ্টা এমন করে বদবে যেন সে রাজার বিয়েতে নেমন্তন্ন খাচ্ছে—
তারপর বাড়ি ফিরিয়ে বাবাকে বলবে—“আনু আর দুধ কি চমৎকার
খেতে বাবা।”

রাত্রে সে আমাদের বিছানার পাশে ছোট্ট একটা বাস্কে ঘুমবে। কতদিন
বিনিদ্র রজনীতে তার হাসিমাখা মুখের দিকে চেয়ে আমাদের চোখ
জুড়িয়ে যায়। মনে হয় যেন তার সেই ছোট্ট হাত দিয়ে সে আমাকে
দোলাচ্ছে—আর ঘুম জুড়িয়ে আসছে আমার চোখে।

এইবার যে কথা লিখব তাই ভেবে আমার হাত কেঁপে যাচ্ছে।
কিন্তু তবু আমি লিখব কেননা এই ঘটনাই মাল্লে' আর আমার মনে
এনেছে স্বর্গীয় শান্তি, হয়ত তুমিও তাই পাবে। আমাদের পাশের
বাড়ীতে থাকে একজন কামারী আর তার স্ত্রী—আমাদেরই মত গরীব
তারা। নূতন বাড়ীতে আসার পরই একদিন আমি তার সঙ্গে দেখা
করতে গেলাম। লোকটা বেঁটে আর রোগা, কেটলী প্যান ঝালাই
ক'রে জীবিকা অর্জন করে।

“কি চাও তুমি?”—আমার দিকে আড় চোখে চেয়ে বললে। তারপর
বেরিয়ে আসবার সময় শুনলাম সে আমার পিছনে দরজাটা বন্ধ করে
দিলে। হয়ত সে ভাবলে আমি তার রোজকার খাবার কেড়ে নিতে
এসেছি। তার স্ত্রী হুঁপুঁপু, মোটা মেয়েমানুষ, স্বভাব চরিত্র তার অত্যন্ত
খারাপ। এই ত সেদিন সে জেল থেকে এল।

এক রবিবারে আমি আমার বাগানে দাঁড়িয়ে তার একটা আপেল

গাছের দিকে চেয়ে দেখছিলাম। একটা গাছ ঠিক আমার বেড়ার পাশে জন্মেছে, এমন কি তার একটা ডাল আমার জমির দিকে ঝুঁক পড়েছে। আমি সেইটা ধরে ফুলগুলোর গন্ধ শুকছিলাম। হঠাৎ একটা কণ্ঠস্বরে আমার চমক ভাঙ্গল—“এই টাইগার ওর টুটিটা চেপে ধর ত।” সঙ্গে সঙ্গে কাঁসারীর উলক ডগটা আমার দিকে ছুটে এল, আমার গলাটা কামড়ে ধরতে। খুব বক্রাত ভাল যে কুকুরটা কিছু করবার আগে আমি তার কলারটা ধরে ফেললাম—তাকে টানতে টানতে তার মনিবের কাছে নিয়ে গেলাম।

“ফের যদি এরকম ঘটনা ঘটে তবে সেরিককে ডাকতে বাধ্য হব।” তারপরই পৃথিবীর সেই পুরাতন সঙ্গীতের সুর হ’ল। লোকটি :না জেনে আমার সম্বন্ধে তার যা ধারণা বলে গেল—“মুখ সামলে কথা বল ছোট লোক—এখানে এসেছ আমাদের এই মজুরদের অন্ন কেড়ে নিতে।” এরকম আরও কত কি? সে বাহু আন্দোলিত করে গর্জন করতে করতে চলে গেল, আমার মনে হল সে যেন ছুরিটুরি ঐ রকম কিছু খুঁজছে আমার দিকে ছুড়ে মারবার জন্য। আমি না হেসে পারলাম না। এ বিশ্বের সমরাজ্যে দুটি বিপুল শক্তি আজ মুখোমুখী এসে দাঁড়িয়েছে।

তুঁদিন পরের ঘটনা—আমি হাপরের সামনে দাঁড়িয়ে ছিলাম এমন সময় স্ত্রীর ভয়ানক চীৎকার ভেসে এল। ছুটে বেরিয়ে এলাম—ব্যাপার কি? মালের ইতিমধ্যে বেড়া ডিঙ্গিয়ে ওধারে নেমে পড়েছে—হঠাৎ দেখতে পেলুম চোখের সামনে—এষ্টা মাটিতে পড়ে আছে—তার বুকের ওপর সেই বৃহৎ জানোয়ারটা।

তারপর—? মালের বলেছে, আমিই নাকি সেই কাপড়ের স্তূপ হ’তে আমার মেয়েকে ছিনিয়ে এনেছিলাম।

বিপদের সময় ডাক্তারেরাই নাকি শেষ আশা—যদিও তারা একটি

ছোট্ট মেয়ের গলার ক্ষত খুব পরিচ্ছন্নতার সহিত ড্রেস করে দিতে পারে—কিন্তু সব সময়ই কি তাতে সফল ফলে!

মায়ের কিছুতেই ডাক্তারকে যেতে দেবে না—অনুন্নয় বিনয় করে কেঁদে তাকে জড়িয়ে ধরে আর একবার শেষ চেষ্টা করতে বললে—যদিও কিছুই আর করবার ছিল না। অবশেষে ডাক্তার চলে গেলেন—কিন্তু তাকে কিছুতেই সান্না দেওয়া গেল না। মেঝেতে মাথা খুঁড়ে নিজেব টুন ছিঁড়ে সে ব্যথায় আত্মাহারা হয়ে গেল—না কিছুতেই বিশ্বাস করা যায় না—বিশ্বাস সে করবে না, কিছুতেই না—এ রুঢ় সত্য মেনে নেওয়া অসম্ভব।

সেদিন রাত্রে দু'টি ব্যথাতুর হৃদয় পরস্পরের পানে চেয়ে বসে রইল—অদ্ভুত ভাদের চাহনি। মা এখন অনেকটা শান্ত হয়েছে। শিশুটিকে সাজিয়ে কব। দেবার জন্ত প্রস্তুত করে বাহিরে নিয়ে আসা হ'ল। পিতা জানালার ধারে বসে—নিম্পলক নেত্রে চেয়ে দেখতে লাগল। তখন মে মায়ের ধূসর রাত্রি।

এখন আমরা বুঝতে পারছি যে প্রত্যেক বিরাট দুঃখ আমাদের নিয়ত অস্তিত্বের উচ্চ সোপানে নিয়ে চলে। আমি এখন শেষ সীমায় উপস্থিত—এরপর আর কিছু নেই।

এখন আমি আবিষ্কার করেছি, হে প্রিয়তম বন্ধু—দুঃখের এই দীর্ঘ দিনগুলি আমাকে একরূপে নয়—নানাভাবে পরিবর্তিত করেছে—আমার মধ্যে এক সময় বহু লোকের উৎস ছিল কিন্তু আমার কাজ শেষ হ'য়ে গেছে—তাই তারা সে উৎস ভেদ করে বিভিন্ন মুখে ছুটে বেরিয়ে যেতে পারে।

আমি দেখলাম রাত্রির অন্ধকার ভেদ করে একটি পাগল ছুটে যাচ্ছে—স্বর্গ ও পৃথিবীর দিকে মূর্ত্যঘাত করতে করতে—জীবনের

প্রহসন নাট্যে সে আর অভিনয় করতে চায় না—নদীর দিকে সে ছুটে গেল।

তখনও সেখানে আমি নিশ্চলভাবে বসে রইলাম।

আবার দেখলাম ছাড়া পাওয়া বেঁটে ধূসর এক সন্ন্যাসী।—চাবুকের তাড়নায় মাথা নত করে বলছে—“তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হবে দেবতা। ঈশ্বর দাতা—ঈশ্বরই তা ফিরিয়ে নেবেন।” ভারী করুণ দেখতে লোকটিকে—হঠাৎ রাত্রির অন্ধকারে সন্ন্যাসী হারিয়ে গেল কোথায় কে জানে!

তখনও আমি তেমনিভাবে বসে রইলাম—নিশ্চল পাথরের মত।

অস্তিত্বের উচ্চস্তরে আমি একাকী বসে রয়েছি—সূর্য্য চন্দ্র নক্ষত্র সব একে একে নিভে গেছে—আশেপাশে চারিদিকে একটা হিম শীতল নিস্তরতা বিরাজ করছে।

কিন্তু তারপর আমার নিকট সব প্রভাতী আলোর মত পরিষ্কার হয়ে গেল, এখনও আমার কিছু করবার আছে। এখনও আমার মধ্যে একটা অপরাধের জ্যোতির কণা রয়েছে—যা জ্বলছে স্বতই নিজের শক্তিতে। আবার যেন আমি অস্তিত্বের প্রথম দিনে উপস্থিত হয়েছি—একটা অবিনশ্বর আত্মা আমার মধ্যে বলছে—“আত্মক আলোর আশীর্বাদ।”

এই আত্মাই ক্রমশ শক্তি সঞ্চয় করতে করতে আমাকে বলীরান করে তুলেছে। পৃথিবীর সকল সৃষ্টির প্রতি একটা অনির্কচনীয় মমতা জাগছে—তাদেরই একজন বলে আমি গর্ব্ব অনুভব করছি।

এখন আমি বুঝতে পারছি অন্ধ নিয়তি কেমন করে আমাদের সর্ব্বস্ব অপহরণ করে, কিন্তু তবুও এখন মানুষের অস্তরের মধ্যে এমন কিছু অবশিষ্ট আছে—যাকে জয় করবার ক্ষমতা—স্বর্গে মর্ত্যে কারুর নেই।

আমাদের এতদূর বিনয়ন হয়ে যাবে—আম্মার প্রদীপ নিভে যাবে না, কিন্তু আমাদের অন্তরের যে জ্যোতি-শিখা আছে সে অবিনশ্বর—সে অসীম ও সসীমের মিলনের রাখী - সে আলোকের কণা।

এখন আমি জানতে পেরেছি যে আমার অম্মার যা চিরদিনের নামেটা ক্ষুধা—সে জ্ঞান নয়, যশ নয়, ধন নয়—পুরোহিত হবার বাসনাও নেই—বহুযুগের প্রকাণ্ড মহাপুরুষও আমি হতে চাইনি—আমাদের চিরদিনের আকাঙ্ক্ষা মানুষের মহিমার মন্দির—তাই আমি গড়ব—সেই আমার শেষ লক্ষ্য। মানুষের রোজকার জীবনে সঞ্চিত পাপ পুণ্যের বিচার সে মন্দিরে নয়—সে মন্দির বিশ্বের যা কিছু মৌন্দর্য্য, যা কিছু ঈশ্বরের দান তারই বন্দনার নিকেতন।

আজ আমি অক্ষম। নূতন কিছু করবার ক্ষমতা আমার আজ হারিয়ে গেছে। কিন্তু তবু সেই এক জায়গায় বসে আমার মনে হ'লে যে জয় আমারই হয়েছে—লক্ষ্যে এসে একা আমিই পৌঁচেছি।

তারপর—তারপর কি ঘটল? সেবার বসন্তে ভীষণ অনাবৃষ্টি দেখা দিল—এই উপত্যকায় এরকম প্রায়ই ঘটে। চিরদিনের সেই উত্তুরে বাতাস গ্রামের চারিদিকে গুলু ধূলা ছড়িয়ে দিলে। একটা বৃষ্টিহীন দুভিক্ষের করাল মূর্তি গ্রামবাসিগণের মনে শঙ্কা জাগিয়ে তুললে।

অবশেষে লোকেরা সাহসে ভর করে বীজ বপন করলে—কিন্তু তারপর আরম্ভ হ'ল কুয়াসার দুর্ভোগ—বরফ পড়তে লাগল—বীজগুলো মাটির তলে জমে পচে গেল। আমার বন্ধু কাঁসারী একফালি জমিতে বালি বুনেনি—এখন সে সব আবার নূতন করে বুনতে হবে—কিন্তু বীজ কোথায় পাওয়া যায়? দ্বারে দ্বারে সে ভিক্ষা করে ফিরলে কিন্তু সবাই তাকে বিমুখ করে তাড়িয়ে দিলে—অন্তত এষ্টার যা ঘটেছে তারপর থেকে সবাই তাকে ঘৃণা করে—তাকে কেউই

কিছু দার দেবে না—তারও কেনবার টাকা নেই। রাস্তার বের হ'লে ছেনেরা তাকে বিক্রম করে—এমন কি গ্রামের কতকগুলো লোক তাকে গ্রামছাড়া করবার কথা ভাবতে লাগল।

পরের দিন রাত্রে আমি একটুও ঘুমোতে পারিনি—ছ'টো বাজলে শব্দ। ভাগ করে উঠে পড়লাম। “কোথায় যাচ্ছ?”—মালেক জিজ্ঞাসা করলে: “দেখছি আনাদের আর আদ বুসেন বালি আছে কিনা।” আমি উত্তর দিলাম।

“বালি—এত রাত্রে বালি দিয়ে কি হবে?”

“কঁসারীর জমিটার বুনতে—এখনই এ কাজ করবার প্রশস্ত সময়—তাহলে কেউ জানতে পারবে না যে কাজটা আমিই করেছি”—

সে উঠে বসল—আমার দিকে এক দৃষ্টিতে চেয়ে রইল। “কি বললে—কঁসারীর ক্ষেতে বুনবে?” “হ্যাঁ”—আমি উত্তর দিলাম।—“তার মাঠ সারা গ্রামে অনাবাদিত থাকবে এতে কি কিছু উপকার হবে?”

“পাঁসার কোথায় যাচ্ছ?”

“বজলান ত তোমাকে”—আমি বেরিয়ে গেলাম। কিন্তু স্পষ্টই বুঝতে পারলাম দেও পোষাক পরছে—আমার সঙ্গে নিশ্চই আসবে।

রাত্রে বৃষ্টি হয়ে গেছে—বাতাস আর্দ্র। প্রভাত এখনও তরল অন্ধকারের কোলে নিদ্রিত—উত্তরের হাঙ্কা মেঘে সোনালী ঝালপ দেওয়া বিকশিত বার্চের গন্ধে বাতাস আমোদিত—ম্যাগপাই ষ্টারলিং এর ঘুম ভেঙেছে কিন্তু কোন মানব মূর্তি চোখে পড়ে না। গোলাবাড়ী—গ্রামখানি সব এখনও স্তম্ভিত।

আমি একটা বাস্কেটে বালির বীজ চাপিয়ে প্রতিবেশীর বেড়া ডিঙ্গিয়ে তার ক্ষেতে বুনতে লেগে গেলাম। বাড়ীতে জীবনের লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না। সেরিফের অফিসার এসে আগের দিন কুকুরটাকে গুলি করে

মেরেছে। কাঁসারী ও তার স্ত্রী সম্ভবত এখনও ঘুমোচ্ছে—হয়ত তার চারিদিকের শত্রুদের স্বপ্ন দেখছে, তাদের অনিষ্ট করবার ফন্দি আঁটছে।

প্রিয় বন্ধু—এর পরও কি শেষটা বলবার দরকার আছে? একবার ভেবে দেখ একজন রাজ্য বিলিয়ে দিচ্ছে—তবু তার কিছু এসে যায় না। আর—আর একজনের এক মুষ্টি শস্ত দিয়ে দিলে তার অনেক কিছু এসে যায়। এ যে তার অবশিষ্ট শেষ সম্পত্তি, এইটুকু অর্জন করতে তাকে জীবন-মরণ সংগ্রাম করতে হবে। এ কি কিছু নয়? আর আমার কথা জিজ্ঞাসা করছ—ক্রাইস্টের কথা স্মরণ করে এ কাজ আমি করিনি—অথবা আমি আমার শত্রুকে ভালবাসি বলেও নয়—আমি এ কাজ করেছি—কারণ আজ জীবনের ধ্বংসের মুখে দাঁড়িয়ে—আমি এক মহা দায়িত্ব অনুভব করতে পারছি। মানুষকে জাগতে হবে—অন্ধ বিচার বিবেচনাহীন নিয়তির হাত থেকে নিজেকে বাঁচাবার শক্তি অর্জন করতে হবে তাকে। দুঃখের কণ্টকিত পথে সব সময় মনে রাখতে হবে—মানুষের দৈবী শক্তির মরণ নেই। অনন্তের আলো আজ আর একবার আমার মধ্যে প্রদীপ্ত হয়ে উঠেছে, বলেছে—আমুক আলোর আশীর্বাদ।

দিনে দিনে এখন আমার নিকট পরিষ্কার হয়ে যাচ্ছে—মানুষ, একমাত্র মানুষই স্বর্গে মর্ত্যে দেবতার সৃষ্টি করবে—বিশ্বের নিষ্প্রান একচ্ছত্র আধিপত্যের উপর এইখানেই তার বিজয় অভিযান। সেই জনাই আমি আমার পরম শত্রুর ক্ষেত্রে শশুর বীজ বপন করলাম—যাতে সেই দেবতারই আবির্ভাব হয়।

আঃ—সেই মুহুর্তের কথা যদি জানতে! আমার চারিদিকের বাতাস যেন মুখর হয়ে উঠল—যে সমস্ত হতভাগ্যকে আমি জানি, নাম শুনেছি—তাদের সঙ্গসুখ আমি যেন উপভোগ করতে

লাগলাম, ক্রমশ তাদের সংখ্যা বেড়ে যেতে লাগল—এমন কি মৃতেরাও এসে যোগ দিল—যুগ যুগান্তর হ'তে দনের পর দল আসতে লাগল। লুসিও তার মধ্যে আছে—সে তার সুর বাজাচ্ছে—সকলকে নিয়ে এক মহান সঙ্গীতের সৃষ্টি করছে—জীবিত এবং মৃত - অনন্ত মানবের এই সঙ্গীত। এইত আমরা এখানে—তুমি আমি তোমার ভাই বোন। তোমার আর আমার ভাগ্য একই। আমরা পৃথিবীর অনুদার অসীম শক্তির নিয়মে এখানে এসেছি—আমাদের ইচ্ছামত জীবনকে চালিত করবার ক্ষমতা নেই। অন্টার, অত্যাচার, দুঃখ, রোগ, অগ্নি, রক্ত—নানাভাবে আমরা উৎপীড়িত হচ্ছি। সব চেয়ে সুখা যে তাকেও একদিন মরতে হবে। তার বাড়ীতে সে যেন অতিথি। সে একথা জানেনা কিন্তু কালকেই তাকে হয়ত চলে যেতে হতে পারে। তবুও মানব নিশ্চয় নিয়তির সামনে দাঁড়িয়ে হাসছে, আনন্দ করছে। প্রকৃতির দাসত্ব করেও সে সুন্দরের সৃষ্টি করে—যদনার মধ্যেও তার এত উদ্ভূত শক্তি সঞ্চিত থাকে যে অনন্ত শূণ্যে সে তার আলোক ছড়িয়ে দিচ্ছে—দৈবী মহিমায় আতপ্ত করে তুলছে দেবতাদের দেহ।

ওগো মানুষের অস্তরের দেবতা, আশ্চর্য্য তোমার মহিমা—স্বর্গের দেবতার মত তোমার মহত্ব। তুমি মানুষকে গ্রাস করছ সত্য কিন্তু তার পরিবর্তে অনন্ত জীবনের আশায় উদ্বোধিত করছ। অন্ধভাগ্যের প্রতিহিংসা চরিতার্থে তুমি এ বিশ্ব দৈবী মহিমায় মহিমাদিত করে তুলছ।

যারা আজ ধূলায় মিশে গেছে—নির্ঝাপিত প্রদীপের শিখার মত—তারাও একদিন এই নাট্যের অভিনয় করেছে—যারা জীবনের অন্ধকারে ব্যর্থ হয়েছে আলোর সন্ধানে—তারাও। আমরা কেঁদেছি,

মানন্দ করেছি, ছুঃখ ও আনন্দের স্বাদ গ্রহণ করেছি কিন্তু প্রত্যেকেই
 আমরা জ্যোতি সমুদ্রে কণা কণা জ্যোতি সংযোষিত করেছি—প্রত্যেকেই,
 ফালো নিগ্রো। যে কবরের অঙ্ককারে প্রবেশ করবার পূর্বে শেষ স্মৃতি
 চিহ্ন রেখে গেছে মানুষের মনে—সে হ'তে জীনিয়সেরা—যাঁরা স্বর্গচুমী
 নন্দিরের স্তম্ভ উত্তোলন করেছেন—তাঁরাও—সবাই আমরা আমাদের
 পাট অভিনয় করেছি যথাসম্ভব—দোলনার ধারে প্রার্থনারত হতভাগিনী
 ম্যাঁ. তাঁর মহান্নারা যাদের প্রশংসাবাণী অসীম শূন্যে বঙ্কার
 তুলছে—সুর্নাই।

ওগো, মানুষের অন্তর দেবতা, তোমায় প্রণাম করি, তুমিই বিশ্ব
 চেতনা সঞ্চার করছ—কেন্দ্রাতিগের দিকে যাত্রায় উদ্বোধিত করছ।
 তুমিই সেই বন্দনা গান—যা এ বিশ্বকে মহাসঙ্গীতের সঙ্গে মিলিয়ে
 দিচ্ছে—একবার নিজের দিকে তাকাও, শিরোত্তলন করে অন্যায়ের
 বিরুদ্ধে সগর্বে দাঁড়াও। ছুঃখ-দৈন্য তোমায় পরাভূত করতে পারে—
 মৃত্যু তোমায় মুছে দিতে পারে—তবুও তুমি অজ্ঞেয় শাস্ত।

হে প্রিয়তম বন্ধু—তখন আমার মনের ধারণা ঠিক এই রকম
 হয়েছিল: তারপর বীজ বোনা হয়ে গেলে ঘরে ফিরে এলাম—
 পাহাড়ের কাঁদের ওপর দিয়ে সূর্য্য তখন উঁকি মারছে। বেড়ার
 ধার মাল্ট দাঁড়িয়ে আমাকে দেখছিল। কপালের ওপর সে একটা
 কমান টেনে দিয়েছিল ঠিক কৃষক রমণীর মত। কাজেই তার
 মুখটা স্পষ্ট দেখা যাচ্ছিল না—কিন্তু সে হাসছিল—যেন তার
 উৎপীড়িত মাতৃহৃদয় শোকের সাগর হ'তে মাথা টেনে তুলতে পেরেছে,
 আজ দিনের আলোর সঙ্গে সেও ঈশ্বরের সৃষ্টিকুর্য্যে সহায়তা করতে
 লেগে যাবে।

